ত্রিপুরা থেকে দক্ষিনাবর্ত

(ভ্রমণ ডায়েরী)

প্রণব সেনগুপ্ত

ত্রিপুরা থেকে দক্ষিনাবর্ত

ভ্রমন ডায়েরী

প্রণব সেনগুপ্ত

ত্রিপুরা থেকে দক্ষিনাবর্ত (ভ্রমন ডায়েরী)

প্রণব সেনগুপ্ত, এম.এ, এল.এল.বি, জার্নালিজম (ডিপ্লমা)
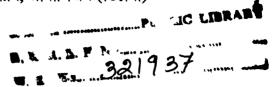
প্রকাশক ঃ পূর্ণিমা পাবলিসার্স
পূর্ণিমা সেনগুপ্ত
অফিসটিলা, বিশালগড়, ত্রিপুরা (পঃ)

প্রকাশ কাল ঃ জানুয়ারী ২০১১

মুদ্রণে ঃ রামকৃষ্ণ অফসেট প্রেস
আমতলী, রামকৃষ্ণালয়, এ. বি. রোড
ফোন -২৩৭৫৮৭৯

প্রাপ্তি স্থান ঃ সরস্বতী বুকডিপো
ওরিয়েন্ট চৌমুহনী , আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা ।

মূল্য ঃ ১৫০.০০

অভিজ্ঞতার নিরীখে

দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা জীবনকে ধরে রাখতে গিয়ে পাশাপাশি আগামী প্রজন্মের কাছে দায়বদ্ধতার কথা ভেবে অবসর বিনোদনের অবকাশটুকু ভুলে কাগজে কলমে অভিজ্ঞতার কথা লিখি , আমি বিশ্বাস করি সৃষ্টিশীলতায় গড়ে উঠেছে মানুষের সাথে মানুষের মেল বন্ধন , সৌভাতৃত্বতা, আজকের জানা চেনা এবং নবসৃষ্টির উন্মদনা, সে যেন লুকানো চাবি । সৃষ্টির ইতিহাস চিরকালই ভবিষ্যতের দিশারী ।

আত্মকেন্দ্রিকতা, অমূল্যায়ন, আত্মবিলাসীতা, অমানবিকতা,অত্যাচার, অপমান, অবরোধ ইত্যাদি শব্দগুলি অনেক সময় আগামীর পথকে অবক্ষয় ও অবরুদ্ধ করে তোলে । তাই তো প্রয়োজন কাগজে কলমের মাধ্যমে অক্ষর সৃষ্টি করে ঘুমন্ত সমাজের ঘুম ভাঙ্গানো । অক্ষর সৃষ্টির প্রাক্‌লগ্ন থেকে দেখা গেছে ছাপার অক্ষর মানুষকে ভীষন ভাবে আকর্ষিত করে । কর্মব্যস্ত মানুষ কথা শুনবে, ভুলে যাবে, তাইতো কথাগুলি যেন বাস্তবজীবনে রেখাপাত করে তারজন্যই ছাপার অক্ষর । লেখা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের মানুষকে উদ্দীপ্ত করা যায় । নয়তো বা চিবঘূর্নামান সময়ের গতিতে সব কিছু মুছে যাবে । ইতিহাস থাকবে না । জীবনে সমস্যা, বিশৃঙ্খলা, অবসাদ, হাতাশা, ক্লান্তি, ক্ষোভ থাকবেই, দৃঢ়তাই একমাত্র উত্তরণের পথ । আমার মত নিন্মমধ্যবিত্তদের জীবন কলুর বলদের মত। সমস্যার পাহাড় নিয়ে ঘুরে চলছে, আবার কেউ বা গাড়ী, বাড়ী, বিনোদনের ক্লাব, আড্ডা,আনন্দ-হুল্লোড় নিয়ে মেত উঠেছে । " দুনিয়া যাহান্নামে যাকগে্" তাতে কি ?

এটা সত্যি প্রতিটি মানুষেরই বোধ হয় মনের কোনে সুপ্ত ভাবে লুকিয়ে আছে যাযাবরবৃত্তি, সময়ের সুযোগের ফুরসতে বেরিয়ে পড়ে , কেউ বা দায়িত্বের বোঝা নিয়ে কেউ বা অজানাকে জানতে, কেউ বা আনন্দের কারণে ।আবার কারো সাধ থাকলেও সাধ্যের কারণে তা হয়ে উঠে না। অনেকের সাধ , সাধ্য থাকা সত্বে ও সুযোগের কারণে বেরিয়ে পড়া হয়ে উঠে না । কর্তব্যের ফুরসতে উদাসী বেদনা বুকে নিয়ে ২০১০ সালের মে মাসের শেষদিকে বেরিয়ে পড়ি , প্রথমটা সন্তানের শিক্ষা ,

দ্বিতীয়টা যদি দেখে কিছু জানতে , শিখতে পারি , মনের গোপন ইচ্ছা ও অভিলাশ । সময়টাই জীবনে আজকাল সকলের সমস্যা । তারপর ও ভাবলাম যখন বেরিয়ে পড়েছি দেখব মন দিয়ে , জানব সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে , বেরিয়ে পড়লাম , এমনিতেই জীবন জীবিকা , আরক্ষা কর্মচারী হিসেবে পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরার গ্রাম - পাহাড় সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কিছুই জানা , পার্বত্য রুপসী ত্রিপুরা থেকে বিমানযোগে তিলোত্তমা কোলকাতায় , যেখান থেকে সোজা সড়কযোগে ছুটলাম বর্ধমান , সন্তানের শিক্ষা , পাশাপাশি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা , জানলাম বর্ধমান নামের উৎস , পুরানো ইইতহাস, মুসলীম আক্রমনের আগে , পরের বিক্ষিপ্ত ঘটনাসমুহ ।১৬৫৭ এর বর্ধমান রাজ , মারাঠা আক্রমন, দ্বিতীয় বর্ধমান রাজ ১৭৪৪ এবং বর্ধমান জেলার অতীত কাহিনী সমুহ । বর্ধমানের বিশ্ববিদ্যালয় পুরানো হাবেলী । এখানকার কাজ সেরে তিনদিন বাদে পুনরায় ছুটলাম মাদ্রাজে, সাথে স্ত্রী ও শিক্ষার্থী মেয়ে , মুল উদ্দেশ্য লেখাপড়া , সাথে ভ্রমণ, চেন্নাই সেন্ট্রালে পৌছে উঠে পড়লাম মহারাব্বা হোটেলে । মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ের ভর্ত্তির ব্যাপারে যাওয়ার পাশাপাশি শুরু করলাম ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করতে । সেই বিখ্যাত মেরিনা বীচ , আন্না স্কোয়ার , বিবেকানন্দ আশ্রম , শিব মন্দির , সর্প উদ্যান , শিশু উদ্যান , মিউজিয়াম , আর্ট গ্যালারী, উচ্চ আদালত , বিধান সভা , লাইট হাউস , সন্তোম চার্চ, পরদিন বেরিয়ে পড়লাম শহরের বাইরের দৃশ্য দেখতে ভি, জি, পি গোল্ডেন বীচ , ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক (নানাহ প্রজাতির প্রচুর কুমীর) ডলফিন সিটি , মহাবল্লীপুরম , কাঞ্চীপুরম, পক্ষী তীর্থম , শিবকাঞ্চী এবং বিষ্ণু কাঞ্চী সিল্ক শাড়ীর কারখানা ইত্যাদি ।

পরদিন ছুটলাম ঐতিহাসিক পন্ডীচেরীতে দেখলাম অরবিন্দ আশ্রম , জানলাম ঋ ষি অরবিন্দ সম্পর্কে, সংগৃহীত তথ্য লিখে রাখলাম , আগামীকে উজ্জীবিত করতে গেলাম। অরোভিল মাতৃ মন্দিরে , মিউজিয়াম মানাকুলা বিনয়সাগর মন্দিরে , পন্ডী বীচে , সংগ্রহ করলাম নানাহ তথ্য লিখে রাখলাম , ঘুরে বেড়ালাম তামিলনাডুর অনেক স্থানে হয়ত সব লিখে রাখা সম্ভব হয়নি । মেয়েকে ভর্ত্তি করানোর পর এক রাত্তিরে ট্রেনে চেপে বসলাম কর্ণাটকের রাজধানী ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে । পরদিন সকালে এসে পৌছলাম ব্যাঁঙ্গালোরে , দেখলাম বিধানসভা বিকাশ সৌধ , কর্ণাটক উচ্চ আদালত , কুব্বন পার্ক, ভেঙ্কটপ্পা আর্ট গ্যালারী , মিউজিয়াম , নেহেরু প্ল্যানেটারিয়াম , রাজভবন , কুমারা পার্ক , রেস কোর্স , গোওটা টাওয়ার , রবীন্দ্র কলাক্ষেত্র , উলসুর লেইক , শিবমূর্ত্তি , আন্নাম্মা দেবী মন্দির , শঙ্কে লেইক , ইস্কন মন্দির , ডঃ রাজকুমার সমাধি , জুম্মা মসজিদ , ভেঙ্কটস্বামী মন্দির, টিপুর দুর্গ , লালবাগ গার্ডেন , ত্রিনিতি চার্চ , বুল টেম্পল , হনুমান মন্দির , কোলার স্বর্ণখনি , শিবগঙ্গা , চামারাজা সাগর , দেবানাহালি , হেসারঘাট , বন্নেরঘাটা ন্যাশানাল পার্ক , বসন্তপুর , ভবানী শঙ্কর মন্দির , রমন আশ্রম , চামুন্ডেশ্বরী মন্দির , বৃন্দাবন গার্ডেন , নন্দর হিলস্ , আরো

কতকিছু , সত্যিই বিচিত্র ভারত ভুমি নয়নাভিরাম, মাসের অর্ধেক কালের উপর সময় কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জায়গা পরিক্রমা করে মানুষের ভাষা , আত্মীয়তা , খাদ্যাভ্যাস , সব মিলে মনে হল সত্যিই ভারতবাসী নিজেদেরকে ভারতীয় বলে গর্ববোধ করাটা সত্যিই গর্বের , এ এক বিশাল ইতিহাস , ক্ষুদ্র অংশ তুলে ধরলাম অনেক প্রচেষ্টা করে। মহীশুরের শ্রীরঙ্গ পত্তমের হায়দর আলী ও সুযোগ্য পুত্র স্বদেশপ্রেমী টিপু সুলতানের বীরগাথা লিপিবদ্ধ করলাম আগামীকে জানাতে। নয়তো আমরা ঐতিহ্যহীন হয়ে যাবো । যারা সৃষ্টি করেছে লড়েছে আমাদের স্বার্থে তাদের নাম তো সম্মানের সাথে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য । সন্তানের মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও ভ্রমনের অভিজ্ঞতাটুকু যেন আমার বাড়তি পাওনা । সংগ্রহকৃত তথ্য নিয়ে ফিরে এলাম কোলকাতায় , ছুটলাম দক্ষিনেশ্বরী মন্দিরে , এ যে রানী রাসমনির জীবনের বিশাল ইতিহাস জড়িত , জানলাম , উপভোগ করলাম , শুনলাম। মাসাধিক কাল পর ফিরে এলাম নিজ রাজ্য ত্রিপুরায় , কাজে যোগদানের আগে রাজ্যের গর্ব ঐতিহ্য ও রাজ্যবাসীর বিশ্বাস মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে পুঃখানুপুঙ্খ মায়ের মন্দিরের ইতিহাস জানার অভিপ্রায় আমাকে কিছু পৌরানিক তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করে । খন্ড খন্ড সব ঘটনাসমুহ ও ভ্রমন উপভোগের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখে রাখলাম '' ত্রিপুরা থেকে দক্ষিণাবর্ত '' এক ভ্রমন ডায়েরী - আগামী হোক উজ্জীবিত ।

অক্ষর বিন্যাসে বা মুদ্রনে হয়ত কিছু ভুল ত্রুটি আছে , তাই পাঠক ; পাঠিকাকুলের কাছে মার্জনার আবদন করছি । বইটুকু আপনাদের কাছে গৃহীত হলে তবেই হবে আমার লেখার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ।

নিবেদন -

প্রনব সেনগুপ্ত

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই গুলি

সংবাদপত্র বিষয়ক (গবেষণামূলক)

১) স্মৃতির রোমন্থন সংবাদপত্র
(১৯৮৭ -২০০৪)

২) সংবাদ সংস্কৃতি

৩) অধিকার

অপরাধ/সন্ত্রাস/ঐতিহাসিক

১) অপরাধ অনুসন্ধান ও শাস্তি

২) রক্তাক্ত টাকারজলা

৩) সবুজ পাহাড়ের অভিযান

৪) অস্তিত্বের সংগ্রামে চাকমা জাতি ।

৫) My experience about Police work

কবিতা

১) রক্তচোখ

২) প্রলয়

৩) আক্ষেপ

৪) দুঃস্বপ্ন

৫) অব্যক্ত আর্তনাদ

৬) লেখার পেছনে

৭) জীবন প্রান্তরে

৮) ছবি কবিতা

প্রবন্ধ

১) নিরন্তর

২) ছায়াপথ

৩) সীমান্ত সর্ম্পক

৪) আরক্ষা ডায়েরী

গল্প

১) উৎসর্গ

২) মুখোশ

৩) জীবন সংঘর্ষ

৪) সমাজের কান্না

৫) নীরব মরুদ্যান

৬) ভাঙ্গাঘর

৭) ফিরে দেখা

যা রয়েছে ....
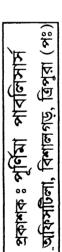
- পথ চলা
- সাজানো বর্ধমান শহর এবং ঐতিহ্য (পশ্চিমবাংলার)
- চেন্নাই,সুশোভিত দর্শনস্থানসমুহ
- ঐতিহাসিক "পন্ডিচেরী ও ঋষি অরবিন্দ"
- ব্যাঙ্গালোর, সুশোভিত দর্শনস্থানসমুহ
- শ্রীরঙ্গপত্তনম,হায়দার, টিপু সুলতানের বীরগাথা ।
- পশ্চিমবাংলায় দক্ষিনেশ্বরী মায়ের মন্দির ও রাণী রাসমনির ঐতিহ্যপূর্ন কার্যাকলাপ
- ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দির ও রূপসী ত্রিপুরা ।
- সংগৃহীত কিছু ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের ছবি

পথ চলা

স্যাঁতস্যাঁতে বর্ষার দিন। সারাদিন ধরে বৃষ্টি। দিনটি ১৫ই জুন ২০১০ ইং। ভরদুপুরে সদর উত্তর থেকে গাড়ী ছুটেছে আগরতলা এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। গাড়ীর ভেতর তিনজন সওয়ারি। এর একজন ছাত্রী, মাত্র তিনদিন আগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে অনার্স সহ মাইক্রোবাইলোজিতে গ্র্যাজুয়েশন করেছে। তার উদ্বিগ্নতা সবচাইতে বেশি। কারণ তাকে কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে যেতে হবে। মার্কশীট ইত্যাদি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। এই সুবাদে বাকী দুই সওয়ারী সন্তানের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থার পাশাপাশি ভ্রমণ/বেড়ানো, ভিন রাজ্যের সম্বন্ধে জানার/দেখার পিপাসায় কাতর। যদিও প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য সন্তানের ভর্তি। ভাল ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদি। এমনিতেই আরক্ষা বিভাগে যখন তখন ছুটি পাওয়া ও দুস্কর। অনেক নিয়ম পদ্ধতি মানতে হয়। সুতরাং আনন্দটা দ্বিগুণ। ঝিড়ঝিড় বৃষ্টি যেন মনকে ও ঝিড়ঝিড় করেছিল। একমাত্র পোষ্য জীব বলতে একটি সারমেয় ছানা। তাকে সাথীদের কাছে রাখিয়া পড়ন্ত বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে বিমানে চেপে বসা। আনন্দ চাপা উদ্বেল চোখ কারণ প্রথম কাজটা তো উচ্চশিক্ষা জনিত। প্রায় ৭টা কোলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগমন। বন্ধুত্বের সহায়তায় বন্ধুর ফ্ল্যাটে রাত্রিযাপন । পরদিন সকাল অর্থাৎ ১৬/৬/২০১০ ইং সকাল সকাল দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে চেপে বসলাম বাসে ধর্মতলা থেকে। সো সো শব্দে দ্রুতগামী বাস শহর পেরিয়ে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটতে থাকে। একসময় শক্তিগড় পার হয়ে রাস্তার পাশে এক ধাবার সামনে এসে দাঁড়ায়। জানতে পারি জায়গাটির নাম পানাগড়। অন্যান্য যাত্রীদের মতো আমিও বাস থেকে নীচে নেমে পড়ি। খুব তাড়াহুড়ো তার মাঝে খিদে ও পেয়েছিল কিন্তু ভুরিভোজ করার সময় নেই। লুচি, সব্জি খেয়ে দ্রুত আরও দুটো স্ত্রী কন্যার জন্য নিয়ে বাসে চেপে বসলাম। সোজা কলেজের সামনে, সেখান থেকে ছাত্রী প্রয়োজনীয় তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করে। শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রিন্সিপাল সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবার এসে একটি হোটেলে উঠি। হোটেলের নাম রিলায়েন্স। আর জায়গাটির নাম বেনাচিতি। সন্ধ্যায় একটি কালীমন্দিরে যাই। সবাই বলে জাগ্রত দেবী। আমরা ও গেলাম। পুজো

দেওয়া হল। এই মন্দিরের নাম 'ভিড়িঙ্গি কালীমন্দির।' বেড়াতে সবাই ভালবাসে। সুতরাং আমিও বটে। কিন্তু আমার কতগুলো ব্যাপার আছে। প্রথমতঃ ছুটির একটা ব্যাপার। দ্বিতীয় হলো সময়। তৃতীয়- আনুষঙ্গিক মধ্যবিত্তের নানাহ ভাবনা। আসলে সবসময় ইচ্ছে থাকলেই সুযোগ হয়ে উঠে না। আর পুজো পার্বনের সময় তো আমার এ যাবৎ জীবনে সম্ভব হয়ে উঠে নি। অবশ্যই আমার চাকুরির ধরণটাই এমন। সুতরাং প্রশ্নটা এখানে অর্থ ও জীবিকার। পেশাগত জীবনকে তো অস্বীকার করা যায় না। খুব বেশি ভিড় আমি পছন্দ করি না। শান্ত নিরিবিলি স্থানগুলো আমার বেশি পছন্দ। কারণ সর্বদা কোলাহলের পর একটু নীরবতা ও যে কাম্য। এবং জায়গা সম্বন্ধে উপলব্ধি ও উপভোগ দুটোই যে প্রয়োজন। আমার কাছে বেড়ানো শুধু হইচই না কিছু জানার উদগ্রীবতাও বটে।

১৭/৬/২০১০ ইং বেনাচিতি থেকে ছুটলাম ট্যাক্সি করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশাল এলাকাজুড়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। সুদৃশ্য জানতে পারলাম হেরিটেজ বিল্ডিং। পুরনো রাজবাড়ী। ভেতরে আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগের স্বল্প কিছু সংরক্ষিত জঙ্গল, অভূতপূর্ব। ছুটোছুটি করছে এক চঞ্চল হরিণ। মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট ও অন্যান্য দরকারী কাগজ সংগ্রহ করতে ছাত্রী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যস্ত তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো এক কর্মীকে নিয়ে দেখলাম বর্ধমানের বিখ্যাত ঐতিহাসিক 'কার্জন গেইট' যার বর্তমান নাম বিজয় কেতন। দুদিন যাবৎ ছাত্রীর শিক্ষার বিষয়ে ব্যস্ততার সুবাধে ঢুকে পড়লাম সংগ্রহশালায়। বর্ধমানকে জেনে নিতে। খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে বর্ধমানের ইতিহাস সেই পুরনো পাথরের যুগ। সংস্কৃত শব্দ বর্ধমানো থেকে বর্ধমানের সৃষ্টি বলে অনেক গবেষক মনে করেন। ৬ এর দশকে আবিষ্কৃত / উদ্ধারকৃত এক তাম্রপত্র থেকে পাওয়া যায় মালাসরুল গ্রাম, গলসি পুলিশ থাঁনা। এই নিয়ে দুইটি মতামত আছে। একটি হলো 'বদ্ধমানো' থেকে বর্ধমানের সৃষ্টি অন্যটি হতে পারে ২৪ শের পর জৈন তীর্থঙ্কর বা বর্তমানোস্বামী, জৈনদের কল্পসূত্র মতে মহাবীর কিছুদিন আস্থিকগ্রামে সময় কাটিয়েছিলেন যাকে সাধারণত বর্ধমানো বলা যেতো। এইভাবেই নামের উৎপত্তি। অন্য আর একটি মতে বর্ধমান মানে সমৃদ্ধির উৎপত্তি কেন্দ্র। আর্যদের উন্নতি শুরু হয় গঙ্গার উপত্যকা হইতে এবং ফ্রান্টিয়ার কলোনীকে বর্ধমানো বলে ডাকা হত উন্নতি ও সমৃদ্ধির ধারক হিসেবে।

১৯৫৪ এবং ১৯৫৭ তে এক গুহা হইতে আবিষ্কৃত তথ্য প্রমাণ করে এলাকাটি ছিল দুর্গাপুর থানার অধীন বীরভানপুর। এই আবিষ্কারের পরবর্তী ১৯৬২-১৯৬৪ পান্ডুরাজার ডিবি আবিষ্কৃত হয়। অজয় নদীর উপত্যকা থেকে (ভেদিয়ার কাছে) এবং অজয় নদীর বিভিন্ন অংশ থেকে, কুনুর এবং কোপাই নদীর সভ্যতা। এই ডিবি প্রমাণ করে সেই যুগের মানুষ পরিকল্পিত

শহর ও দালান পাকা বাড়ী ও রাস্তা তৈরিতে সিদ্ধহস্ত ছিল। সাথে নানাহ সুন্দর কারুকার্য। তাদের অর্থনৈতিক উৎস ছিল তামার উপযুক্ত ব্যবহার। কৃষি এবং ব্যবসা পুরানো বাংলার প্রসিদ্ধ বিভাগ ছিল বর্দ্ধমানো। প্রাচীন তথ্য থেকে ৬ এর দশকে জানা যায় রাধা-বর্ধমান এলাকা ময়ুর রাজবংশের অধীন ছিলো। পরবর্তীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। এছাড়াও আরও কয়েকটি স্বাধীন রাজত্ব স্থাপিত হয় বাংলার মধ্যে।

মুসলিমদের আগমনের পূর্বে- তৃতীয় দশক শেষের পথে বর্মনদের রাজত্ব মাথা তুলে দাঁড়ায় পশ্চিম বাংলায়। চন্দ্র বর্মণ, রাধা অঞ্চলের রাজা হিসেবে স্বীকৃত হন। গুপ্ত বংশ ক্ষমতায় আসার পর বিনয় গুপ্ত এলাকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এবং তারপরে শশাঙ্ক, যিনি প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার রাজা ছিলেন। এই জেলার ইতিহাস খালি ছিল মধ্য ৭ এর দশক থেকে পলাশদের উত্থান পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ এর শেষ ভাগ পর্যন্ত।

খালিমপুর তাম্রপত্র ধর্ম্মপাল হইতে জানা যায় ধর্মপাল প্রথম গোপালের পুত্র। প্রথম গোপালকে জনগণ রাজা হিসেবে নির্বাচিত করে দেশকে 'মাৎস্যন্যায়' থেকে রক্ষা করার জন্য। আনুমানিক ১১৩০ খ্রীঃ পাল বংশ এবং সেন বংশ বাংলার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বিজয় সেনা তাদের প্রথম রাজা ছিলেন দেওপাড়ার বর্ণিত। মুসলিম আগ্রাসন শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সদগোপ বংশ গোপভূমের স্বল্প সময়ের জন্য বর্দ্ধমান জেলা শাসন করেছিল। বাংলায় প্রথম মুসলিম আগ্রাসন শুরু হয় লক্ষসেনার রাজত্বকালে। প্রথম আক্রমণ করেন বখাতিয়ার খিলজি। দশ বৎসর পরে হাসমুদ্দিন ইয়াজের রাজত্বকালে। উত্তর রাধার একটি অংশ দখল করে নেয় গৌধার অপর মুসলিম শাসক। তারপর থেকে এই অঞ্চল অধিগ্রহণের জন্য মুসলিম শাসক এবং উড়িষ্যার রাজার মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ চলিত। তখনকার রাজনৈতিক চিত্র (বর্ধমানের) পরিস্কারভাবে বর্ণিত ছিল না। তথ্য হইতে জানা যায় নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ এর উপস্থিতি সপ্তগ্রামে প্রমাণ করে বর্ধমান জেলার গঙ্গা উপকূলবর্তী স্থান উনার দখলে ছিল। পরবর্তী রাজা তার পুত্র রুকমউদ্দিন বর্বক শাহ তার পিতার সম্পত্তি আরও অধিক বৃদ্ধি করিয়াছিল। যা মালাধর বসুর লেখা থেকে পাওয়া যায়। যিনি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবি ছিলেন। মালাধর বসু বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন এবং তিনি লক্ষৌতির রাজা হইতে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেন। অপর একজন খ্যাতনামা কবি রূপরাম ও বর্ধমান জেলায় ছিলেন। যিনি লিখেছিলেন 'ধর্মমঙ্গলা।'

১৬০৬ খ্রী কুতুবউদ্দিন খান কোকা, সহতুতো ভাই জাহাঙ্গীরের বাংলার গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন। শের আফগান ইস্তাজী একজন তুর্কীয় খ্যাতনামা লোক সে সময় বর্ধমানের জায়গীরদার ছিলেন। উনার স্ত্রী মেহেরুন্নেসা উনার সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

কুতুবউদ্দিন খান খোকা বর্দ্ধমানে আসতেন বাংলায় দায়িত্ব নিয়ে আসার পর থেকে। শের আফগান এবং কুতুবউদ্দিনের মধ্যে লড়াই চলছিল। যার ফলশ্রুতিতে উভয়ে মারা যান। সুন্দরী মেহেরুন্নেসাকে জাহাঙ্গীর নিয়ে যান এবং তার নাম পরিবর্তন হয়। নতুন নামকরণ হয় 'নূরজাহান' নামে। বর্ধমান শহরে শের আফগান এবং কুতুবউদ্দিনের স্মৃতিসোধ এখনো পাশাপাশি। শাহজাহান তার পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর এর বিরুদ্ধে ১৬২২ খ্রীঃ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জাহাঙ্গীরের তাপ্তি নদী পার হয়ে উড়িষ্যা অতিক্রম করে বাংলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ততক্ষণে শাহজাহান (বিদ্রোহী রাজপুত্র) বর্ধমান দখল করে নেয় এবং দায়িত্ব দেন তার বিশ্বস্ত বৈরাম বেগকে। ১৬২৮ খ্রীঃ শাহজাহান দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং কাশিম খান জুয়িনীকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আবু রাই নামে একজন ব্যবসায়ী নিযুক্ত হন বর্ধমানের রেবকী বাজার এবং মুগুলতুলা এলাকার কোটোয়াল এবং চৌধুরী হিসেবে। তিনি খুব দ্রুততার সাথে সেনা প্রেরণ করতেন যেখানে প্রয়োজন সেখানে। আব রাই এর দাদু সঙ্গম রাই লাহোরের কোত্রিমহলের বাসিন্দা ছিলেন। উনি পুরী দর্শন করে ফেরার পথে বর্ধমানের বৈকুন্ঠপুরে নিজ বসতি স্থাপন করেন। বঙ্কুবিহারী, সঙ্গম রায়ের ছেলে এবং আবু রাইয়ের পিতা ছিলেন। আবু রাইয়ের ছেলে বাবু রাই, বর্ধমানের জমিদার রাম রাই থেকে বর্ধমানের পরগণা এবং আরও তিনটি অঞ্চল দখল করে নেয়। উনার পর উনার পুত্র ঘনশ্যাম রাই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারি হয়। তিনি এক বিশাল পুকুর খনন করেন। যার নাম 'শ্যামসাগর'। উনার পুত্র কৃষ্ণরাম রাই ১৬৮৯ খ্রীঃ জমিনদার হিসেবে নিযুক্তি পান ঔরঙ্গজেব কর্তৃক এবং তিনি বর্ধমানের চৌধুরী হিসেবে নিযুক্তি পান এবং সাথে আরও কয়েকটি পরগণা। তিনি নতুন করে কর দেওয়ার বিপক্ষে ছিঁলেন এবং কৃষি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে ছিলেন। কৃষ্ণরাম রাই একটি পুকুর খনন করেছিলেন যার নাম 'কৃষ্ণসাগর'- এই নামেই সুপরিচিত।

১৬৮৯ খ্রীঃ ইব্রাহিম খান বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তার দুর্বল শাসন ব্যবস্থা আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়। পূর্বমেদিনীপুরের ঘটল সাব ডিভিশন (পুরনো নাম চেতুয়া - বড়দা) সেখানকার জমিনদার ছিলেন শোভা সিং, উড়িষ্যার আফগান সর্দার রহিম খানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণরাম রাইকে আক্রমণ করেন। ১৬৯৬ এ কৃষ্ণরাম রাই পরাস্ত এবং বন্দী হন। কৃষ্ণরাম রাইয়ের ছেলে কৌশলে পলায়ন করেন কিন্তু পরিবারের অন্যান্য লোকজন শোভা সিং এর হাতে বন্দী হন। কৃষ্ণরাম রাইয়ের পরিবারের অনেক মহিলা বিষপানে আত্মহত্যা করেন। জগতরাম রাই ঢাকায় পৌঁছে এবং সুবেধার ইব্রাহিম খানের সাহায্য প্রার্থনা করে

হুগলির ফৌজদার এবং ইব্রাহিম খানের সাহায্যে জগতরাম রাই বর্ধমান পুনঃ দখল করে। কৃষ্ণরামের কন্যা সত্যবতী শোভা সিংকে ছুরি দিয়ে খুন করে যখন শোভা সিং জোর করে সত্যবতীকে তুলে নিতে চেয়েছিলো এবং সত্যবতী নিজেও আত্মঘাতী হন। ঔরঙ্গজেব ইব্রাহিম খানকে বরখাস্ত করেন এবং নিজের নাতি আজীম খানকে নিযুক্ত করেন। আজীম খান বর্ধমানে একটি মসজিদ তৈরি করেন। সেখানে তার নাম খোদাই করা আছে। ১৭০২ সালে হঠাৎ জগতরাম রাই খুন হন অজ্ঞাতপরিচয় খুনী দ্বারা নৃশংসভাবে। কিন্তু দুই ছেলেকে রেখে যান। কীর্তিচন্দ্র রাই এবং মিত্র সেন রাই। কীর্তিচন্দ্র রাই, চন্দ্রকোণা এবং বরদার রাজার সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন এবং চিতুয়া, ভুরসুত, বরদা এবং মনোহরশাহী দখল করে নেয়। শুধু তাই নয়, কীর্তিচন্দ্র রাই বিষ্ণুপুরের শক্তিশালী রাজাকে ও পরাস্ত করেন। যা অসামান্য বলা হয়। তিনি কাঞ্চননগর শহর স্থাপন করেন। এবং একটি সুদৃশ্য পুকুর খনন করেন। কীর্তিচন্দ্রের মায়ের আদেশে 'রানীসাগর' খনন করা হয়। ১৭৩৬ সালে দিল্লির বাদশা মোহাম্মদ শাহ কর্তৃক কৃষ্ণচন্দ্র স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচন্দ্র মারা যান চিত্রসেনকে দায়িত্বভার অর্পণ করে।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা সেনা নাগপুর হইতে বাংলায় প্রবেশ করে। সে সময় আলিবর্দি খান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার গভর্নর ছিলেন। তিনি সুজা উদ্দিনকে উড়িষ্যা প্রেরণ করেন এবং তিনি বর্ধমান আসেন সেখানে তিনি এপ্রিল ১৭৪২ মারাঠা কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। জুন ১৭৪২ তিনি কাটুয়া পৌছতে সমর্থক হন। জুন ১৭৪২ কাটুয়া মারাঠা সেনার প্রধান কার্য্যালয় হয়ে ওঠে। ক্রমে ভগীরথীর পশ্চিমপার মারাঠাদের হাতে চলে যায়। মারাঠারা ভাষাহীন ভাবে অসহায় মানুষদের উপর অত্যাচার ও শোষণ করতে শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শী 'ভানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার' বর্ধমান মহারাজার রাজসভার পন্ডিত লিখেছিলেন শাহুরাজার সৈন্যদল অসহনশীল, বর্বর, গর্ভবতী রমনী ও শিশুদের প্রতি ও নির্মম ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদের প্রতি অত্যাচারী। অধর্ম্মী, প্রত্যেকের ধনসম্পত্তি লুন্ঠনকারী ডাকাত এবং প্রত্যেক ধরনের পাপ কর্মের সাথে যুক্ত। ১৭৪২ এ ভাস্কর পন্ডিত যখন কাটোয়াতে দুর্গাপুজা করছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খান তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। উদ্ধারনপুরে গঙ্গানদ পার হয়ে এসে এবং ভাস্কর পন্ডিতকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করে। মার্চ ১৭৪৩, রঘুজী ভোঁসলে, নাগপুরের রাজা এবং ভাস্কর পন্ডিত যুগ্মভাবে কাটোয়ায় আসে শুল্ক আদায়ের জন্য। আলিবর্দি তাদের ফিরিয়ে দেন এবং পরের বৎসর আসতে বলেন। আলিবর্দ্দি ভাস্কর পন্ডিত এবং তার অফিসারদের আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের হত্যা করেন। ডিসেম্বর ১৭৪৫ কাটায়াতে আলীবর্দ্দি খান এবং রঘুজি ভোঁসলের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধে রঘুজী পরাস্ত হন এবং নাগপুরে চলে যান। নভেম্বর ১৭৪৬ আলিবর্দ্দি, বর্ধমানে আসেন এবং

এক ভয়ানক যুদ্ধে জনাজী ভোঁসলে পরাস্ত হন। জনাজী, রঘুজীর পুত্র, মারাঠা অত্যাচার বন্ধ হয় যদিও চুক্তি হয় আলিবর্দ্দি এবং রঘুজীর মধ্যে। চুক্তির শর্ত অনুসারে আলিবর্দ্দি ১২ লাখ টাকা বৎসরে প্রদান করতেন।

১৭৪০ এ চিত্র সেন রাইকে রাজা হিসেবে মোঘল সম্রাট স্বীকৃতি দেন। তিনি কালনাতে বিখ্যাত 'সিদ্ধেশ্বরী মন্দির' স্থাপন করেন। তিনি সন্তানবিহীন ছিলেন এবং ১৭৪৪ সালে ভ্রাতুষ্পুত্র তিলকচাঁদকে শাসনভার অর্পন করে তিনি পরলোক গমন করেন। চাঁদকে ও মোঘল সম্রাট রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ১৭৫৫ হইতে কোম্পানির সাথে মতানৈক্য শুরু কিন্তু আলিবর্দ্দি কোম্পানির পক্ষে মতামত প্রদান করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর বর্ধমান জেলার সমস্ত রেভেনিউ কোম্পানির হাতে চলে যেত মীরজাফরের সিদ্ধান্তমতে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের এই জেলা সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির অন্তর্গত হয় মীব কাশিমের পরাজয়ের মাধ্যমে।

তিলক চাঁদের রাজত্বকালে অনেক মন্দির নির্মিত হয়। যেমন কালনা, দৈনহাত, লক্ষ্মীকুমারী, তিলকচাঁদেব মা, কালনার শ্রীকৃষ্ণমন্দিব, দৃঙ্গকুমাবী, চিত্রসেনেব স্ত্রী, কালনার জগন্নাথ মন্দিব, ব্রজকিশোরী, কীর্তিচাঁদেব মা, কালনায় বৈকুন্ঠনাথ শিবমন্দিব, তিলকচাঁদকে কোম্পানি হুমকি ও দেয় ঠিকভাবে কর দেওযাব জন্য। প্রচুব পবিমাণ কর দিতে হত। তাবপরে বীরভূমেব জমিদারের সাথে মিলিত হয়ে তিলকচাঁদ ২৯ শে ডিসেম্বর ১৭৬০ বঙ্কা নদীর পারে সঙ্গতগোলার কাছে ব্রিটিশের সাথে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। এই যুদ্ধে ৩৭ বছর বয়সে তিলকচাঁদ মারা যান, তার শিশুপুত্র তেজচাঁদকে ফেলে রেখে।

রানী বিষ্ণুকুমারী রাজস্ব গ্রহণ করেন এবং কষ্ট করে ১৭৭৬ থেকে ১৭৭৯ পর্যন্ত কার্য্যভার সামলান তারপর চৌদ্দ বছরের পুত্র তেজচাঁদকে দায়িত্ব সঁপে দেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে ১৭৯৩ তে রাজা তেজচাঁদ চুক্তি করে কর দেবেন ৪০১৫১০৯ এবং পুলবনীর জন্য অতিরিক্ত ১৯৩৭২১ বৎসরে এইভাবে বর্ধমান রাজত্ব ব্রিটিশ কোপে ধ্বংস প্রাপ্ত হতে থাকে।

১৮৬৪ সালে মহারাজা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্য হিসেবে নিযুক্তি পান। তিনি প্রথম বাঙালী হিসেবে ব্রিটিশ থেকে এই সম্মান পান।

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ আধিপত্য ভারতবর্ষে সম্পূর্ণরূপে শুরু হয় চারদিকে শুরু হয় দাঙ্গা, হাঙ্গামা ১৮৭৮ এ বর্ধমান সঞ্জিবনী সরকারের সমালোচনা করে। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় গলশী থানা এলাকায় চান্নার স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া শুরু করেন। শান্তি সমিতি, কালনা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সমিতির সদস্যারা বিদেশি দ্রব্য, তামাক ইত্যাদি বর্জন করার আন্দোলনে জড়াইয়া পড়ে। ১৯০৮ সালে রানীগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় জয়দেব সেবক সম্প্রীতি।

১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বর্ধমানের লোক ভয়ানকভাবে আন্দোলন মুখর হয়ে পড়ে। প্রচুর মিটিং আন্দোলন শুরু হয় আসানসোলে ৬০ জন ছাত্র স্কুল ত্যাগ করে। বন্দেমাতরম বলে বর্ধমান রাজ কলেজের অনেক ছাত্র বহিষ্কৃত হয়। ১৯০৮ সালে কালনাতে একটি জাতীয় স্কুল খোলা হয়। এই জেলার মুসলমানরা খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করে। ঘৃণা দিবস পালিত হয় ১৮ মার্চ ১৯২৩ এ কালনা মিউনিসিপাল নির্বাচনে ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই স্বরাজ দল থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুরো বর্ধমান আন্দোলনমুখর ছিলও বন্ধ ছিল। সেপেম্বর ১৯৩১ কালনা থানাতে বোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং সাব-ইন্সপেকটরের সরকারি নিবাসেও বোমা নিক্ষেপ হয়। ডিসেম্বর ১৯৩১ সালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস বর্ধমানের মেমারীতে আসেনও সভা করেন। পরিস্থিতি এতো অগ্নিগর্ভ ছিল বেঙ্গল পাবলিক নিরাপত্তা আইন ১৯৩২ আসানসোল বিভাগে কার্য্যকর করা হয়েছিল। কাজী নজরুল ইসলাম, বাঙালি কবি তিনি রাণীগঞ্জের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মেছিলেন। তার কবিতা মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উজ্জীবিত করত। ১৯৪২ এ ভারতছাড় আন্দোলনে ও বর্ধমানের অংশগ্রহণ অভূতপূর্ব। কাশীয়ারা পোস্টঅফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কালনা রেলওয়ে স্টেসন ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়' স্বাধীনতার পূর্বদিন পর্যন্ত বর্ধমানবাসী ছিল আন্দোলনমুখর। জানার উদ্দেশ্যে যদি ভ্রমণ হয় তবে ভ্রমণের সাথে এ দেশ মাটি অঞ্চল, গ্রাম সবকিছুই যতদূর সম্ভব জেনে নেওয়া উচিত। আগামীকে পথ দেখানোর জন্য এ দায়িত্ব ও আমাদের। এবার এগিয়ে যাবার পালা। ছাত্রী তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যতটুকু প্রয়োজন ও সম্ভব সংগ্রহ করে নিয়েছে বাকী তো কোলকাতার দর্শনীয় স্থান সে তো ১/২ বার দেখা হয়েছে। মনোরম তো বটেই। যার সাথে বাঙালিদের সংস্কৃতিটুকুও জড়ানো যেমন নন্দন কানন, রবীন্দ্র সদন, কালীঘাটে মায়ের মন্দির, দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দির, নিকো পার্ক, সায়েন্স সিটি, আলিপুর চিড়িয়াখানা, বিড়লা প্লানেটেডিয়াম, মেট্রো, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি ইত্যাদি আরও কতকিছু।

পড়াশুনার খ্যাতিরেই বা পেশার কারণেই হোক কোলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) ঝাড়খন্ড, যেমন বিরসামুন্ডা, এয়ারপোর্ট, বিরসা হ্রদ, বাগান, শেরওয়ালি মন্দির (বরিয়াতুতে) বিখ্যাত দরগা (দোরন্ডাতে) পাহাড়, শেরওয়ালী মন্দির রিজিওন্যাল মেডিকাল কলেজ এন্ড হসপিটাল, বিহারের পাটনার গান্ধী ময়দান, পাটনার শিবমন্দির ইত্যাদি দেখা হয়ে গেছে। দীঘা ও একইভাবে দেখা হয়ে গেছে পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যার চন্দেনেশ্বর মন্দির, পুরী সমুদ্র, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, কোনারকের সূর্যমন্দির ইত্যাদি সবকিছুর পরেও বলতে হয় পূর্ব ভারতের সৈকত শহর পুরীতে প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া শুরু হয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব। সারা বছর

ভুবনেশ্বর, কোনারক ও পুরিতে দেশী বিদেশি পর্যটকদের ভীড় থাকলেও পুরীর পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সে জনসমাগম হয় তা বোধহয় এখানকার আর কোনও উৎসবে হয় না। তথ্য বলে ১৯৪৭ সালে ১৯ শে আগষ্ট (স্বাধীনতার ৪ দিন পর) ওড়িশা এক পৃথক রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। পুরনো নাম ছিল 'কলিঙ্গ'। পুরী নামের পৌরানিক ব্যাখ্যা, পুরুষোত্তম নাম থেকে সংক্ষেপে পুরী নামের উৎপত্তি। এক সময় 'শ্রীক্ষেত্র' বলেও পরিচিত ছিল। কপিল সংহিতায় নাকি বর্ণিত আছে। কপিল মুনি বলেছেন উৎকলের দেশ সর্বশ্রেষ্ঠ। আজও এখানে স্বর্গদ্বার নামে একটি অতি মনোরম স্থান আছে। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির ছাড়াও ১৬ কিলোমিটার এলাকা 'নীলাচল' নামে পরিচিত। এই অঞ্চল নিয়ে অনেক অনেক কাহিনী আছে । সব সংগ্রহ করা স্বপ্ন সময়ে সম্ভব হয়ে উঠেনি। তথ্য থেকে জানা যায় ওড়িশার চোড়গঙ্গদেবের আমলে রাজা অনন্তবর্মন পুরীর মন্দির গড়ার কাজে হাত দেন। সম্পূর্ণ করেন পুত্র অনঙ্গ ভীমদেব। খুব সম্ভবত ১১৫০ সনে এই মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ হয়। চৈতন্য মহাপ্রভু শেষ জীবনে ১৮ বছর পুরীতে কাটিয়েছিলেন। পুরীকে জগন্নাথের দেশ বলা হয়। সেকালের গজপতি রাজবংশের রাজারাই ছিলেন জগন্নাথ দেবের একনিষ্ঠ সেবক। আজও এই বংশের লোক পবিত্র জল নিয়ে সোনার পাত্র মোড়ানো ঝাটা দিয়ে রথ তিনটিকে পরিস্কার করেন। উড়িষ্যা ভাষায় এই উৎসবকে বলা হয় ছেড়া-পহড়া মোট ন দিনের রথযাত্রা উৎসব। জগন্নাথের রথের আকার সবচেয়ে বড়। এই রথের নাম গরুড়ধ্বজ বা নন্দীঘোষ। উচ্চতা ৪৫ ফুট, ১৬টি লোহার চাকা এই রথের শোভা।

বলভদ্রের রথের নাম তালধ্বজ। সুভদ্রার রথের নাম পদ্মধ্বজ বা দেবদত্ত। এই হলো স্বপ্ন পুরীর কাহিনী। ট্যুরিস্ট মানসিকতা কখনো আমার ছিল না। ছোট পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরায় জন্মেছি। সবুজ বনানী ঘেরা সুন্দর আমাদের রাজ্য স্বভাবতই আমি পাহাড় খুব ভালবাসি। সমুদ্র দেখেও আনন্দ হয়। তবে পাহাড়, জঙ্গল আমার কাছে খুব প্রিয়। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার তেমন নেই। তবে আমি বুঝি পাহাড়- কখনো পুরনো হয় না। পাহাড় যেমন সুন্দর, তেমনি পাহাড়ের আবহাওয়া। আমার মনে হয় আমার রাজ্য ছোট্ট ত্রিপুরা সত্যিই মনোরম।

বর্ধমানের সমস্ত প্রকার কাজ ও বর্ণনা জানতে সুবিধে হল কারণ আমার মেয়ের এক বৎসরের জুনিয়র ছিল কলেজে কাজী সরমিন সবনম নামে বর্ধমানের একটি মেয়ের। উপরন্তু শরমিন শবনমের বাবা কাজী নুরুল হুদা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী। ফলত বর্ধমানে আমার বিলম্ব ঘটিল না। বর্ধমান হইতে পুনরায় কোলকাতায় এসে পৌঁছি এবং ২২/৬/২০১০ ইং বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটের বিমানে কোলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। রাত্র প্রায় ৭ টা নাগাদ সুদৃশ্য চেন্নাই বিমানবন্দরে পৌঁছি। এবং সেখান থেকে প্রি-পেড

স্ট্যান্ড থেকে টি-এন- এবি-২৬৮৬ গাড়িতে চেপে সেন্ট্রাল চেন্নাই, ভিপেরি হাইরোড, পেরিয়ামেট এসে পৌঁছি এবং মহারাবা প্যালেস বলে একটি হোটেলে উঠি, হোটেলের মালিকের নাম সৈয়দ ইসমত। হোটেলটি হইতে রেলস্টেশনের দূরত্ব মাত্র ৫ মিনিট সময় লাগে। পাশেই নেহেরু আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, ইগমোর রেলওয়ে স্টেশন, তিন কিমি. দূরে আমেরিকান কনসুলেট, অ্যাপোলো হাসপাতাল এবং শঙ্কর নেত্রালয় এবং ১৫ কিমি. দূরে চেন্নাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাছেই বিশাল বাজার ইত্যাদি ইত্যাদি। ২৩/৬/ ২০১০ ইং ছাত্রীকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে নিয়মকানুন রক্ষা করিয়া শুরু হয় চেন্নাই সম্বন্ধে জানা এবং তামিলনাড়ুর সম্বন্ধে জানা ও দেখা, যেমন- তিরুপতি, পদ্মাবতী মন্দির, মেরিনা বীচ, আন্না স্কোয়ার, এম জি আর স্কোয়ার, বিবেকানন্দ আশ্রম, কল্পেশ্বর (শিব)মন্দির, সাপের উদ্যান (স্নেক পার্ক), চিলড্রেন পার্ক, গান্ধী মন্ডপ, মিউজিয়াম, উচ্চ আদালত, বার্মা বাজার, বিধানসভা, লাইট হাউস, সন্তোষ চার্চ, ভিজিপি গোল্ডেন বীচ, ক্রোকোডাইল ব্যাংক, ডলপিন সিটি, মহাবল্লিপুরম, কাঞ্চীপুরম। তাছাড়াও পন্ডিচেরীতে ঋষি অরবিন্দ আশ্রম, আরোভিলা মাতৃমন্দির, মিউজিয়াম, মানোকুলা বিনয়াগর মন্দির এবং পন্ডীবীচ, দেখেছি কোথাও প্রচন্ড ভীড়েও দেবদেবী দর্শনে শৃঙ্খলা ও নীরবতা, সমুদ্রতটে মানুষের উদ্দাম আনন্দ, বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচার যুবকদের কাছে, পাশাপাশি ভিন্ন প্রজাতির সাপের মেলা, পাশেই শিশু উদ্যান মিউজিয়াম, কোথাও নানা প্রজাতির কুমীর,দেশী বিদেশী কচ্ছপ, আমেরিকান সিলের মনমাতানো খেলা, আনন্দ উপভোগ করা অরবিন্দ আশ্রমের নীরবতা, জীবনের পথদর্শন সব মিলিয়ে চেন্নাই, পন্ডিচেরীও তামিলনাড়ুর ভ্রমণে এক অনন্যমাত্রা এনে দেই। যে সকল রাস্তা মোটামুটি মনে রাখতে পেরেছি যেমন পার্কস্টেশন চেন্নাই ইগমোর, চাটপেট, নুনগামবক্কম, কোদামবক্কম, মামবল্লম, তিরুবনমিয়ার, আলবেনা চার্চ, মামবালাম, চেপক, পোটশ, চেপক স্টেডিয়াম, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, বসন্তনগর, তিরুভানমিয়ার, ইন্দ্রনগর, পুন্নশলী হাইরোড, গোল্ডেন টাওয়ার ওয়ালাজা রোড, মাউন্ট রোড, চিনদারধারীপেত, তিরুভানমিয়ার, লাটস বীজ রোড (আডার), মুট্টুকুডু, মামাল্লাপুরম, কানাটুর, পল্লবা বীচ, মুগাইয়ুর, আইলাচেরী, তেনপাথিনাম, ভাতাপাতিনাম, বাধাপাতলাম, ভাল্লুবর কোট্টম, বুরকিট রোড, চেলীরুট বীচ, বালাচেরী, কাথিপাড়া, সাইভাপেট, পুনথাডালাম, ওলিভা বীচ অনুপুরম ইত্যাদি সাথে ছিল টিএন ইউ - ৪২৫৭ গাড়ী ও গাড়ির ড্রাইভার জয়। একদিন সকালে খেলাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম খাবারের নাম 'উত্তাপাম' খুব সুস্বাদু খাবার। অন্যান্য খাবার ও আস্বাদন করলাম। এই কয়েকদিন সময়ের মধ্যে যেমন ইডলি, ভড়াই, পোঙ্কার, ডোশা, বাবা দোসা, পেঁয়াজ রাভা, মশলা দোসা, রাভা মশলা, পেঁয়াজ রাভা মশলা, পেঁয়াজ উত্তাপাম, ঘি মশলা, পেপার রোস্ট, পেপার মশলা, মহীশূর মশলা,

রাইতা (অর্থাৎ দই এবং স্যালাড মিশ্রিত) ইত্যাদি। বাল্মীকী রাসা, ই.সি .আর রোড, তিরুবনমিয়ার ধরে যাই গোল্ডেন বীচ, যেখানে মূর্তি আছে, সরস্বতী, নন্দী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, খোদাই করা পাথরে কৃষ্ণমূর্ত্তি, সুভদ্রা, বলরাম একই রথে। লক্ষীদেবীর পাথরে খোদাই করা মূর্ত্তি, ভিজি, পনীর দাসের প্রতিমূর্ত্তি, যিনি ভিজি পার্কের প্রতিষ্ঠাতা, আরও কতকিছু মুড্ডুকারো হ্রদে নৌকা চালালাম। পরদিন চললাম পন্ডিচেরীর উদ্দেশ্যে, পথে পড়ে পার্লবীচ, বেলামবুড়, মারাখান্নাম, পুড়ুপাখিনাম, কাদামবাড়ি, কুন্নাথুর, কুডালুর, কোট্টাইকুডু, তাজকিথামকুডু, নারায়নবক্কম, অনুপুরম, বেনজাবক্কম, মধুরতনম, মুগায়ুর, মাথুররোড, আগারাম, মরাকান্নম, গুড্ডালোর, আলাপক্কাম, কেজপেটাহি, অনুমানথাই, কুনুমেডি, মানজাকুপাম রাস্তায় পড়ে লবন তৈরির কারখানা। রাস্তার পাশে গাড়ী থামে, সেখানেই দেখা প্রায় ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ লোগো এবং জয়শেলন এবং কে মোনোগোরেম এর সাথে। ওরা স্থানীয় লোক, সরলতায় ভরা। আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার আমাদের কথাবার্তা সরলীকরণ করে আমাদের হিন্দীতে বুঝিয়ে দেয়। বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞেস করে 'ওঙ্গা পে রে না'- আমি কিছুই বুঝিনি তখন ড্রাইভার বলে দেয় উনি আপনার নাম কি জানতে চেয়েছে। তখন আমি নাম বলি আমাদের ড্রাইভার আমার উপর উনাকে তামিল ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে দেয়। বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞেস করে 'ইন্ন পনরে' ড্রাইভার আমাকে বলে আপনি কি করেন উনি জানতে চান। পরবর্তীতে বৃদ্ধ প্রশ্ন করে ইঙ্গে পোড়ে অর্থাৎ কোথায় যাবে। আমি সামনে থাকা নারিকেলের জল খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ড্রাইভার আমাকে শিখিয়ে দেয় 'সাকার বে নো মা' অর্থাৎ আমি খাবো, বৃদ্ধ আমাকে নারিকেল কেটে এগিয়ে দেয়। ক্ষণিকের মধ্যেই যেন ভারতের এক প্রান্তের সাথে অন্য প্রান্তের পিতা পুত্রের মতো সম্পর্ক গড়ে উঠে। আমি টাকা দিলে বৃদ্ধ জয় ও মোনোগোরাম আমায় জড়িয়ে ধরে অশ্রুসজল নয়নে তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সাথে সাথে তাদের মোবাইল ফোন নাম্বার দিয়ে দেয়। এক সত্যিই হৃদয় বিদারক দৃশ্য।
তারপর পন্ডিচেরীতে অরবিন্দ মন্দির। মাতৃমন্দির, বিনায়ক মন্দির ইত্যাদি দর্শন সত্যিই অভিভূত। ঘুরে ঘুরে যা জানলাম যত তথ্য নিলাম তা পরবর্তীতে আসছি। শেষ দর্শন করলাম বসন্ত নগরের বালাজী মন্দির ও অষ্টলক্ষ্মী মন্দির। অবর্ণনীয় সুন্দর।

এলাকা- ১,৩০, ০৬৯ স্কোয়ার কিমিঃ। লোকসংখ্যা- ৬,২১,১০,৮৩৯ (জনগণনা- ২০০১), রাজধানী- চেন্নাই (মাদ্রাজ), ভাষা- তামিল। উৎসব পোঙ্গাল, দীপাবলি ও গনেশ চতুর্থী, বকরা ইদ্‌নবরাত্রি , খ্রীষ্টামাস্‌ ও রমজান। ধর্ম- হিন্দু, খ্রীস্টান, ইসলাম। বিমানবন্দর- চেন্নাই, তিরুচিরাপল্লী, মাধুরাই, কোয়েম্বাটোর। সমুদ্রবন্দর- চেন্নাই, টুটিকোরিন, বিধানসভার সদস্য- ২৩৪ জন, লোকসভার সদস্য- ৩৯জন। তামিলনাড়ুকে তামিলদের ঘর বলা হয় এবং দ্রাবিড় সংস্কৃতি,

তামিল ভাষা ভারতের পুরনো ভাষা, ইতিহাস অনুযায়ী শাসনকালকে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

চোলা রাজত্ব তানজাবুর এবং তিরুচি এবং একসময় তারা শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, দক্ষিণ কেরালার মাদুরাই এবং তিরুনবেলি অতিক্রম করে। কাঞ্চীর পল্লবরা মামাল্লাপুরম (মহাবল্লিপুরম) শাসন করত তাদের শক্তি ও রাজত্ব ছিল ৫৫০ হইতে ৮৬৯ এখানেই হয় নরসিংবর্মন কাঞ্চীপুরমে বিখ্যাত কৈলাসনাথ মন্দির স্থাপন করেন, যা পরবর্তীতে ১৫০ বৎসর শাসনতান্ত্রিক রাজধানী ছিল। চোলারা পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসে ৮৫০ এ.ডি.তে এবং শাসন করে ১১৭৩ পর্যন্ত, প্রথম রাজারাজার নেতৃত্বে। তারপর চোলারা দ্রুত দক্ষিণ পেনিনসুলা কর্ণাটক সহ কেরালা, অন্ধ্র এবং শ্রীলঙ্কা, লাক্ষাদ্বীপ পর্যন্ত দখল নেয়, রাজেন্দ্র চোলা পরবর্তীতে বাংলা পর্যন্ত সাম্রাজ্য বাড়ায়। ১৭ এর দশকে তামিলনাড়ুর পতন হয়। সেই সময় হায়দর তার সহযোগী ফ্রান্সের বন্ধুদের সাথে নিয়ে মহীশূরের রাজত্বকাল চালাচ্ছিলেন। পরবর্তীতে হায়দরের ছেলে টিপু সুলতান মহীশুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৮০ তে মহীশূরের যুদ্ধে পতন হয়। ১৭৮৩ ভার্সাইল চুক্তি। ১৭৯২ হইতে ১৮০১ এর মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মালাবর দখল করে। লর্ড ওয়েলেসলী প্রায় পুরো দক্ষিণাবর্ত নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয়। ফ্রান্স ১৬৭৩ এ পন্ডীচেরী দখল করে নেয়। ১৭৪২ সালে ড়ুপলিক্স ফ্রান্স ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৭৫১ সালে পন্ডিচেরীর যুদ্ধে ফ্রান্সের ভারত আগ্রাসন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৭৬৩ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্সের ক্ষমতা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়। ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। তিরুনেভেলির বীরাপান্দিয়া কোট্টাবর্মন নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। তখনকার স্বাধীনতা সংগ্রামী যেমন চিদাব্ধ, পিল্লাই, সুভ্রমানিয়া ভারতী, সুব্রমানিয়া শিবা, এবং ডঃ অ্যানি ব্যাসান্ত যিনি ১৯১৫ সালে হোমলীগ আন্দোলন শুরু করেন।

'তামিলনাড়ুর বাৎসায়িক উৎসব সমূহ'

জানুয়ারী- পোঙ্গাইল, জাল্লিকাটু, বুলফাইট, মামাল্লাপুরম -নৃত্য উৎসব।

ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল

শিবরাত্রি, চিত্তিরাই, শ্রী রামনবমী, গুড ফ্রাইডে।

মে, জুন, জুলাই

সামার ফেস্টিবেল,কৃষ্ণ জয়ন্তী।

সেপ্টে ম্বর, অক্টোবর

নবরাত্রি, শ্রী ভেলনকানি মন্দির, কানথুরি উৎসব, মহামাগাম উৎসব।

অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর।

দীপাবলি, বৈকুণ্ঠ একাদশী, তিরুভাদিরাই ফেস্টিবেল, নত্যনজলী ফেস্টিবল, কাথিগাই দিপম, সরল ভিজা, কাবাডি ফেস্টিবেল, মিউজক ফেস্টিবেল।

দেখার মতো- রকপোর্ট, পোঙ্গাল বুল ফাইট, চেন্নাই সেন্ট্রাল স্টেশন, সরকারী মিউজিয়াম, শোর টেম্পল, এসটি, থমাস মাউন্ট, সাউদার্ন রেলওয়ে হেডকোয়ার্টার (চেন্নাই), ফোর্ট সেন্ট জর্জ, ভেলাবর কোট্রম, এম জি আর ফিল্ম সিটি বিরলা প্লানেটরিয়াম, কিসকিনথা, কপলেশ্বর টেম্পল, ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক, ভিজিপি, গোল্ডেন বীচ রিসর্ট, মুতুকাডু, বোট হাউস, কবলেশওরার টেম্পল, সন্তোম চার্জ, শ্রী পার্থসারথি টেম্পল, মেরিনা বীচ, সেন্ট থমাস মাউন্ট, লিটল মাউন্ট গ্রীন গুন্ডী স্নেক এবং ডিয়ার পার্ক, কলাক্ষেত্র, ভেলানকান্নি, জুলোজিচাল পার্ক, আন্না এন্ড এম. জি .আর সমাধি, ইলিয়টস বীচ, আন্না সলল, হাইকোর্ট বিল্ডিং, মহামল্লাপুরম (মহাবালীপুরম) ৮ স্কোয়ার কিমি। মহাবল্লীপুরম সোর টেম্পল, অর্জুনা পেনান্স, পাঁচ রথ, টাইগার কেভ, ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক, তিরুকালুকুন্দ্রম।

কাঞ্চীপুরম

১১.৬ স্কোয়ার কিমি, ইকামবরেসবরা মন্দির, বৈকুণ্ঠ পেরুমাল মন্দির, কামাক্ষী আমন মন্দির, দেবরাজ স্বামী মন্দির (বরদারাজ) কৈলাস নাথ মন্দির, অন্দরক্যুপম প্রভু বালুসুব্রাম্মস্বামী মন্দির, ভেদান্তগল বার্ড সেঞ্চুরী, তিরুবন্নমালাই অরুণাচল মন্দির, ভেলোর পোর্ট, জলাকান্তেশ্বর মন্দির, ভেলোমাল্লাই কার্ত্তিক মন্দির, তিরুভান্না শিব-পার্বতী মন্দির।

পন্ডিচেরী
৫৮ স্কোয়ার কিমি

দেখার জায়গা- রাজ নিবাস, পন্ডিচেরী মিউজিয়াম, অরোবিলা মাতৃমন্দির, মানাকুলা বিনয়সাগর গনেশ মন্দির, পন্ডী সীবীচ মন্দির। তাঞ্জিবুর- ২৯.২৪ স্কোয়ার কিমি। তাঞ্জাবুর মিউজিয়াম, রাজারাজা চোলা আর্ট গ্যালারি, ব্রিহেদশওয়ারা মন্দির এবং দুর্গ, রয়েল মিউজিয়াম এবং শেরফোজী স্মরণ ঘর, হল অফ মিউজিক, সরস্বতী মহল লাইব্রেরী, মাদুরাই এর মিনাক্ষী মন্দির। মাউনটেন রিট্রিট (উদগামানদলাম) ওটি। ওটি হ্রদ, ওটি বোটানিক্যাল গার্ডেন, শ্রীরঙ্গমে শ্রী রঙ্গনাথ টেম্পল, ব্রিদেশ্বরা টেম্পল, অরোকিয়া মাধা চার্চ, চিদাম্বরম নটরাজ টেম্পল, ভেলোর পোর্ট, কৈলাশনাথ টেম্পল, পল্লবদের শোর টেম্পল, সান টম চার্চ, ওয়ালাজা মসজিদ।

'চোলা মন্দির'

(তাঞ্জাবুর, গণগইকোন্ডাচোলাপুরম এবং ধারাসুরম)

জেলা-পেরুমবালুর, চেন্নাই থেকে দূরত্ব ২৬০ কিমি। ব্রিহাডিস্বারা মন্দির, তাঞ্জাবুর, বিকসতানা মূর্ত্তি, তাঞ্জাবুর, আলিনগনা- চন্দ্রশেখরা মূর্ত্তি, ডিভারা-পালা, তাঞ্জাবুর, কলানটাকা, শিল্পীদের শিল্প সংরক্ষণ কেন্দ্র। চোল রাজা, রাজারাজা ও তার গুরু, ব্রিহাডিসবারা মন্দির, গণগইকোন্ডা চোলাপুরম।

চন্দ্রশ্বেনুগ্রাহ মুর্ত্তি, -	গণগইকোন্ডাচোলাপুরম,
নটরাজ মন্দির-	গণগইকোন্ডাচোলাপুরম,
শিব মন্দির-	গণগইকোন্ডাচোলাপুরম,
ব্রিহাডিসবারা মন্দির-	গণগইকোন্ডাচোলাপুরম,
কার্ত্তিক মন্দির-	গণগইকোন্ডাচোলাপুরম,
ব্রহ্মা মন্দির-	গণগইকোন্ডাচোলাপুরম,
নবগ্রহ মন্দির-	গণগইকোন্ডাচোলাপুরম,
ঐরাবতেশ্বরা মন্দির-	ধারা সুরম
চৌরিমন্দির -	ধারা সুরম
কঙ্কলা মূর্ত্তি মন্দির-	ধারা সুরম
ঋষি শ্রী মন্দির-	ধারা সুরম

মহাবল্লীপুরম

করমণ্ডল উপত্যকা - চেন্নাই থেকে ৫৮ কিমি. দেওয়ালে অর্জুন অংকিত বিশ্রামরত হরিণদের পাথরে মূর্ত্তি।

মহাবল্লীপুরম শোর মন্দির, পল্লব সাম্রাজ্যের পাহাড়ের গায়ে কারুশিল্প, খোদাই করা হাতীর পাল। মহেন্দ্রবর্মণ প্রথমের গুহা মন্দির। নরসিমা বর্মনের আমলে তৈরি মন্দির, পরমেশ্বরা মন্দির, রাজাসিমহা স্তম্ভ।

পল্লব রাজারা ও রাজত্বকাল

(১) দ্বিতীয় সিমহাবর্ম্মা -	(৫৩৫-৫৮০)
(২) সিমহারিষ্কুবর্মন - ২য়	(৫৬০-৫৮০)
(৩) প্রথম মহেন্দ্র বর্মন	(৫৮০-৬৩০)
(৪) নরসিমাবর্মন ১ম মামালা	(৬৩০-৬৬৮)

(৫) দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন (৬৬৮-৬৭২)
(৬) প্রথম পরমেশ্বরাবর্ম্মন (৬৭২- ৭০০)
(৭) দ্বিতীয় নরসীমা বর্ম্মন (৭০০-৭২৮)

ওরফে রাজাসীমা

(৮) তৃতীয় মহেন্দ্রবর্ম্মন (যুবরাজ সহ শাসক)
(৯) দ্বিতীয় পরমেশ্বরাবর্ম্মন (৭২৮-৭৩১)
(১০) নন্দীবর্ম্মন ২য় পল্লবামালা (৭৩১-৭৯৬)
আরও ৫ জন পল্লব রাজা ৮৯৪ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন।

রথগুলো

(১) দ্রৌপদী পাথরে খোদাই - মহাবল্লীপুরম সুন্দর রথ
(২) অর্জুন রথ - মহাবল্লীপুরম সুন্দর রথ।
(৩) ভীমা রথ - মহাবল্লীপুরম।
(৪) ধর্মরাজ রথ - মহাবল্লীপুরম।
(৫) আর্ধনারী এবং হরিহরা মূর্ত্তি - মহাবল্লীপুরম।
(৬) নকুল-সহদেব রথ - মহাবল্লীপুরম।
(৭) অর্জুনের পাথরের সৃষ্টশিল্প - মহাবল্লীপুরম।
(৮) কৃষ্ণ মন্ডপ - মহাবল্লীপুরম।
(৯) গনেশ রথ - মহাবল্লীপুরম।
(১০) পঞ্চপান্ডব - মহাবল্লীপুরম।
(১১) কোথিকাল মন্ডপ - মহাবল্লীপুরম।
(১২) বর্ষা মণ্ডপ - মহাবল্লীপুরম।
(১৩) ত্রিবিক্রমা মন্ডপ - মহাবল্লীপুরম।
(১৪) রায়া গোপুরম - মহাবল্লীপুরম।
(১৫) গঙ্গা, রায়া গোপুরমন্দির - মহাবল্লীপুরম।
(১৬) অলাকার্নিশবারা মন্দির - মহাবল্লীপুরম।
(১৭) মহিষামর্দ্দিনী গুহা - মহাবল্লীপুরম।

(১৮) সুদর্শনা এবং নন্দকা গুহা - মহাবল্লীপুরম।
(১৯) আদি-বর্ষা মন্ডপ - মহাবল্লীপুরম।
(২০) শোর টেম্পল - মহাবল্লীপুরম।
(২১) রাজাসিমহেসররা সোমাসকান্দা মন্দির - মহাবল্লীপুরম।
(২২) শিকারা মন্দির - মহাবল্লীপুরম।
(২৩) তালাশায়ানা পেরুমল মন্দির - মহাবল্লীপুরম।
(২৪) মুকুন্দনায়ানার মন্দির - মহাবল্লীপুরম।
(২৫) বলাইয়ানকুথাই রথ - মহাবল্লীপুরম।
(২৬) পিডারী রথ - মহাবল্লীপুরম।
(২৭) ব্যাঘ্র গুহা - মহাবল্লীপুরম।
(২৮) অতীরানাচন্দ গুহা - মহাবল্লীপুরম।

মহাবালীপুরম জেলা- চিংলেপুত, তামিলনাড়ু। পুরনো নাম (মামালাপুরম)

পন্ডিচেরী ও শ্রীঅরবিন্দ

পন্ডিচেরীতে গিয়ে যেন এক অভূতপূর্ব অনুভূতি বোধ হল। নীরব, নিস্তব্ধ এবং অরবিন্দ আশ্রমে যেন এক স্বর্গীয় অনুভূতি। সবাই চুপ, নীরবতা পালন করছে। নানা জাতির লোক দেখলাম, বাঙালি, অবাঙালী, দেশী বিদেশী, কিন্তু সবাই আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। আমার কৌতুহলী মন জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। ইতিহাস পড়ার সুবাদে ঋষি অরবিন্দ সম্বন্ধে জানতাম তবে খুবই সামান্য। যেহেতু খোদ অরবিন্দ আশ্রমে উনার সমাধি, উনার বিগ্রহ সম্মুখে, সুতরাং আমি সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নই, জানার ইচ্ছে অরবিন্দ জীবনের কাহিনীগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। এমনকি পারিবারিক জীবন, শিক্ষা জীবন ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে কিছুই জানতাম না। হয়ত বা এই বেরোনোর সুযোগ অন্য নানা কিছুর মাঝে ঋষি অরবিন্দ সম্বন্ধে নিজেকে জানতে লেখতে এবং উৎসাহীদের জানাতে সুযোগ করে দেয়। এই সংগ্রহে আমাকে একটি ছেলে সাহায্য করে সে পশ্চিমবাংলার বর্ধমান জেলার।

১৮৭২ সালের ১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পরিবারের তৃতীয় সন্তান। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ, মাতা- স্বর্ণলতা ঘোষ। বাবা ছিলেন চিকিৎসক। শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়

কলকাতায়। ব্যরিস্টার শ্রী মনমোহন ঘোষের বাড়িতে। মনমোহন ঘোষ অরবিন্দের বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। প্রগতিশীল মনের অধিকারী ডাঃ কে ডি ঘোষ কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৮৬৯ সালে পাশ করে স্কটল্যান্ডের এবারডিন শহরে যান উচ্চতর ডাক্তারী শিক্ষার্থে। ১৮৭১ সালে ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ দেশে ফিরে আসেন এবং সরকারী চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পাক্কা সাহেব হয়ে তিনি দেশে ফেরেন। ইংরাজদের তিনি প্রশংসা করতেন। কিন্তু গরীব ও আর্তের সেবায় তার দরজা সর্বদা খোলা ছিল। কর্মজীবনে তার জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা ছিল তুঙ্গে। রংপুরে থাকাকালীন তিনি একটি নিকাশী খাল তৈরি করান। জনসাধারণ এর নামকরণ করে কে ডি ক্যানাল। তার জনপ্রিয়তা ইংরেজদের মোটেই পছন্দের ছিলনা। তার ইংরাজপ্রীতি সত্বেও ইংরেজ শাসকদের সাথে তার সম্পর্ক সুখের ছিল না। উনার খাদ্য, পোষাক, আদবকায়দা ছিল পুরোপুরি সাহেবি। অরবিন্দ পাঁচ বছর বয়স হতেই দার্জিলিং লরেটো কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের বেশির ভাগ ছাত্র ছিল ইংরেজ। শৈশবে দু বছর নিজের দেশেই বিদেশি পরিবেশে কাটান শ্রী অরবিন্দ। যদিও এখানে তার কোন উল্লেখযোগ্য শিক্ষালাভ ঘটেনি। দার্জিলিং এ অরবিন্দ অনুভব করেছিলেন অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। শ্রী অরবিন্দের চার ভাই। বিনয়ভূষণ ঘোষ, মনমোহন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ। ম্যানচেস্টার শহরে ড্রুইট পরিবারে শ্রীঅরবিন্দ সহ তিন ভাই থাকতেন। ড্রুইট পরিবারে ছিল রেভারেন্ড ড্রুইট, তার স্ত্রী ও বৃদ্ধা মা। অরবিন্দের বাবা চাইতেন না উনার ছেলেরা ভারতীয়দের সঙ্গে মিশুক ও তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করুক। তা ছিল ডাক্তার ঘোষের কড়া অনুশাসন। ১৮৭৯ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ চৌদ্দ বছর ইংল্যান্ডে কাটান। প্রথম পাঁচ বছর ম্যানচেস্টারে, পরের ছয় বছর লন্ডনে, এবং শেষ তিন বছর কেমব্রিজে। এসময় কার্যত শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশ থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শ্রীঅরবিন্দ নিজেই লিখেছেন স্বদেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, স্বদেশবাসী তার ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতার মধ্যে তার একটা সময় কেটেছে। বড় ভাই ম্যানচেস্টারে গ্রামার স্কুলে পড়তে গেলেন। আর শ্রী অরবিন্দকে ড্রুইট সাহেব বাড়িতে পড়াতে লাগলেন। রেভারেন্ড ড্রুইট লাটিন এবং ইংরেজী ভাষা পারদর্শী ছিলেন। ড্রুইট পত্নী তাকে অঙ্ক, ভুগোল ও ফরাসি ভাষা পড়ানোর ভার নিলেন। উনারা বুঝতে পেরেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ এক অসাধারণ গুণ সম্পন্ন বালক। তীক্ষ্ন মেধা, মনঃসংযোগ, মধুর ব্যবহার, ধীরতা ইত্যাদি গুণের অধিকারী। বড় ভাই বিনয়ভূষণ বলেছেন শান্ত ও ভদ্র অরবিন্দ কখনো একরোখা হয়ে পড়ত। ১৮৮৪ সালে ড্রুইট সাহেব অস্ট্রেলিয়া বাসের সিদ্ধান্ত নেন। তাদের তিনভাইকে দেখা শোনার দায়িত্ব নেন উনার মা। ১৮৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনের সেন্টপলস্ স্কুলে শ্রীঅরবিন্দ ও মনমোহন ভর্তি হলেন। সেন্টপলস তৎকালীন ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ স্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রধান শিক্ষক মিঃ ওয়াকার ছিলেন সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্।

স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ খুব ভাল ফল করে। আলিপুর বোমা মামলায় যখন অরবিন্দের নাম ইংল্যান্ডে বহুল আলোচিত হচ্ছিল তখন তার প্রধান শিক্ষক অরবিন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে সকল ছাত্র তখন সেন্ট পলস স্কুলে পড়াশুনা করেছেন তার মধ্যে অরবিন্দ মেধাবী ছিলেন।

অরবিন্দের বাবা কৃষ্ণধন ভাল চাকুরী করতেন। সমাজে তাঁর অধিষ্টান ছিল উচ্চে। প্রথমে ম্যানচেস্টারের দিনগুলো সহজভাবেই কাটছিল। কৃষ্ণধন যে ৩৬০ পাউন্ড করে পাঠাতেন তা খরচের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু লন্ডনে তা বেশ জটিল হয়ে গেল। কৃষ্ণধন দানধ্যানে উদারহস্ত, খানিকটা বেপরোয়া। তা করতে গিয়ে ছেলেদের প্রয়োজন উপেক্ষিত হতে থাকল। অবস্থা চরমে পৌঁছল যখন শ্রীঅরবিন্দ ও ভাইদের লন্ডনে ড্রুইট সাহেবের মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করতে হল। তিনভাই কার্যত এই সময় কপর্দকশূন্য। বাবার কাছ থেকে কোন চিঠি নেই, টাকা পয়সা পাঠানো বন্ধ তার উপর খাদ্যাভাব, এই সময়ে এক দয়ালু ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ঘটল। ডাঃ কে ডি ঘোষের সুহৃদ, স্যার হেনরী কটনের ভাই জেমস কটনের সঙ্গে তাদের পরিচয় হল। জেমস কটন ছিলেন সে সময়ে ক্রমওয়েল রোডে অবস্থিত। সাউথ কেনসিংটন লিবারেল ক্লাবের সচিব। বালকদের শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি বড় বিনয়ভূষণকে সামান্য বেতনের এক চাকুরী ঠিক করে দিলেন। ক্লাবের অফিস ঘরে শ্রী অরবিন্দের থাকার ব্যবস্থা হল। বাস্তবিক ঘরটি বসবাসের পক্ষে ছিল অনুপযুক্ত। তবুও বালকদের আশ্রয়ের পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। আর্থিক টানাটানির মধ্যে তিন ভাইয়ের লন্ডনের মত শহরে থাকতে হল, শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার মত কোন বেশভূষা ও শ্রীঅরবিন্দের ছিল না। ক্রমওয়েল রোডে থাকবার এই কষ্ট মনমোহন দীর্ঘকাল সহ্য করতে পারলেন না। তিনি অন্যত্র সুবিধামত চলে গেলেন। ১৮৮৭ সালে অক্সফোর্ড ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজে একটা বৃত্তি পাওয়াতে তার আর্থিক অবস্থারও কিছু উন্নতি ঘটল। শ্রীঅরবিন্দ ক্রমওয়েল রোডে ১৮৮৭- সেপ্টেম্বর থকে ১৮৮৯ এর এপ্রিল পর্যন্ত থেকে গেলেন।

সকল কষ্টদুঃখের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ তার বিদ্যানুশীলন ত্যাগ করেননি।

মাঝে মাঝেই তাঁর কবি-সত্তা প্রকাশ পেয়েছে গ্রীক, ল্যাটিন বা ইংরেজী কবিতা রচনায়। বহু বিষয়ে তাঁর আকর্ষণ ছিল। বহু বিষয়ে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। আবার ত্যাগ্য করেছেন কিন্তু কাব্যলক্ষীর সাধনা তিনি সারা জীবন করে গেছেন। এই অনুপ্রেরণা সম্ভবত তিনি মায়ের কাছ থেকে পান, যা বর্ধিত হয় মেজভাই মনমোহনের সাহচর্যেও প্রেরণায়। কবি হিসাবে খ্যাতি মনমোহন ইতিমধ্যে অর্জন করেছেন। সহপাঠী laurence Binyon এবং Stepen Philips এর ন্যায় উত্তরকালের প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী ও কবিদের সঙ্গে মনমোহনের বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। বিখ্যাত Oscar wilde এর সঙ্গেও তাঁর আলাপ ছিল। শ্রীঅরবিন্দ সতের বছর বয়সে গ্রীক

কবিতা Hecuba র অনুবাদ করেন। বিনিয়ন এই কবিতা পাঠ করেন অযাচিতভাবে তাঁকে উৎসাহিত করেন যেন তিনি কবিতা রচনার অভ্যাস ত্যাগ না করেন। তিন ভাইয়ের জীবনযাপনের কৃচ্ছতা ও কষ্টকর দিনগুলিতেও অনাবিল আনন্দের মুহূর্তও বিরল ছিল না। ছুটির অবকাশে তাঁরা বেড়াতে বার হতেন। একবার সৌন্দর্যময়ী লেক ডিস্ট্রিকটে বেড়াতে যান। এই সকল ভ্রমণকালে মাঝে মাঝে মজার মজার ঘটনা ঘটত। শ্রীঅরবিন্দ উল্লেখ করেছেন যে মনমোহনের মাঝে মাঝে কাব্যের ভূত ঘাড়ে চাপত। একদা কাম্বারল্যান্ড ভ্রমণকালে কবিতার ধ্যান করতে করতে অন্য সকলের থেকে মনমোহন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। জায়গাটা ছিল বিপদসঙ্কুল। তাঁরা চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন। কিন্তু শত অনুসন্ধানেও কোন ফল হয় না। মনমোহন সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন হয়ে কবিতা আওড়াতে আওড়াতে অবশেষে তাঁদের সঙ্গে ফিরে এসে যোগ দেন। ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীঅরবিন্দ সেন্ট পল, থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেন। সেই বছরই কেমব্রিজের কিংস কলেজে ভর্তির জন্য এক পরীক্ষায় তিনি বসেন। শ্রীঅরবিন্দের পাঠ্যসূচী ছিল গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হলেন এবং তৎসহ বাৎসরিক ৮০ পাউন্ড Senior Classical Schelarship লাভ করেন। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টা ও সামর্থ্য তিনি কেমব্রিজে উচ্চতর শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করলেন। ১৮৯০ সালে সেন্ট পলসের শেষ বছরে শ্রীঅরবিন্দ আই সি এস প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। লন্ডনে ঐ পরীক্ষা প্রতি বছরই হত। ভারতীয় ছাত্রদের এই পরীক্ষায় যোগদানের অনুমতি কর্তৃপক্ষ প্রথমে সহজে দেননি।

অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। ইংরাজ ছাত্রদের সঙ্গে খোলাখুলি প্রতিযোগিতা ভারতীয়দের করতে হত। আইসিএস চাকুরী জীবনের খ্যাতি। প্রতিপত্তি ক্ষমতা ও অর্থের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের কোন মোহ বা আকর্ষণ ছিল না। শুধুমাত্র তাঁর বাবা ইচ্ছানুসারেই তিনি পরীক্ষায় যোগদান করেন। কৃষ্ণধন এই উচ্চাশা পোষণ করতেন যে, তাঁর ছেলের একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বাবা যাতে নিরাশ না হন সে জন্যই পরীক্ষায় বসেন। ১৮৯০ সালের পরীক্ষার ফল ঘোষণা কালে দেখা গেল সফলকাম ছাত্রদের তালিকায় শ্রীঅরবিন্দ রয়েছেন। ল্যাটিন ও গ্রীকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে তিনি একাদশ স্থান পেয়েছেন। পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দের নিকট জিজ্ঞাসা করা হয় যে আই সি এস পরীক্ষায় পাশ করা বেশ কঠিন কাজ ছিল কি না? তিনি সংক্ষেপে বলেন, তাঁর সেটা মনে হয়নি শিক্ষানবিশ কালে শ্রীঅরবিন্দ বাৎসরিক ১৫০ পাউন্ড বৃত্তি পেতেন। শিক্ষানবিশ কাল ছিল দুই বৎসর। এই সময় তিন ক্যামব্রিজ অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়নে লিপ্ত ছিলেন? ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে তিনি সেন্ট পলস ছেড়ে অক্টোবর মাসে ক্যামব্রিজ কিংস কলেজে যোগ দেন। তখন তাঁর বয়স দু'মাস কম আঠার বছর। প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের

বরিষ্ঠ বিদ্যার্থী হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ ক্লাসিক্যাল ট্রপিস বি এ তে গ্রীক ও ল্যাটিন নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। কলেজে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হল। ছুটির সময় ছাড়া আপাতত দুবছর তাঁর বাসস্থান ছিল ক্যামব্রিজ ক্লাসিক্যাল ট্রপিকস এর পড়াশুনা ছাড়া শিক্ষানবিশ আই সি এস এর অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের জন্য তাঁকে প্রস্তুত হতে হচ্ছিল। পাঠ্যবিষয় গুলির মধ্যে ছিল আইন, রাজনৈতিক অর্থনীতি। ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃত। এছাড়া তাঁর মাতৃভাষা বাংলা তো ছিলই, যা তিনি একেবারেই জানতেন না। হিন্দিও তাঁকে শিখতে হয়েছিল অল্পবিস্তর। কারণ ডাঃ কৃষ্ণধনের ইচ্ছা ছিল স্যার হেনরি কষ্টনকে বলে শ্রী অরবিন্দকে বিহারের আরা জেলায় পোষ্টিং করান। শ্রীঅরবিন্দ এতগুলি বিষয় পড়াশুনার ক্লেশ লাঘব করতে পারতেন তাঁর গ্রীক ল্যাটিন পড়ার চাপ কমিয়ে. কিন্তু তাঁর চরিত্র ছিল ভিন্ন রকম। যদিও তাঁর ভবিষ্যত জীবন সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কোন কিছুই হালকাভাবে নেওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল Classical Scholar। হিসাবে তাঁর খ্যাতি ক্যামব্রিজে আসার আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর একজন প্রবীণ শিক্ষক শ্রীযুত জি ডব্লু প্রথেরো G W Prothero প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বদ্ধিজীবী অস্কার ব্রাউনিং এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। এই ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বাবাকে এক চিঠিতে লেখেন গতরাত্রে কলেজের এক প্রধান অধ্যাপকের গৃহে আমার কফি পানের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে আমার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্রাউনিং এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়. তিনি সপ্রশংসভাবে বলেন যে আমি বেশ ভালভাবে পাশ করেছি। গত তেরোটি পরীক্ষায় তিনি পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র দেখেছেন কিন্তু আমার মত এত ভাল উত্তর তিনি দেখেননি। ক্ল্যাকিক্যাল পরীক্ষার উত্তরপত্রে সেক্সপীয়র এবং মিল্টন এর তুলনামূলক নিবন্ধ সম্পর্কে ছিল। এই উক্তি এই রচনায় আমার প্রাচ্য মন কোন বাধা প্রতিবন্ধকতার ধারণা মেনে উজাড় করে বেরিয়ে এসেছিল। যদিও স্কুলে এই রচনাকে প্রাচ্যদেশীয় বাগাড়ম্বর বলে বাতিল করবে, তবু আমার মতে এই রচনা আমার অদ্যাবধি রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেমব্রিজের এই দু'বছর তিনি শুধু পড়াশুনায় কাল কাটাননি। খেলাধুলা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। অধ্যয়ন ব্যতীত কবিতা পাঠ এবং কবিতা রচনাও করেছেন। এই সময়কার কিছু কবিতা, তিনি ভারতে চলে আসার পর ১৮৯৫ সালে সং অফ মাইরিল্লা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। গ্রীক ও ল্যাটিন কবিতার অনুবাদও শ্রীঅরবিন্দ করেছিলেন। পরবর্তীকালে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা শ্রীঅরবিন্দ এই প্রসঙ্গে বলেন তাঁর এক সহপাঠী নরম্যান ফেরেরেস হোমারের কাব্যগ্রন্থের এক নির্বাচিত অংশ পাঠ করে যা তাঁর কাছে কবির সুন্দরতম কাব্য পংক্তিগুলির অন্যতম ছিল। তাঁর কাব্যপাঠের ছন্দ শ্রীঅরবিন্দকে অভিভূত করেছিল। গ্রীক ও ল্যাটিনের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার শব্দ ও বাগ্‌ধারার মিল আছে যা ইংরাজী ভাষায় পাওয়া দুস্কর। মেথউ এ্যারনলড় এবং অন্যান্য ইংরাজ কবিরা

হোমারের কোমানটিটিভ ছন্দমাধুর্য ঠিকমত ধরতে পারেননি। শ্রীঅরবিন্দের অহনা কবিতায় এই ছন্দের সার্থক প্রয়োগ আমরা খুঁজে পাই। সিঙ্গাপুর যাওয়ার পথে ১৯০৮ সালে ফেরেরেস সাহেব কলকাতায় আসেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন আলিপুর জেলে। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করার আপ্রান চেষ্টা করেন। কোন সাহায্য যদি তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়। ঘটনাটি সাক্ষ্য দেবে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যাঁরা একবার মিশেছেন তাঁরা কিভাবে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ক্যামব্রিজ যাওয়ার আগে থেকেই মাতৃভূমির প্রতি শ্রীঅরবিন্দ আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি তাঁকে আকৃষ্ট করে। বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে পিতা কৃষ্ণধন ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে দেশপ্রেমের প্রেরণা সঞ্চার করেন। সরকারী চাকুরী কালীন ডাক্তার ঘোষ ভারতীয়দের প্রতি ইংরাজ শাসক কুলের বহুবিধ অন্যায় ও অবিচার লক্ষ্য করেন। তাঁর মত স্বাধীনচেতা ব্যক্তির পক্ষে যা ছিল অসহনীয়। একবার কৃষ্ণধন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এক সাক্ষাৎ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। স্থানীয় সংবাদপত্রে ইংরাজ শাসককুলের নানা কুকীর্তি ও দুর্ব্যবহারের খবর ছাপা হত। কৃষ্ণধন সেইসব সংবাদের অংশ সংগ্রহ করে ছেলেদের পাঠাতেন। শ্রীঅরবিন্দ গভীর আগ্রহ ও ঘৃণার সঙ্গে সেইসব পাঠ করতেন। এই সেই পিতা কৃষ্ণধন যিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছেলেদের উপর যেন ভারতীয় কোন প্রভাব না পড়ে। কিন্তু কার্যত শ্রীঅরবিন্দের জীবনে দেশপ্রেম ও দেশের প্রতি আকর্ষণ স্বরূপ বীজ তিনিই রোপন করলেন। রাজনীতির প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ শ্রীঅরবিন্দকে ভারতীয় মজলিশের প্রতি আকৃষ্ট করে। তিনি এর কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। মাত্র কয়েক বছর আগে কেমব্রিজ পাঠরত ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ এই সংগঠন তৈরি করেন। বাহ্যত এটাকে সামাজিক মেলামেশার কেন্দ্র মনে হলেও মজলিশ ছিল রাজনীতি সচেতন ছাত্রদের মিলনস্থল। এই ছাত্ররা ব্রিটিশ রাজত্বের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই সব সম্মেলনে বিতর্ক ও আলোচনা চলত। শ্রীঅরবিন্দ মজলিশে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন। প্রায়ই মজলিশের সভাসমূহে জ্বালাময়ী বক্তৃতা হত। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ এক মজার ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন। এক প্রাকস্নাতক একদিন স্বাধীনতার উপর এক চমৎকার বক্তৃতা দেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি মিশরের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে মিশরীয়রা পরাধীনতার বিরুদ্ধে সকলে একযোগে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বাক্যটি ও উদাহরণ তিনি তিন তিনবার দিলে, একজন শ্রোতা বলে ওঠেন মিসরীয়দের তাহলে কতবার পতন হয়েছিল ? শ্রীঅরবিন্দের কেমব্রিজের দিনগুলিতে এমনি আরেক মজার ঘটনা ঘটেছিল। এক পাঞ্জাবী ছাত্রের বাগ্মিতা ও বক্তব্যের দৃঢ়তার তাঁদের বাকরুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। ছাত্রটি বলেছিল সব মিথ্যেবাদী আমরা সব মিথ্যেবাদী। সে বলতে চেয়েছিল লায়ার কিন্তু উচ্চারণের এই ভুল তার বক্তব্যকে দিয়েছিল একটা গভীর দার্শনিক ও সার্বজনীন ব্যঞ্জনা। মানব [illegible]ত্রের এটাই

বোধ করি শেষ কথা। পুরানীরা লাইফ অফ শ্রী অরবিন্দ গ্রন্থে এই সময়ের এক চমৎকার ঘটনার বর্ণনা পাই। আই সি এস শিক্ষানবিশ কালে মিঃ টোয়ারস নামে এক অবসর প্রাপ্ত আই সি এস শ্রীঅরবিন্দের বাংলার শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে পন্ডিত টয়ারস বলা হত। বোধ হয় তার বিদ্যার পরিধি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ একজন তাঁর শিক্ষকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠের জন্য নিয়ে গেলে মিঃ টোয়ারস এর আদৌ তা বোধগম্য হল না। তিনি বললেন, এতো বাংলা নয়। ১৮৯২ সালের মে মাসে শ্রীঅরবিন্দ ক্লাসিক্যাল ট্রপিস পরীক্ষার প্রথম ভাগে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পাশ করলেন। বিদ্যার্থীর আশা আকাঙ্খা সার্থক হল। পরীক্ষায় কৃতকার্যতার জন্য কলেজের প্রতীক চিহ্নিত ৪০ পাউন্ডের পুস্তকাবলী শ্রীঅরবিন্দকে পুসস্কার হিসাবে দেওয়া হয়। গ্রীক ও ল্যাটিনে কবিতা রচনার জন্য তিনি ইতিপূর্বে পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু এত সব কৃতিত্ব সত্ত্বেও শ্রী অরবিন্দ স্নাতক হতে পারেননি। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বি এ ডিগ্রি পেতে গেলে তিন বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক থাকতে হত কিন্তু শ্রী অরবিন্দ দু'বছর পরে কেমব্রিজ ছেড়ে চলে আসেন। বাস্তবিক তাঁর কোন ডিগ্রির প্রতি আকর্ষণ ছিল না। তাঁর মতে কেবলমাত্র চাকুরী বা অধ্যাপনার ক্ষেত্রে ঐরূপ ডিগ্রির উপযোগিতা ছিল। অন্যথায় জ্ঞানী বা বিদ্বানের কাজের অভাব ঘটে না। ঐ বছরেই আগস্ট মাসে ১৮৯২ শ্রীঅরবিন্দ আই সি এস পরীক্ষায় পাস করেন। লোভনীয় চাকুরীতে যোগদানের সুযোগ তাঁর সামনে এল। একটি মাত্র শর্ত অশ্বারোহনে সাফল্য বাকি রইল। আগস্ট থেকে নভেম্বর শ্রী অরবিন্দ চারবারএই পরীক্ষার সুযোগ পেলেন কিন্তু প্রক্যেতবারই পরীক্ষার সময় তিনি অনুপস্থিত। মনে হয় তিনি আই সি এস এর চাকুরী নেবেন না ঠিক করেছিলেন। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করেন, আপনি আই সি এস পরীক্ষায় আদৌ বসলেন কেন? অন্য আর কিছুর প্রেরণায় যোগের কি অশ্বারোহন পরীক্ষা হতে বিরত হন? উত্তরে শ্রী অরবিন্দ বলেন, না, না যোগের কোন অভিজ্ঞতাই আমার সে সময় ছিল না। শুধুমাত্র পিতার ইচ্ছানুসারে তিনি পরীক্ষায় বসেন। ঐ কাজের দায়িত্ব সম্বন্ধে অত কম বয়সে তাঁর কোন ধারণা ছিলনা। প্রশাসনের কাজে- তাঁর আদৌ কোন আকর্ষণ ছিল না। তাঁর আগ্রহ ছিল কবিতা ও সাহিত্য, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় ও দেশের স্বাধীনতা প্রয়াসে। ১৮৯২ এর অক্টোবর মাসে শ্রী অরবিন্দ কেমব্রিজ ছেড়ে লন্ডনে চলে আসেন। অশ্বারোহন পাশ করার আর এক সুযোগ পান ১৫ ই নভেম্বর। শ্রী অরবিন্দ ঐদিন পরীক্ষা কেন্দ্রে না গিয়ে লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন। সন্ধ্যায় বাড়ি এসে বড় ভাই বিনয় ভূষণকে বললেন, আমি বাদ পড়ে গেছি। কিছুক্ষণ পরে মেজভাই মনমোহন বাড়িতে এসে যখন শুনলেন, তিনিও চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ি ফাটাতে লাগলেন। এত সবের মধ্যেও শ্রী অরবিন্দ নিশ্চুপ নিরুদ্বিগ্ন। শুধুমাত্র মনমোহনই নয়। শ্রী অরবিন্দের এইরূপ ব্যবহারে তাঁর শিক্ষক প্রথেরো ও কটন সাহেব

উভয়েই খুব বিচলিত হন। তাঁদের মতে শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ঘোরতর অবিচার হয়েছে। তাঁরা সিভিল সার্ভিস কমিশন এর নিকট এই প্রসঙ্গে তুলতে মনস্থ করলেন। কটন সাহেবকে এক পথে প্রথেরো সাহেব লিখলেন, আপনার নিকট ঘোষ সম্পর্কিত খবর পেয়ে আমার খুবই খারাপ লাগছে যে, শুধুমাত্র অশ্বারোহনের অকৃতকার্যতার জন্য তাকে আই সি এস পরীক্ষায় পাস করান হল না। তার এখানকার ছাত্র জীবন সত্যিই অনুকরণীয়। কলেজে সে বরাবর ভাল ছাত্র হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছে। ক্লাসিক্যাল ট্রিপস এ প্রথম শ্রেণীতে সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। সাহিত্য কৃতিত্ব ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তির জন্য শ্রী অরবিন্দ কলেজে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছে। একজন আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের পক্ষে এইসব কৃতিত্বও। আই সি এসএর মত কঠিন পরীক্ষায় প্রস্তুতি তার অসাধারণ পরিশ্রম কুশলতা ও উৎকর্ষের সাক্ষাত দেবে। ক্লাসিক্যাল বিদ্যায় তার অধিকার ছাড়াও ইংরাজী সাহিত্যে তার জ্ঞান অন্য যে কোন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের তুলনায় ঢের ঢের বেশি লক্ষ্য করেছি। অনেক ইংরেজ শিক্ষিত যুবকের তুলনায় তার ইংরাজী লিখন শৈলী ও অনেক উন্নত মানের। এইরকম এক ব্যক্তি ভারত সরকারের চাকুরীতে শুধুমাত্র ঘোড়ায় চড়তে না পারার জন্য নিয়োগ না করা সত্য সত্যই আমার মতে সরকারী অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। যদি তাকে চাকুরী না দেওয়াই ঠিক হয়ে থাকে, তবে আইনগত যাথার্থ্য সত্বেও সেটা হবে তার প্রতি নৈতিক অবিচার। আর ভারত সরকারের পক্ষে সত্যিকারের লোকসান। তাছাড়া দক্ষতা এবং চরিত্রগুণ উভয়ই শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি। গত দু'বছর তার খুবই কষ্টের মধ্যে কেটেছে। বাড়ি থেকে টাকাপয়সা নিয়মিত আসত না শ্রী অরবিন্দ ও অপর দু'ভাই সেই অবস্থায় দিন কাটিয়েছে। তা সত্বেও তার সাহস ও নিষ্ঠার অভাব ঘটেনি। কর্তৃপক্ষকে এই চিঠিতে মিঃ কটন আরও লেখেন মিঃ এ ঘোষ ও তার দুই ভাইকে বিগত পাঁচ বছর কাল আমি দেখে আসছি। আমি তাদের দুর্দশায় জীবন ধারণের সাক্ষী। তাদের পিতা বঙ্গদেশের একজন সরকারী চিকিৎসক। যিনি ছেলেদের যে কোন কারণেই হোক টাকা পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পরিবেশের মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। কোন ইংরাজ তাদের সাহায্য বা উপদেশ দিতে এগিয়ে আসেননি। এমতাবস্থায় মহামান্য ভারত সচিব কি মিঃ ঘোষকে আরেকটি সুযোগ দিতে পারেন না? মিঃ কটন এ ব্যাপারে অশ্বারোহন প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাস্থানে যাওয়ার যাবতীয় ব্যয় বহনে রাজী ছিলেন। এই ঘটনার এত বিস্তৃত আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বলা যে, কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শ্রী অরবিন্দের ইংল্যান্ডের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে এবং কত সহজে তিনি এর সম্মুখীন হয়েছেন। অপর দিকটি হল ইংরাজ চরিত্রের মহত্ব এই দুই পত্রে কত সুন্দর প্রকাশ পায়। এই দুই পত্রে কাজ হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ শ্রীঅরবিন্দকে আরেকটি সুযোগ দিতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ

করতে ব্যর্থ হন। শ্রী অরবিন্দ অশ্বারোহনে অকৃতকার্যতার জন্য আই সি এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারলেন না। এই প্রসঙ্গে আমাদের আরেকটি বিষয় স্মরণীয়। কর্তৃপক্ষ মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন শ্রী অরবিন্দ যেন চাকুরীতে যোগদান করতে না পারেন। তাঁরা ইচ্ছা করলে শ্রী অরবিন্দকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরেও অশ্বারোহন পরীক্ষার সুযোগ দিতে পারতেন। পরবর্তী সময়ে এমন নজিরও ছিল। সম্ভবত তাঁরা ক্যামব্রিজে শ্রী অরবিন্দের রাজনৈতিক বক্তৃতায় তাঁদের মধ্যে এমন ধারণা হয়েছিল যে, আই সি এস এর চাকুরীতে শ্রী অরবিন্দ তাঁদের কাছে গলায় কাঁটা ফোটার মতো অবস্থা সৃষ্টি করবেন। আসলে তাঁরা তো জানতেন না যে, পরবর্তীকালে শ্রী অরবিন্দ তাঁর কার্যকলাপ দ্বারা অনেক বেশি সরকারের ক্ষতি সাধন করবেন। শ্রী অরবিন্দ আই সি এস এ যোগদান না করায় মাতৃভূমির প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশই অভিব্যক্ত হল।

শ্রীঅরবিন্দ তখন ২১ বৎসরের যুবক। এই বয়সে আই সি এস এর মতো লোভনীয় চাকুরী ত্যাগ করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। তিনি ছিলেন এই ব্যাপারে পথিকৃত। আর সম্ভবত ১৯২০ সালে সুভাষচন্দ্রের আই সি এস চাকুরীতে ইস্তফা তাঁরই প্রেরণায় ঘটে থাকবে। অপর একটি ঘটনায় মাতৃভূমির সেবায় শ্রীঅরবিন্দের আকর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। লন্ডনে অবস্থান কালে 'কমল ও অসি' নামক এক গুপ্ত সমিতির তিনি সদস্য হন। এর সদস্যারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও বিদেশির অধীনে চাকুরী বর্জনের সম্ভাবনা ও প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন। এই গুপ্ত সমিতি বেশিদিন টেকেনি। অধিকাংশই পরবর্তীকালে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ব্যতিক্রমদের মধ্যে অন্যতম। মনোমত একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষে ফিরে আসতে চাইছিলেন। সুযোগ একটা এসেও গেল। এই ঘটনার কথা স্মরণ করে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, আশ্চর্যভাবে সময়ই নিজে সব ঠিক করে নেয়। অশ্বারোহনে অকৃতকার্য হয়ে যখন আমি চাকুরীর চেষ্টা করছিলাম বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড সে সময় লন্ডনে ছিলেন। আমার ঠিক মনে নেই কিভাবে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। চাকুরীতে মাহিনার ব্যাপারে আমরা একজন (বরোদার) প্রবীণ আমলার সঙ্গে কথা বললাম। এই সব ব্যাপারে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি পরামর্শ দিলেন মাসে ২০০ টাকা চাওয়া যেতে পারে, কম করে ১৩০ ও গ্রহণযোগ্য। ১৩০ মানে ১০ পাউন্ড, মাহিনা হিসাবে যথেষ্ট ভাল। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মিঃ জেমস কটনের উপর আমি সিদ্ধান্তের ভার দিলাম। সাংসারিক জীবন সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। এইভাবে বরোদার রাজকার্যে শ্রীঅরবিন্দ যোগ দিলেন। মহারাজা গায়কোয়াড় যে এই নিয়োগে খুশি হয়েছিলেন বোঝা যায়। কারণ তিনি বলতেন একজন। আই সি এস কে তিনি ২০০ টাকা মাসিক বেতনে লাভ করেছেন। সেই আমলের হিসাবে অবশ্য দুশ টাকা প্রারম্ভিক মাসিক বেতন হিসাবে যথেষ্ট ভাল

ছিল। শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করতে লাগলেন। আই সি এস এর স্টাইপেন্ডদের বাকি বকেয়া পেয়ে গেলেন। এতে তাঁর ধার দেনা শোধ করে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পাথেয়ের জোগাড় হল। তাঁর এইসব দেনার ব্যাপারে এক মজার গল্প শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বলেছিলেন। কেমব্রিজের এক দর্জি শ্রীঅরবিন্দকে ধারে পোশাক পরিচ্ছদ সরবরাহ করত। তিনি লন্ডন চলে গেলে সেই দর্জি তাঁর ঠিকানা জোগাড় করে মহমোহনের কাছ থেকে পোশাকের অর্ডার আদায় করে। মনমোহনের পছন্দ ছিল ফিকে লালের ভেলভেটের পোশাক। সেই পোশাকে তিনি অস্কার ওয়াইল্ড এব কাছে যেতেন। আমরা ভারতে চলে আসি। কিন্তু সেই দর্জি তার পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়নি। সে বাংলা সরকার ও বরোদারাজ্যে আমাদের কাছ থেকে পাওনার ব্যাপারে যোগাযোগ করে। আমি তার সব দেনা শোধ করে দিই। মাত্র সামান্য কিছু বাকি ছিল। বরোদার মহারাজার কথা মত সেটাও আমরা দিয়েছি। এই টাকাটা না দিলেও আমাদের চলত কারণ সেই দর্জি সবসময় আমাদের কাছ থেকে বাজার ছাড়া দাম আদায় করে নিত। যদিও শ্রীঅরবিন্দ চৌদ্দ বছর ইংল্যান্ডে ছিলেন কিন্তু সে দেশ ছেড়ে আসতে তাঁর কোন দুঃখবোধ হয়নি। এক শিষ্যকে তিনি লিখেছিলেন, ইংরাজী ও ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল বটে। তবে দেশ হিসাবে ইংল্যান্ডেব প্রতি নয়। যদি ইউরোপীয় কোন দেশের প্রতি ভাবাবেগ ও বুদ্ধিগত কোন আকর্ষণ থাকে তবে সে দেশ ইংল্যান্ড নয় ফ্রান্স যেখানে তাঁর যাওয়া বা থাকা এ জীবনে হয়নি। ২ ই জানুয়ারী ১৮৯৩ খ্রী শ্রী অরবিন্দ এস এস কার্থেজ জাহাজে ইংল্যান্ড ত্যাগ করেন। কিন্তু এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আনন্দ নষ্ট করে দেয়। স্বভাবতই অনুমান করা যায়, এতদিন বিচ্ছেদের পর ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ পুত্রের প্রত্যাবর্তনের জন্য কি অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিলেন। মনে হয় পুত্রকে দেখার জন্য তিনি বোম্বাই গিয়েছিলেন। কিন্তু কোন জাহাজে শ্রী অরবিন্দ ফিরছেন সবিশেষ না জানতে পেরে খুলনায় তাঁর কর্মস্থলে ফিরে আসেন। তাঁর ব্যাঙ্কার গ্রিন্ডলে এন্ড কোং এর কাছে খবর পান। শ্রীঅরবিন্দ ইংল্যান্ড থেকে রুমানিয়া জাহাজে ফিরছিলেন। সেই জাহাজ পর্তুগাল উপকূলে ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। কোন যাত্রীই রক্ষা পায়নি। ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্বল শরীরে কৃষ্ণধন এ আঘাত সহ্য করতে পারেননি। শ্রীঅরবিন্দের নাম করতে করতে তিনি দেহত্যাগ করেন। কার্থেজ জাহাজ শ্রী অরবিন্দকে নিয়ে যথাসময়ে ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ সালে বোম্বাই পৌঁছায়। বোম্বাই পৌঁছানোর দুদিন পরে শ্রীঅরবিন্দ ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ সালে বরোদা পৌঁছান আমাদের আশ্চর্য মনে হবে। শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মিলিত না হয়ে কেন সোজা বরোদায় চলে আসেন। তিনি কি তাঁর পিতার মৃত্যু ও মায়ের অসুস্থতার খবর জানতে পেরেছিলেন? মনে হয় বরোদায় চাকুরীতে সত্তর যোগদান করে তারপর ছুটি নিয়ে তিনি বাংলায় যেতে চেয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ চাকুরিতে

যোগদান করে জরীপ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হলেন। বিভিন্ন দপ্তরে কাজের অভিজ্ঞতার পর তাঁকে ১৮৮৫ সালের শেষদিকে দেওয়ান খানা বা মহাকরণে নিযুক্ত করা হয়। আর এই খানেই পরবর্তী কয়েক বছর তিনি কাটান। তাঁর এখানকার চাকুরির জীবনধারাও আই সি এস চাকুরীর ন্যায় একই রকম। - কাজ, ফাইল, অফিসের কাজ ট্যুর ইত্যাদি। তবে তাঁর বরোদায় আসা কেন? এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, বাস্তবিকই তফাত একটা ছিল। একজন দেশীয় রাজার রাজ্য ছিল বরোদা। আর সর্বক্ষণ আমাকে কোন উর্দ্ধতন বিদেশি রাজপুরুষের আদেশের অপেক্ষায় থাকতে হত না। অনেক বেশি স্বাধীনতা ও সম্মান ছিল বরোদার চাকুরীতে। রাজ্য সরকারের একজন অফিসার হিসেবে তাঁকে শাসনকার্য অংশগ্রহণ করতে হলেও শ্রীঅরবিন্দের আসল আগ্রহ উৎসাহ ছিল অন্যত্র। মহারাজা গায়কোয়াড় অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের অসামান্য প্রতিভা ও সামর্থ্যের কথা জানতেন। তাই শুধু মাত্র তাঁকে রাজ্যের কাজ নিযুক্তা না রেখে ব্যক্তিগত কাজেও ব্যবহার করতেন। কোন চিঠির মুসাবিদা, সযত্ন শব্দ চয়ন, জরুরী সরকারি আদেশ বা রিপোর্ট তৈরির ব্যাপারে মহারাজা শ্রী অরবিন্দকে ডাকতেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মহারাজার সম্পর্কের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সরদেশাই তাঁর এক বিবৃতিতে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, মহারাজা সয়াজিরাও এর সঙ্গে তিনি ও শ্রীঅরবিন্দ প্রায় একত্রে কাটাতেন। একবার এক সামাজিক সভায় মহারাজাকে ভাষণ দিতে হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ সেই ভাষণ তৈরি করে দেন। আমরা তিনজনে সেই ভাষণ শুনি। সব শোনার পর মহারাজা বলেন, অরবিন্দুবাবু এর সুরটা একটা নরম করা যায় না? শ্রীঅরবিন্দ হেসে বলেন, পরিবর্তন করে কি লাভ হবে, যদি বক্তব্য একটু উদারও হয়। তবু প্রজারা ভাববে মহারাজা নিজে কিছু করেননি। অন্য কেউ তাঁর হয়ে ভাষণ তৈরি করে দিয়েছে। আসল ব্যাপার হল, ভাষণে আপনার চিন্তার প্রতিফলন হয়েছে কিনা তাহলেই হল। এই ঘটনায় দেখা গেলশ্রীঅরবিন্দ কিভাবে তাঁর মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতেন। শ্রী অরবিন্দের নিজস্ব কর্মধারায় আরেকটি উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এক বার মহারাজা গায়কোয়াড় আদেশ দেন যে ছুটির দিন, অর্থাৎ রবিবারেও অফিসারদের কাজে যোগ দিতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ এই আদেশ পালনে ইচ্ছুক ছিলেন না। মহারাজা তাঁকে ৫০ টাকা জরিমানা করেন। শ্রীঅরবিন্দের প্রতিক্রিয়া হল মহারাজা যত খুশি জরিমানা করুন তিনি রবিবারে অফিসে যাবেন না। অবশেষে শুভবুদ্ধির উদয় হল। এ ব্যাপারে মহারাজা আর কোন ব্যবস্থা নিলেন না। জরুরি কাজের জন্য মহারাজা শ্রীঅরবিন্দকে প্রায়ই প্রাসাদে প্রাতঃরাশের জন্য নিমন্ত্রণ করতেন এবং তাঁকে দীর্ঘক্ষণ থাকতেও হত। কিন্তু মহারাজা কখনও তাঁকে একান্ত সচিব (প্রাইভেট সেক্রেটারি) পদে নিযুক্ত করেননি। একবারই ১৯০৩ সালে কাশ্মীর ভ্রমণ কালে শ্রীঅরবিন্দ মহারাজার সঙ্গে ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঐখানেই শেষ। কাশ্মীরের সৌন্দর্য বর্ণনা করে এক শিষ্য

তাঁকে চিঠি দেন। তার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ জানান যে তার কাশ্মীর সম্পর্কে ধারনার সঙ্গে তিনি একমত। কাশ্মীরের নদী, পর্বত, ধীর প্রবাহিত শান্ত জীবনযাত্রার মধ্যে যে অতুলনীয় সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে তাতে করে মনে হবে যে কাশ্মীর সত্যিই ভূস্বর্গ। ঝিলমের কূলে বসে যদি কবিতা রচনা করা যেত। কিন্তু তা তো হবার নয়। অতি উৎসাহী গায়কোয়াড় স্বর্গের গন্ডি সংক্ষিপ্ত করে রেখেছিলেন তাঁর শাসন সংক্রান্ত নথি, বক্তৃতা ও নানা কাজের ব্যস্ততায় যাতে তিনি বাহবা পাবেন। অবশ্য যার যা প্রকৃতি সে অনুসারেই সে স্বর্গের ভাগ পায়। এইসব পার্থক্য সত্ত্বেও গায়কোয়াড় রাজ পরিবারের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। মহারাজা তাঁর ধারণায় একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন এবং সমসাময়িক রাজন্যবর্গের মধ্যে অনেকাংশে ছিলেন প্রগতিশীল। আর মহারাণী যে তাঁকে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন জানা যায় পন্ডিচেরীতে পরবর্তীকালে লেখা চিঠিপত্রে। শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ ও উপদেশ প্রার্থনা করে চিঠিগুলি লেখা। সত্বর তাঁর নিকট অন্য এক কাজের সুযোগ হল। তাঁর মত একজন কবি, সাহিত্যকার ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি কি শাসনকার্যের যাঁতাকলে আবদ্ধ থাকতে পারেন? ১৮৯৭ সালে স্থির হল তিনি বরোদা কলেজে ফরাসি ভাষায় অধ্যাপনা করবেন। পরবর্তীকালে তাঁকে কলেজে মাঝে মাঝে বেসরকারিভাবে অধ্যাপনা করতে হয়েছে। ১৮৯৮ সালের প্রথমদিকে তাঁকে ইংরাজীর অধ্যাপক হিসাবে কলেজে নিয়োগ করা হয়। তাঁর অন্য দায়িত্ব ও সঙ্গে সঙ্গে থাকল। এইভাবে বরোদা কলেজের সঙ্গে তাঁর ১৯০৬ সালের জুন মাস অবধি একটানা দীর্ঘ সম্পর্ক স্থাপিত হল। ঐ সময়ে তিনি ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন। ১৮৯৯ সালে কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ শ্রীঅরবিন্দকে পাকাপাকিভাবে কলেজে গ্রহণের জন্য মহারাজকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মহারাজা তা অনুমোদন করেননি। তাঁর অফিসের নানা কাজে এবং তাঁর জন্য আত্মজীবনী তৈরি করে দিতে শ্রীঅরবিন্দকে মহারাজার প্রয়োজন ছিল। ১৯০৪ সালে শ্রী অরবিন্দ কলেজের উপাধ্যক্ষ হলেন এবং পরের বছর অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবেও নিযুক্ত হলেন। ঐ সময়ে এক বছরের জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় ছুটিতে যান।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন আদর্শ শিক্ষক কার্যত সেটাই ছিল তাঁর স্বধর্ম। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ বরোদার তাঁর কয়েকজন ছাত্র সেই শিক্ষাদান পদ্ধতির কিছু বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও আলোচনাকালে সেই অভিজ্ঞতকার কথা বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দের দাদা মনমোহন কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক হয়েছিলেন। অধ্যাপনায় তাঁর সুনামও ছিল। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদানের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাপদ্ধতির পার্থক্য ছিল। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন মনমোহন ছিলেন খুবই পরিশ্রমী। তাঁর পাঠ্যপুস্তক গুলি ছিল পাতার পর পাতা নোট সমৃদ্ধ। কিন্তু নিজের বেলায় শ্রীঅরবিন্দ অত নিষ্ঠাবান ছিলেন না। তাঁর এক ছাত্র পুরানী আপত্তি করে বলেন, কলেজে তাঁর

ছাত্ররা ভূয়সী প্রশসা করতেন। এর উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন- আমি কখনও নোট দেখতাম না আমার পড়ানো অনেক সময় নোট এর সঙ্গে মিলত না। আশ্চর্য ব্যাপার আমি যা পড়াতাম ছাত্ররা তার হুবহু নোট নিত এবং মুখস্ত করত। ও রকমটি ইংল্যান্ডে কখনও ঘটতে পারে না। একবার আমি সোসাইটির লাইফ অফ নেলসন পড়াচ্ছিলাম। আমার পড়ানোর সঙ্গে লিখিত নোট এর মিল ছিল না। এতে করে ছাত্ররা বলে উঠে নোট এর সঙ্গে আমার পড়ানো মিলছে না। প্রত্যুত্তরে আমি বলি, আমি নোট দেখিনি, আর ওগুলি খুব কাজেরও নয়। আমি কখনও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের মধ্যে যেতাম না, পড়ার পর সবটা ছেড়ে দিতাম মনের কাছে। আর এইজন্য আমার পক্ষে বিদ্বান হয়ে ওঠা সম্ভব হল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বিখ্যাত নেতা কে এম মুন্সি এক সময় বরোদা কলেজের ছাত্র ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল ১৯০২ সালে যখন ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি বরোদা কলেজে পড়তে আসেন। যদিও মাত্র কয়েকবার তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন কিন্তু কলেজে শ্রীঅরবিন্দ প্রবাদ তাঁকে শ্রদ্ধায় অভিভূত করে রেখেছিল। আর শ্রী অরবিন্দ যখন ইংরাজীর অধ্যাপক হিসাবে এলেন সম্ভ্রমের সঙ্গে মুন্সিজী তাঁর বক্তৃতা বোঝাবার চেষ্টা করতেন। কলেজে যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব তাঁরা এড়াতে পারেননি। শ্রীঅরবিন্দের এক সহকর্মী ডঃ সি আর রেড্ডি তাঁর স্মৃতি চারণায় বলেছেন, তাঁকে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অধ্যক্ষ ডঃ ক্লার্ক আমাকে বলেন, আপনার কি অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁর চোখের দিকে লক্ষ্য করেছেন কি? তাঁর চোখ দুটিতে ছিল অপার্থিব তেজ ও ঔজ্জ্বল্য। তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। জোয়ান অব আর্ক যেমন দৈববানী শুনতে পেতেন অরবিন্দের সম্ভবত ছিল দিব্যদৃষ্টি। ১৮৯৩ সালের পর বাংলায় সুযোগ পেলেই শ্রীঅরবিন্দ চলে আসতেন। বিশেষ করে কলেজের ছুটি ছাটায়। ১৯০১ সালে কলকাতায় এসে তিনি জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিলেন। এপ্রিল মাসে এক পদস্থ রাজকর্মচারী ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনীদেবীকে তিনি বিবাহ করেন। শ্রীঅরবিন্দের বয়স ২৮ আর মৃণালিনীর ১৪। মৃণালিনী ছিলেন সুন্দরী, সুশিক্ষিতা এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা। সম্পর্ক স্থাপন হয় শ্রীঅরবিন্দের এক বিজ্ঞাপন থেকে। ভূপালচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু বিজ্ঞাপনটি দেখেন এবং তাঁর চেষ্টায় বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। এই বিবাহে জগদীশচন্দ্র বসু লর্ড সিংহ প্রভৃতি কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে হবে প্রস্তাব দেন। এতে এক সমস্যা দেখা দেয়। তাঁকে বিদেশগমনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে বলা হয়। পিতার ন্যায় শ্রীঅরবিন্দ এইসব অনুষ্ঠানে সম্মত ছিলেন না। অবশেষে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে কিছু অর্থদানে সমাজ ও শাস্ত্রেরমুখ রক্ষা করা হল। বিবাহের পর শ্রীঅরবিন্দ স্ত্রী মৃণালিনী, ভগ্নি সরোজিনীসহ দেওঘর, নৈনিতাল হয়ে বরোদায় ফিরলেন।

প্রায় একই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের ছোট ভাই বারীণ বরোদায় এসে যোগ দিলেন। মায়ের অসুস্থতা এবং পিতার অকালমৃত্যুতে বারীনের লেখাপড়ায় প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছিল। এন্ট্রান্স পাশের পর চাকুরীর নানা চেষ্টা এমনকি তৎকালীন বিচারে নবীন উদ্যোগ স্বরূপ পাটনায় চায়ের দোকান চালানোর পর অবশেষে বারীন সেজদার কাছে বরোদায় আসা স্থির করেন। বারীন ছিলেন অসীম সাহসী যুবক কিন্তু স্বভাবে একপ্রকার উচ্ছৃলতা সর্বদা বহন করতেন। দেওঘরে তিনি ইতিপূর্বে এক বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিয়েছেন। বরোদায় এসে সেজদার উপযুক্ত শিষ্য হিসাবে লেগে গেলেন। শীঘ্রই তিনি খাসেরাও যাদবের ভাই বরোদা সৈন্য বাহিনীর লেফটেন্যান্ট মাধবরাও এর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে তাঁর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার আয়ত্ব করলেন। পরে মাধবরাও উচ্চতর সামরিক শিক্ষার জন্য ইউরোপ প্রেরিত হন। শ্রীঅরবিন্দ মাধবরাওকে এই কার্যে আর্থিক সহায়তা দিয়ে সাহায্য করেন। বারীনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল আধ্যাত্মিকতা. বিশেষ করে প্ল্যানছেটের উপর। শ্রীঅরবিন্দ মাঝে মাঝে সেই সান্ধ্য আসরে যোগ দিয়েছেন এবং আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। একবার তাঁর বাবার প্রেতাত্মা এসে বলেছিলেন যে, বালক অবস্থায় বারীনকে তিনি একটি সোনার ঘড়ি দিয়েছিলেন। পরে জানা যায় যে বারীন ব্যাপারটা ভুলে গেছিল। কৃষ্ণধনের আত্মাকে তিলকের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যখন তোমাদের এই সকল কর্ম প্রচেষ্টা নষ্ট হবে এবং অনেকেই নত মস্তকে পরাজয় স্বীকার করবে । তখন এই ব্যক্তি তার মাথা উঁচু করে অবস্থান করবে। তিলকের রাজনৈতিক অসামান্যতার ও এক অপূর্ব পূর্বাভাস। অন্য এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মাকে আহ্বান করা হয়। তিনি বললেন, মন্দির গড়ো। যার অর্থ মনে হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ভবানী মন্দিরের ন্যায় সন্ন্যাসীদের জন্য মন্দির তৈরি করা। বারীনের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর বিপ্লবী কাজের জন্য যতীন ব্যানার্জীকে সহায়তার উদ্দেশ্যে তাকে বাংলায় পাঠানো হল। ১৯০২ সালে কলেজের অবকাশকালীন শ্রীঅরবিন্দও কলকাতায় এলেন। যতীন ও বারীনকে সঙ্গে করে প্রথম তিনি মেদিনীপুরে যান। সেখানে বিপ্লবীনেতা হেমচন্দ্র দাসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কলকাতায় ফেরার পর যতীনের মধ্যস্থতায় শ্রীঅরবিন্দ ও ব্যারিস্টার পি. মিত্রের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। ব্যারিস্টার পিঃ মিত্র বিভিন্ন শরীর চর্চার ক্লাবের মাধ্যমে যুবকদের বৈপ্লবিক কাজে সংগঠিত করেছিলেন। মিত্র শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগ দিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে এবং হেমচন্দ্রকে এক হাতে তরবারি এবং অন্য হাতে গীতা স্পর্শ করিয়া বিপ্লবীর গোপন মন্ত্রে দীক্ষা দেন। তাঁরা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য জীবনপন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। অতঃপর স্থির হয় যে বাংলায় ছয়টি বিপ্লব কেন্দ্র খোলা হবে এবং সেখানে রাইফেল চালনা শিক্ষা দেওয়া হবে। এর আগে শ্রীঅরবিন্দ মহারাষ্ট্রে এক গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের খোঁজ পান। এর নেতা উদয়পুর রাজ্যের এক রাজপুত যুবরাজ ঠাকুর রামসিং। শ্রী অরবিন্দ এদের

বোম্বাই শাখার সঙ্গে যুক্ত হন এবং শপথ বাক্য পাঠ করেন। ঠাকুর রামসিং, ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে দেশীয় সৈন্যবাহিনীকে অনুপ্রাণিত করতে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ একবার মধ্য ভারত পর্যটন করেন এবং সৈন্যবাহিনীর কতিপয় উচ্চ পদাধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এইভাবে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে বিপ্লবী ভাবধারার মধ্যে ও মহারাষ্ট্রে অন্তরাল থেকে সক্রিয়ভাবে তিলকের সঙ্গে তিনি যোগসূত্র গড়ে তোলেন। এখানে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে যে, ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে আহমেদাবাদে ভারতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে তিনি মহারাষ্ট্রের এই দেশনায়কের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তিলককে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করতেন জাতীয় রাজনৈতিক মঞ্চেও উভয়ের সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। যতীন ও বারীনের মধ্যে মতানৈক্য দূর করতে ১৯০৩ সালে শ্রীঅরবিন্দকে আরেকবার কলকাতায় আসতে হয়েছিল। যতীন কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং এতে করে যুবকদের কাছে আস্থা হারাচ্ছিলেন। পি. মিত্র. ভগিনী নিবেদিতা, সি আর দাশ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যতীনকে নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ পাঁচজনের এক কমিটি তৈরি করলেন যারা বাংলাদেশে বিপ্লবী কর্মধারারা সর্বোচ্চ সঞ্চালক হবেন। মতানৈক্য থাকলেও পি.মিত্রের অধীনে বিপ্লবী প্রচেষ্টা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেল। হাজারে হাজারে তরুণেরা এই আন্দোলনে যোগ দিল। এমনকি বেশ কিছু সরকারী কর্মচারী গোপনে তাঁদের সহানুভূতি ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে ১৯০৫ সালে সরকারের বঙ্গভঙ্গের অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্তে আন্দোলন এক প্রচন্ড রূপ ও গতি পেল। এই সময় থেকে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে শ্রী অরবিন্দের গভীর বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সখ্যতার সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯০২ সালে। যখন নিবেদিতা বরোদায় কয়েকটি ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন। শ্রী অরবিন্দ স্টেশনে গিয়ে নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করেন। নিবেদিতা জানতেন শ্রীঅরবিন্দ শক্তির উপাসক এবং তাঁর লেখা পুস্তক কালী মা মহামায়া শ্রীঅরবিন্দের ভাল লেগে ছিল। নিবেদিতার বরোদার মহারাজের সঙ্গে যে সাক্ষাৎকার ঘটেছিল সেখানেও শ্রীঅরবিন্দ উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতা মহারাজকে বিপ্লবী আন্দোলনে সহায়তার প্রস্তাব দেন, কিন্তু মহারাজকে বিপ্লবী আন্দোলনে সহায়তার প্রস্তাব দেন, কিন্তু মহারাজ শুধু বলেন, তাঁর যা বলবার তা মিঃ ঘোষের মারফত জানাবেন। অবশ্য এসব ব্যাপারে মহারাজার আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না। বরং তিনি অবাক হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের আগ্রহ দেখে। নিবেদিতার প্রতি শ্রীঅরবিন্দ সবিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি নিবেদিতা সম্পর্কে বলেন যে নিবেদিতা ছিলেন বিপ্লবের কথা তিনি খোলাখুলি বলতেন। তাঁর মধ্যে কোন কপটাচার ছিলনা। তিনি যা বলতেন তা ছিল আন্তরিক, যেন তাঁর আত্মার অন্তঃস্থল থেকে তা উৎসারিত। যখনই তাঁদের দেখা হত তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল রাজনীতি ও বিপ্লবী কর্মধারা। নিবেদিতার চোখে

প্রকাশ পেত একাগ্রতার শক্তি ও সমাধিস্থ হবার সামর্থ্য। তাঁর পুস্তক কালী মা মহামায়া ছিল বিপ্লবাত্মক এবং তা মোটেই অহিংসাপন্থী নয়। শ্রী অরবিন্দকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বারীন কেমন ছিলেন? তিনিও তো অগ্নিগর্ভ। নিবেদিতা ও বারীনের মধ্যে পার্থক্য ছিল। নিবেদিতা ছিলেন স্বয়ং অগ্নি। ভারতবর্ষের সেবায় তিনি ছিলেন যথার্থই নিবেদিতা। ইতিমধ্যে বিপ্লবী সংগঠনের কাজ দ্রুত প্রসারলাভ করছিল। প্লানচেটে শ্রীরামকৃষ্ণের কথিত, মন্দির গড়ো, আদেশের রূপ দিতে বারীনের মাথায় এক পরিকল্পনায় উদয় হয়। এই উদ্দেশ্যে বিন্ধ্যপর্বতমালার গ্রহণ গভীরে তিনি আনন্দমঠের বর্ণিত মন্দির গড়ার উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। এই কাজ করতে গিয়ে বারীন এক দুরারোগ্য ভীষণ জ্বরে (হিল-ফিভার) আক্রান্ত হয়ে সেজদার কাছে বরোদায় ফিরে এলেন। একদিন হয়েছে কি কে নাগা সন্ন্যাসী ঐ বাড়িতে এসে উপস্থিত। বারীনের শীর্য মর্মান্তিক অবস্থা দেখে তিনি তার সম্পর্কে জানতে চান। যখন তাঁকে বারীনের ঘটনা বলা হল, নাগা সন্ন্যাসী এক গ্লাস জল আনতে বললেন। জল আনা হলে তিনি মন্ত্র পড়ে ছুরি দিয়ে গ্লাসের জলকে দুভাগে কেটে দিলেন এবং বারীনকে পান করতে বললেন। কাল থেকে জ্বর আসবে না। নাগা সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল, এতদিনের জ্বর যেন ভেলকি বাজির ন্যায় অন্তর্হিত হল। এই চমকপ্রদ ঘটনা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের উক্তি, যোগ শক্তির এটা হচ্ছে চাক্ষুস হাতে নাতে পরীক্ষা। আমার মনে হল যোগের যদি এই শক্তি হয় তবে আমি কেন না দেশের কাজে যোগ শক্তিকে প্রয়োগ করি? যোগের প্রতি আকর্যণের এই ছিল আমার প্রাথমিক কারণ। প্রয়োজনীয় উৎসাহ অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের বানীর মধ্যে পেয়েছিলাম। সেই জন্যই বলেছি- যোগ সাধনায় আমার প্রবেশ পিছনের দরজা দিয়ে। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে শ্রী অরবিন্দ ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলেন। (কংগ্রেসের) বরিশাল অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন ১৪ ই এপ্রিল (সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও) বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে প্রতিনিধিমন্ডল সভামঞ্চে শোভাযাত্রা করে অগ্রসর হতে লাগলেন। পুলিশ নেতৃবৃন্দের আটকালো না কিন্তু লৌহমন্ডিত লাঠি নিয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনেকেই আহত হল তারমধ্যে একটি ছেলে, লাঠির খায়ে মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে, তা সত্বেও বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়ে চলেছিল। বিদেশি বর্জন আন্দোলনের ফলে বহু দেশপ্রেমী ছাত্র ও শিক্ষক সরকারী স্কুল, কলেজে পাঠ ও অধ্যাপনা করতে অস্বীকার করলেন। এই অবস্থার প্রতিকারে স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃবর্গ বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার অনুভব করেন এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শিক্ষাদানের কথা চিন্তা করেছিলেন। এইভাবে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা জন্ম হল। কলকাতায় অবস্থান কালে শ্রীঅরবিন্দ এর কয়েকটি বৈঠকে যোগদান করেন এবং কয়েকটিতে পৌরোহিত্য করেছিলেন। একটি জাতীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহাশয় এক লক্ষ টাকা দান করার

প্রতিশ্রুতি ছিলেন। সুবোধ মল্লিক মহাশয় একাধারে ছিলেন। অর্থবান ও দেশপ্রেমিক। তাঁর ভগ্নিপতি সি সি দত্তের মাধ্যমে সুবোধ চন্দ্রের সহিত শ্রীঅরবিন্দের পূর্বেই সাক্ষাৎ ঘটেছিল। শীঘ্রই তিনি হয়ে উঠলেন শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ সমর্থনকারী। সুবোধচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দকে প্রস্তাবিত জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ করা হবে এই শর্তে অর্থদান করেন। শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে বরোদা ত্যাগ করে চলে আসার আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকল না। জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে তিনি মাত্র ১৫০ টাকা মাহিনা নিতে সম্মতি দিয়েছিলেন। বরোদায় তাঁর মাহিনা ছিল মাসিক ৭০০, সেই আমলের হিসাবেও বেশ ভাল মাহিনা বলতে হয়। তিনি নিজের বা পরিবারের কথা চিন্তা না করেই। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই ত্যাগ ও কৃচ্ছ্র সাধন মেনে নেন। তাঁর এই ত্যাগ দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছে। শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা বাসকালীন আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে বারীন্দ্র এবং আরো কয়েকজন যুগান্তর নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির স্বাদেশিকতার দেশের লোকের, বিশেষ করে যুব সমাজের কাছে বহুল জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বিস্তার করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ প্রথম প্রথম কয়েকটি সংখ্যায় লেখা দিয়েছিলেন এবং পত্রিকার উপর তাঁর সামগ্রিক তদারকি ছিল। পত্রিতাটির জনপ্রিয়তার ভীত হয়ে সরকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে কারারুদ্ধ করেন। ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যুগান্তর পরিশেষে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এর স্বল্পকালীন প্রকাশকালে পত্রিকাটি নির্ভীকতার সঙ্গে সরকারি কাজকর্মের সমালোচনা নিয়মিত প্রকাশ করেছে। এই সময়কালে দেশের কথা নামে একটি বাংলা পুস্তক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এর লেখক ছিলেন একজন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবী সখারাম গণেশ দেওস্কর। শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শে সখারাম এই বইখানি রচনা করেন এতে প্রকাশ পায় ইংরেজ সরকার তার রাজত্ব কালে কিভাবে ভারতবর্ষকে বাণিজ্য ও শিল্পে শোষণ করে চলেছে। এই জাতীয় কাজকেও শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিপ্লবী কর্মধারার সামিল করেন। বইটির প্রভাব পড়েছিল প্রচন্ড। এমনকি মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদদের নাড়া দিয়েছিল বইখানি। স্বদেশী আন্দোলনে জুগিয়েছিল অনুপ্রেরণা। কার্যত এর প্রভাব এত প্রবল হয়েছিল যে সরকার পুস্তিকাটি নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হন। জুনমাসে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় এসে সুবোধ মল্লিক মশায়ের১২ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্রাসাদোপম গৃহে স্বল্পকাল বাস করেন। সেখানে তাঁর থাকার কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু গৃহস্বামীর কোন অস্বাচ্ছন্দ হতে পারে ভেবে শ্রীঅরবিন্দ মৃণালিনী, সরোজিনী, বারীন ও অবিনাশকে নিয়ে ছুকু খান সামালেনে উঠে এলেন। এর কিছুদিন পর তাঁরা ২৩ নং স্কট লেনে বাসা বদল করেন । বারীন মুরারিপুকুরে চলে যান। নবগঠিত জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের কাজকর্ম নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি এমন এক প্রকল্পের মধ্যে

জড়িয়ে পড়লেন যার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বিপিন চন্দ্র পাল ছিলেন দেশের গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দের অন্যতম। তিনি ছিলেন সবিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তি, বিখ্যাত বক্তা, বোধ করি সেই সময়ে তাঁর সেক্ষেত্রে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলনা। তিনি ছিলেন শক্তিশালী লেখক, বিদ্বান ও সাধক। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং অন্যান্যদের নিয়ে তিনি ন্যাশনালিস্ট পার্টি নামে এক নতুন দল গঠন করেন। এই দল কংগ্রেসের মধ্যপন্থার বিরোধী ছিল। উপাধ্যায় সন্ধ্যা নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং পত্রিকাটি ভালভাবেই চলছিল। কিন্তু সারা ভারতের জন্য অন্য একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে অনুভূত হয়েছিল। খুবই সাহসের সঙ্গে আর্থিক সঙ্গতির কথা চিন্তা না করেই বিপিনচন্দ্র এই উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন। নতুন পত্রিকা বন্দেমাতরম এর প্রথম সংখ্যা ৭ ই আগস্ট ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হবে স্থির হল। দিনটির তাৎপর্য ছিল। এক বছর আগে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ব্রিটিশ পন্য বর্জন ঐদিন শুরু হয়। ঘটনাক্রমে বিপিন পালকে কার্যান্তরে কলকাতা ত্যাগ করতে হয় এবং বন্দেমাতরম প্রথম ৫ই আগস্ট প্রকাশিত হয়। বিপিন পাল কলকাতা ত্যাগ করার আগে শ্রীঅরবিন্দকে রাজি করিয়ে নেন যে তাঁর অবর্তমানে প্রতিদিন একটি লেখা শ্রীঅরবিন্দ পত্রিকাটিতে দেবেন। এপ্রিলের (১৯০৭ খৃঃ অঃ) শেষে বন্দেমাতরম এর কাছে খবর এল সরকার লাজপত রায়কে দ্বীপান্তর পাঠাতে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে সরকার এমন এক অপ্রচলিত আইনের আশ্রয় নিয়েছিল যাতে করে সরকারের মতে কোন বিপজ্জনক ব্যক্তিকে বিনা বিচারে কোন কারণ না দর্শিয়ে, দেশের কোন প্রত্যন্তস্থানে নির্বাসিত করা চলবে। বন্দেমাতরম অনতিবিলম্বে এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল - শ্রী অরবিন্দ সঙ্কট এই শিরোনামায় এক সম্পাদকীয়তে লিখলেন, আমাদের জাতীয় জীবনের এই গভীর সঙ্কটে, জনগণ যেন অধৈর্য না হয়, যেন বুদ্ধিভ্রংশতা তাদের গ্রাস না করে এবং হৃদয়ে কোনরূপ বিবশতা দেখা না দেয়..... লালা লাজপত রায় নির্বাসিত, আমাদের মধ্যে তিনি অনুপস্থিত কিন্তু তাঁর চাইতে সরলতর ও মহত্তর নেতার আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। যখন কোন সঙ্গত বিক্ষোভের উপর দমননীতি নেমে আসে তখন উৎপীড়িত জনগণের স্থান দখল করতে ছুটে আসে মৃত্যু ভয় ও নিপীড়ন তুচ্ছ করে আরও শক্তিশালী সাহসী জনগণ, রক্তবীজের ন্যায় অসংখ্য সংখ্যায়।

বন্দেমাতরম ব্যঙ্গ করে লিখেছে, ইংরাজ সরকার সমগ্র ভারতবাসীকে চরমপন্থী প্রমাণ করার যে সবল ও স্বার্থহীন চেষ্টা চালাচ্ছেন তাকে আমরা প্রশংসা করতে পারছি না। আমাদের ধারণ ছিল সমগ্র দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদী গড়ে তুলতে আমাদের বেশ কয়েক বছর চেষ্টার দরকারক হবে। তার প্রয়োজন হল না। ভারত সরকার তাড়াতাড়ি লক্ষ্যে পৌঁছতে নিজেই সচেষ্ট হলেন। লালা লাজপত রায়কে নির্বাসিত করেতারা ইংরাজ ন্যায়বিচারের উপর আমাদের আস্থা নষ্ট করে দিলেন।

সরকারসঙ্গত কারণেই বন্দেমাতরম এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ও সার্থক আক্রমণাত্মক ভূমিকায় ভীত হয়ে পড়েছিল। ইঙ্গ ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহে বন্দেমাতরম এর বিপ্লবাত্মক লেখার কঠোর সমলোচনা হতে থাকল। অবশ্যই সকল পত্রিকা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে আইনের গন্ডির মধ্যে বন্দেমাতরম এর ভাষ্য ও ভাষা ব্যবহার করা হত সরকারও চুপ করে থাকল না। যুগান্তর, বন্দেমাতরম এর উপর যথাক্রমে ৭ই ও ৮ই জুন ১৯০৭ এই মর্মে সকর্তবানী জারী হল যে,তাদের জ্বালাময়ী বক্তব্য যদি তারা সংযত না করে তবে পুলিশী ব্যবস্থা নেওয়া হবে ও আদালত তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে। সরকার৩রা জুলাই যুগান্তর কার্যালয়ে তল্লাসী চালালেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে কারারুদ্ধ করলেন। ৩০ শে জুলাই বন্দেমাতরম এর উপর আক্রমণ এল। পুলিশ পত্রিকা অফিসে তল্লাসি নিলেন এবং বহুসংখ্যক পুস্তক ও পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করলেন। এই আঘাত উপেক্ষা করে বন্দেমাতরম পরের দিন লিখল নেকড়ে তার ডোরাকাটা দাগ অবশেষে আর ঢেকে রাখতে পারল না। ঐদিনই (৩০ শে জুলাই) শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তারের পরোয়ান বেরিয়েছিল কিন্তু পত্রিকা অফিসে হানা দেওয়ার সময় ঐ পরোয়ানা জারি করা যায়নি। বাজেয়াপ্ত কাগজ পত্র পরীক্ষা করতে কয়েকদিন কেটে গেল। অবশেষে পুলিশ ১৪ ই আগষ্ট শ্রী অরবিন্দের ৩৫ তম জন্মবার্ষিকীর আগের দিন তাঁকে গ্রেপ্তার করল। শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার এড়াতে কোন চেষ্টা করেননি। পুলিশ আদালতে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি কি বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদক বা মুদ্রক? উভয় প্রশ্নের উত্তর নঞর্থক ভাষায় শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছিলেন। তাঁর অপ্রয়োজনে শহীদ হওয়ার বাসনা ছিল না। সুতরাং সরকারকেই অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্বভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। জামিনে শ্রীঅরবিন্দকে ২৯ শে আগস্ট ছেড়ে দেওয়া হল। প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডি. এইচ কিংসফোর্ড এর আদালতে বন্দেমাতরম রাজদ্রোহের মামলা উপস্থাপিত হল। তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযুক্ত সম্পাদক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দকে আর যথাক্রমে ম্যানেজার ও মুদ্রক হিসাবে হেমেন্দ্রনাথ বাগচী ও অপূর্বকৃষ্ণ বোসকে অভিযুক্ত করা হয়। মামলাটিতে জয়ী হতে সরকার চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেননি। শ্রীঅরবিন্দকে সম্পাদক হিসাবে প্রমাণ করতে বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষী ডেকে সমন জারী করা হল। অভিযুক্তকারীদের ধারণা হয়েছিল, যেহেতু বিপিনচন্দ্র বন্দেমাতরম এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তিনি স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দেবেন যে, শ্রীঅরবিন্দই পত্রিকার সম্পাদক। কিন্তু তাদের হিসাবে ভুল হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র আদালতের সমন উপেক্ষা করে সাক্ষ্য দিতে এলেন না। ফলে তাঁর ছয়মাস জেল হল। পরের দিনই বন্দেমাতরম এ তাঁর উদ্দেশ্য এক মর্মস্পর্শী রচনা প্রকাশিত হল- সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী, লেখক ও জাতীয়তার মূর্ত প্রতীক বিপিনচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করে সরকার তাঁর বা দেশবাসীর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তাঁর দেশবাসীর কাছে আগের চাইতে অনেক বেশি সমাদর লাভ করবেন।

জেল থেকে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহ ও সামর্থ্যে দেশের কাছে ফিরে আসবেন। তাঁর আত্মহুতির জন্য দেশ আরও শক্তিশালী হবে। যে আদালত তাঁর সততাকে দোষী অভিযোগে শাস্তি দিয়েছে ভবিষ্যৎ তার বিচার করবে। রাজদ্রোহের মামলার পরিণতি ও শ্রীঅরবিন্দের মুক্তি অনতিবিলম্বে তাঁকে জনসাধারণের চোখে নেতৃত্বের আসনে স্থাপন করল। রাতারাতি তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগল। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, যদিও শ্রীঅরবিন্দ যে বন্দেমাতরম এর সম্পাদক তা প্রমাণ করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছিল, তবুও জনসাধারণ তাঁকেই প্রকৃত অর্থে বন্দেমাতরম এর সম্পাদক ও বিশিষ্ট জাতীয় নেতা হিসাবে চিনতে ভুল করেনি। অভিযোগকারী সরকারী উকিলর তাঁর বিরুদ্ধে বৃথাই বজ্রনাদ করেননি- অরবিন্দ ঘোষ বন্দেমাতরম এর সম্পাদক কিনা, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আসলে তিনিই হলেন স্বয়ং বন্দেমাতরম পত্রিকা সহসা এই খ্যাতি ও পরিচিতি শ্রীঅরবিন্দের নিকট গ্রহণ যোগ্য ছিল। এক শিষ্যকে তিনি লিখেছিলেন আমার রাজনৈতিক জীবনেও খ্যাতির প্রতি কোন উৎসাহ ছিল না। আমি অন্তরালে থেকে অলক্ষ্যে জনতাকে চালনা করতে চাইতাম আর দেখতাম যাতে কাজটি সম্পন্ন হয়। আমাকে অভিযুক্ত করে বিমূঢ় ব্রিটিশ সরকার আমার কাজের পদ্ধতি নষ্ট করে আমাকে নেতার আসনে বসাল। এই সময়ে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেনরি নেভিনসন ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে ভারতে আসেন এবং শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎকার নেন। 'দি নিউ স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া' নামক পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তিনি তাঁর ধারণা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর সুগঠিত কৃশকায় মুখমন্ডলে অবস্থিত গভীর কৃষ্ণচক্ষুদ্বয় গাম্ভীর্যে অচঞ্চল ভাবুক, অন্যের মতামত বা ভবিষ্যতের প্রতি উদাসীন, এমন একটি নির্বিকার ব্যক্তি আমি অল্পই দেখেছি।

তিনি এমনি এক স্বপ্নবিলাসী যিনি স্বপ্নকে কার্যে রূপ দিতে উদগ্রীব, পথ তা সে যত বন্ধুরই হোক না কেন।' তাঁর গ্রেপ্তারের পর শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ থেকে ইস্তফা দিলেন। তিনি চাননি। এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিব্রত হন। অবশ্য জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি সাধারণ অধ্যাপক হিসেবে থেকে গেলেন। তাঁর অন্য বহুবিধ কাজের জন্য কলেজের দিকে সবিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি। কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল স্বল্পকালীন। এর ফলে তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হয়নি। জাতীয় আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে শ্রী অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষাকে স্থান দিতেন। বরোদা থাকাকালীন তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা, যা ছিল পরীক্ষার ফলাফল ভিত্তিক এবং পাঠ্য পুস্তকের যান্ত্রিক পাঠে সীমাবদ্ধ, তা ছাত্রদের কেবল তৈরী করে তোতাপাখি মত অধীত বস্তু মুখস্ত করতে। পরে তিনি অন্যত্র লিখেছেন, এই পদ্ধতি ভারতীয় মানসিকতার স্বাভাবিক উজ্জ্বল্য ও

তীক্ষ্নতাকে স্থূলবুদ্ধি ও অনুর্বর করে রেখেছে। জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি এই নামে ১৯০৯ থেকে ১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগিন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শিক্ষা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের ধারণার আভাস পেতে এই প্রবন্ধগুলি আমাদের প্রভূত সাহায্য করে। গতানুগতিক ধারনা থেকে এছিল অনেক প্রগতিশীল ও দূরপ্রসারী। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি দৈব সত্তা আছে, আছে স্বকীয়তা, নিজের গন্ডির মধ্যে যা সে পরিপূর্ণও বিকশিত করতে পারে। এ কার্যে ভাগবতী সাহায্য সে গ্রহণ করতে পারে ,আবার নাও হতে পারে। আমাদের কর্তব্য হবে একে অনুসন্ধা করা, উন্নত করা এবং ব্যবহার করতে শেখা। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল আত্মশক্তির জাগরণ , মহত্তর উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ প্রয়োগ। শিক্ষক একমাত্র উপদেষ্টা বা কার্যগ্রাহী নন। তিনি হবেন বন্ধু ও গুরু- পথপ্রদর্শক। তাঁর শিক্ষাদান আরোপিত হবে না। বরং হবে সহায়ক। বাবা, মা বা শিক্ষকের ইচ্ছানুযায়ী শিশুকে ছাঁচে ঢালা বর্বরোচিত, অজ্ঞতার কুসংস্কার মাত্র। শিশুকে আপন প্রকৃতি অনুসারে বেড়ে উঠতে দিতে হবে। পন্ডিচেরী আশ্রমে, যে স্বাধীন বিকাশশীল শিক্ষাপদ্ধতি শ্রীঅরবিন্দ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ এডুকেশন এ অনুসৃত হয় তার মর্মমূলে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা ভাবনা ক্রিয়াশীল। জাতীয় মহা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিকট শ্রীঅরবিন্দ। বরোদার ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি পেয়েছিলেন। তাঁর কারাবরণ ও অধ্যক্ষপদ পরিত্যাগে ছাত্ররা এক সভা অনুষ্ঠান করে তাঁর এই সংকটে তাদের বেদনা ও শ্রীঅরবিন্দের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করে। তাঁদের অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ (১৯০৭ আগস্ট) যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন তার প্রতিটি বাক্য আজও সমান উদ্দীপনকারী। প্রত্যেক জাতির জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যখন ভগবান এক কর্ম, এক উদ্দেশ্য। অন্যান্য মহৎ কাজ সাময়িক পরিত্যাগ করেও জাতির সামনে তুলে ধরেন। আমাদের মাতৃভূমির সামনে আজ সেই পরিস্থিতির উদয় হয়েছে- যখন তাঁর সেবায় উৎসর্গীকৃত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন কাজ নেই, যখন সকল প্রচেষ্টা ধাবিত হবে সেই একই লক্ষ্যে। তোমাদের শিক্ষালাভ হবে তাঁরই সেবায় ও উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা সেই শিক্ষা, যাহাতে দেহ, মন ও আত্মা নিয়োজিত হয় তাঁরই সেবায়। তোমাদের জীবিকা ও জীবনের লক্ষ্য হোক মাতৃভূমির সেবা। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় ফিরে এলেন এবং বন্দেমাতরম এর আরব্ধ কাজ শুরু করলেন। তিনি এখন একজন সর্বভারতীয় নেতা। তাঁর উপর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ বাড়তে থাকল আর বেড়ে চলল তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ। পূর্বের ন্যায় বাহ্যত এই সকল কাজ চলতে থাকল। কিন্তু তাঁর মধ্যে এক আন্তর বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ তাঁর বাক্য ও কার্যাবলী যেন স্বতঃপ্রণোদিত, বন্ধনহীন, মুক্তধারায় প্রবাহিত হতে লাগল। তাঁর মাধ্যমে এক মহতী শক্তি, তাঁর চিন্তা, বাক্যে ও কর্মে প্রকাশ পেল। আমাদের মনে রাখা দরকার, তাঁর এই সকল ভাষণ, বন্দেমাতরম ও কর্মযোগীণ এর লেখাসমূহ

'আর্য' পত্রিকার রচনাগুলি ও তাঁর পত্রবলী এমনকি সাবিত্রী ও অন্যান্য কবিতা যা তিনি পন্ডিচেরীতে রচনা করেন, সকলি এই মানসিক নিস্তব্ধতা সঞ্জাত। তিনি আমাদের একবার বলেছিলেন, তোমরা শুধু তাঁর যন্ত্র হবে, নিজেদের কোন দায়িত্বের বাঁধনে বাঁধবে না। সেটাই হবে পরম স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা।

কলকাতায় ফিরে এসে শ্রীঅরবিন্দ মৃণালিনীদেবীকে এক চিঠি দেন। এটাই বোধকরি স্ত্রীকে, লেখা তাঁর শেষ চিঠি, মৃণালিনীদেবী সে সময় কলকাতায় ছিলেন না। তিনি দীর্ঘদিন চিঠি না দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন- অনেক চিঠি লিখি নাই; সেই আমার চিরন্তন অপরাধ, তাহার জন্য তুমি নিজ গুণে ক্ষমা না করিলে, আমার আর উপায় কী? যাহা মজ্জাগত তাহা একদিনে বেরোয় না, এই দোষ শোধরাতেই আমার বোধ হয় এই জন্ম কাটিবে। আবার পরিশেষে লেখেন, তুমি মনে করিবে আমি তোমাকে উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতেছি। তাহা মনে করিবে না। এই পর্যন্ত আমি তোমাকে উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতেছি। তাহা মনে করিবে না। এই পর্যন্ত আমি তোমার বিরুদ্ধে অনেক দোষ করিয়াছি, তুমি যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলে, সে স্বাভাবিক কিন্তু এখন আমার আর স্বাধীনতা নাই, এর পরে তোমাকে বুঝিতে হইবে যে আমার সব কাজ আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের আদেশেই হইল। তুমি আসিবে, তখন আমার কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবে। আশা করি, ভগবান আমাকে তাঁহার অপার করুনার যে আলোক দেখাইয়াছেন, তোমাকেও দেখাইবেন, কিন্তু সে তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি আমার সহধর্মিনী হইতে চাও, তাহা হইলে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে যাহাতে তিনি তোমার একান্ত ইচ্ছার বলে তোমাকেও করুনা করিয়া পথ দেখাইবেন। আমরা এখানে লক্ষ্য করেছি, তিনি কেমন সম্পূর্ণভাব ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পন করেছেন। একই সঙ্গে লক্ষ্যণীয় তিনি চাইতেন স্ত্রী মৃণালিনীও যেন তাঁকে বুঝতে পারেন ও তাঁর পথে চলেন। শ্রীঅরবিন্দ কখনও মৃণালিনীর মনোভাবের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতি নিমগ্নতা এবং বাক্যের এক নতুন ভঙ্গিমা ১৮ ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ সালে বন্দেমাতরম এ প্রকাশিত একটি রচনায় লক্ষ্য করা যায়। স্বরাজ জাতির নিকট ভগবানের মূর্ত প্রকাশ, নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা যথেষ্ট নয়, স্বাধীনতা হবে আরও ব্যাপক ও সামগ্রিক ব্যক্তি স্বাধীনতা, গোষ্ঠী স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা সকলই স্বরাজ অর্থে নিহিত। প্রাচীন ঋষিদের নিকট আমরা পেয়েছি আধ্যাত্মিক স্বাধিকার, সামাজিক অধিকার লাভ করেছি বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীর ও মহারাষ্ট্রীয় সন্তদের উপদেশাবলীতে। আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা এই ত্রিবিধ লক্ষ্যের শেষ পর্যায়। ঈশ্বর ভারতবর্ষকে বেছে নিয়েছিল পূত আধ্যাত্মিকতার স্বতঃনির্ঝরিনীরূপে, পরমেশ্বর সেই উৎস কখনই শুকিয়ে যেতে দেবেন না। স্বরাজ

আমাদের কাছে মূর্ত হয়েছে এই প্রকারে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনরায় আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে উদ্ধার করবে। পুনরায় এই সন্ত ও সাধু মহাত্মাদের পুণ্যভূমি প্রাচীন যুগের হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে সমর্থ হবে। দেশবাসীর আত্মা সনাতন সত্যের অন্তরলোকে উন্নীত হবে। এই সময় অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী নামে এক দেশপ্রেমিক যুবক, স্বদেশীর জন্য যিনি বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন এবং বিপ্লবী আন্দোলনে দীক্ষিত হন। বহুবছর পর অমরেন্দ্র এই যুগান্তকারী সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়ে লেখেন, শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন- যদি আমরা ভারতের স্বাধীনতা সত্যই চাই তবে আমাদের সর্বস্ব পণ করতে হবে- এমনকি নিজের জীবনকে দিতে হবে বলিদান। মৃত্যুভয়কে করতে হবে জয়- আর যার নাম করে দিতে হবে ঝাঁপ। এই হল আমার দীক্ষা মন্ত্র। অমরেন্দ্র বলেন, এই কটি কথা তাঁর জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেছিল। তাঁর মধ্যেকার ভয়, আসক্তি গেল নিমিষে মিলিয়ে। এই প্রকারে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে যুব মানসে আশ্চর্যময় পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন। আর তাঁর বাক্য ছিল সাক্ষাৎ মন্ত্রসদৃশ। ইতিমধ্যে বারীনের অনুরোধে লেলে কলকাতায় আসেন এবং ২৩ নং স্কট লেনের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর যোগানুশীলন সম্পর্কে শেষ করে লেলে জানতে পারেন যে শ্রীঅরবিন্দ ধ্যান ও অন্যান্য যোগাভ্যাস পরিত্যাগ করেছেন। লেলে বলেন যে, শয়তান শ্রীঅরবিন্দকে ভর করেছে। শ্রীঅরবিন্দ শুনতে পেয়ে বলেছিলেন যে, যদি এ সত্যই শয়তান হয় তবে আমি তাকেই অনুসরণ করব। পরবর্তীকালে তিনি আমাদের বলেন যে তিনি এই সময়ে কাজের মধ্যে বিশ্রামে এবং নিদ্রার মধ্যেও সর্বদা ধ্যানস্থ থাকতেন। তাঁর নির্দিষ্ট কোন ধ্যানের সময়ের প্রয়োজন ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও অনুরূপ বলেছিলেন যে, যে কালীর নাম ত্রিসন্ধ্যা জপ করে তার আচার নির্দিষ্ট পূজার সময়ের কি দরকার? বাস্তবিক মাত্র কয়েক মাসেই শ্রীঅরবিন্দ লেলের ন্যায় এক অভিজ্ঞ যোগীর ধারনার বাইরে (যোগের পথে) অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। লেলেকে কলকাতায় নিয়ে আসার পেছনে বারীনের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। এর কিছুদিন আগে বারীন স্কটলেনে দাদার বাসা ছেড়ে উত্তর কলকাতার মুরারীপুকুরে মানিকতলা বাগানবাড়িতে চলে আসেন। এটা ছিল তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি, আড়াই একর জমির উপর ঝোপজঙ্গল আর প্রায় ভগ্নদশা এক অট্টালিকা নিয়ে বাগান। কিন্তু জায়গাটা বারীনের পরিকল্পনার পক্ষে ছিল আদর্শস্থল স্বরূপ। এখানে বারীন বেছে বেছে জনা বারো অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকদের এনে জড়ো করেছিলেন- যাঁরা দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখানে তাঁদের দেওয়া হত বিশেষ শিক্ষণ, কৃচ্ছ্রতাসাধন, অস্ত্র নিয়ে লক্ষ্যভেদ এবং বোমা তৈরির শিক্ষা। এই সঙ্গে চলত ধ্যান, গীতা পাঠ ইত্যাদি। শ্রীঅরবিন্দ এঁদের কার্যক্রম জানতেন কিন্তু নিজে কিছুতে জড়িত ছিলেন না। নলিনীকান্ত গুপ্ত (নলিনীদা) তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে বারীন তাঁকে একবার মানিকতলা

বাগানবাড়িতে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে আসতে পাঠান। তিনি লিখেছেন যে, ট্রামে করে আমি রওনা দিলাম। বিকাল প্রায় চারটায় শ্রীঅরবিন্দের বাসায় গিয়ে পৌঁছলাম। আমি নীচের একটা ঘরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি নেমে এলেন। আমার সামনে দাঁড়ালেন আর জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি বাংলায় বললাম, বারীন আমাকে পাঠিয়েছে। আপনার পক্ষে আমার সঙ্গে বাগান বাড়িতে যাওয়া কি সম্ভব হবে? তিনি আমাকে খুব ধীরেধীরে উত্তর দিলেন, প্রত্যেকটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করে মনে হয় বাংলায় বাক্যালাপ তখনও তিনি ভালভাবে রপ্ত করতে পারেন নি- বারীনকে গিয়ে বলবে এখনও আমার মধ্যাহ্নের খাওয়া হয়নি, আজ আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। এই হল সাক্ষাৎকার। আমি কোন কথা না বলে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। এই হল আমার তাঁর সঙ্গে প্রথম শুভ সাক্ষাৎ, আমার প্রথম দর্শন ও সাক্ষাৎকার। এখন লেলের কথায় আসা যাক। বারীন চেয়েছিলেন যে লেলে মানিকতলা বাগানবাড়িতে এসে তাঁদের যোগশিক্ষা অনুশীলন করান। কিন্তু লেলে সেখানে পৌঁছেই তাঁদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। বারীনকে সাবধান করে বলেন যে তিনি যদি এই মারাত্মক পথ ত্যাগ না করেন তবে অচিরেই বিপদের মুখে পড়বেন। বারীন অবশ্য লেলের উপদেশ ও সতর্কবানী শুনতে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তীকালে বলেছিলেন, বারীন প্রকৃতই বিপদে পড়েছিল- তাঁর জীবনের চরমতম সংকট মুহূর্ত সত্ত্বর উপস্থিত হল। (রাজনৈতিক) দিগন্তে কালো মেঘের সঞ্চার হতে থাকল। ৩০ শে এপ্রিল, মুজাফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে বোমা ছোড়া হয়। কিংসফোর্ড ছিল এক জঘন্য অত্যাচারী শাসক। রাজনৈতিক অপরাধের জন্য এক চৌদ্দ বছরের বালককে জনসমক্ষে বেত্রাঘাত করার জন্য বলতে যার কোন সংকোচ হয়নি। জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র ছিল এই রাজপুরুষ। ঘটনাটি ঘটে গেল এইভাবে। ঐ গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিল না। দুজন ইংরাজ মহিলা ঐ গাড়িতে ছিলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা বোমায় মারা গেলেন। এই ঘটনায় হৈ চৈ পড়ে গেল। সরকার উঠে পড়ে ধড়পাকড় শুরু করল। শ্রী অরবিন্দ ঘটনাবলীর উপর তীক্ষ্ন নজর রাখছিলেন। তিনি বারীনকে অবিলম্বে বাগানবাড়ি থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য আপত্তিকর দ্রব্যাদি সরিয়ে ফেলতে বলে পাঠালেন। কিন্তু বারীন কিছু করবার আগেই পুলিশ (২রা মে, ১৯০৮) বাগানবাড়িতে হানা দিল। বাসিন্দাদের গ্রেপ্তর ও মালপত্র বাজেয়াপ্ত করল। ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ বাসা বদলিয়েছেন। ২৮ শে এপ্রিল তিনি স্কটলেনের বাসা বদল করে নবশক্তি অফিসের ৪৮ নং গ্রে স্ট্রীটের বাসায় চলে আসেন। এই বাড়িতে ২রা মে, শ্রীঅরবিন্দ যখন সুগভীর নিদ্রামগ্ন, পুলিশ সদলবলে এসে হানা দিল। শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হলেন। 'শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিত মনে ঘুমাইয়াছিলাম। ভোরে প্রায় ৫টার সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্তে ক্ষুদ্র ঘরটি

সশস্ত্র পুলিশে ভরিয়া উঠিল, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রেগান, ২৪ পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদকুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্তি, আর কয়েকজন ইন্সপেক্টর, লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা, খানাতল্লাশির সাক্ষী। হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক-কামানসহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল। শুনিলাম, একটি শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে, তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই। শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের ঘটনা এইভাবে স্বরচিত কারাকাহিনী পুস্তিকাতে আমরা যা পাই, ১৯০৯ -১০ সালে সুপ্রভাত কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলায় লেখা এই পুস্তকটির পাঠক মাত্রই এক অনবদ্য স্বাদের অধিকারী হবেন, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কারা কাহিনীর বর্ণনা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততায় আচ্ছন্ন, অবিশ্বাস্যময় প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর সুতীব্র সাধনার এক উদ্দীপনাময় বিবরণী, সেই সঙ্গে কারাগারে তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধিলাভের বর্ণনা রয়েছে পুস্তিকাটিতে। ব্যঙ্গ, পরিহাস ও কৌতুকের মধ্য দিয়ে তিনি ইংরাজ কারা প্রণালীকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন ও মুখোস খুলে দিয়েছেন তা সত্যই উপভোগ্য। জেলখানার বাসিন্দা, অফিসার এবং সহবন্দীদের কারো কারোর আলেখ্য নকসাকারে সুন্দরভাবে তাঁর পুস্তকে স্থান পেয়েছে। আমরা তাঁর বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আর ভবিষ্যতে আরো দেবার লোভ রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের বর্ণনা আবার আরম্ভ করা যাক, বিছানায় বসিয়া আছি, তখনও অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থা, ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন। অরবিন্দ ঘোষকে আপনিই কি? আমি বললাম, আমিই অরবিন্দ ঘোষ। অমনি একজন পুলিশকে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন। তাহার পর ক্রেগানের একটি অতিশয় অভদ্র কথায় দুজনের অল্পক্ষণ বাক্ বিতন্ডা হইল। আমি খানা তল্লাশির ওয়ারেন্ট চাহিলাম, পড়িয়া তাহতে সহি করিলাম। ওয়ারেন্টে বোমার কথা দেখিয়া বুঝিলাম। এই পুলিশ সৈন্যের আবির্ভাব মজঃফরপুরে খুনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কেবল বুঝিলাম না আমার বাড়িতে বোমা বা অন্য কোন স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই বডি ওয়ারেন্ট এর অভাবে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে। তবে সেই সম্বন্ধে বৃথা আপত্তি করিলাম না। তাহার পরেই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমড়ে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্তানী কনস্টেবল সেই দড়ি ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বসুকে পুলিশ উপরে আনে। তাহাদেরও হাতে হাতকড়ি। কোমড়ে দড়ি। প্রায় আধঘন্টার পর কাহার কথায় জানি না। তাহারা হাতকড়ি ও দড়ি খুলিয়া লয়। ক্রেগানের কথায় ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্তে ঢুকিয়াছেন। যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট আইন ভঙ্গকারী আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্র কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন। বিনোদ বাবু তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি বুঝাইতে

চেষ্টা করেন, তাহার পর ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি না কি বি এ পাশ করিয়াছেন? এইরূপ বাসায় এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়াছিলেন। এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে? আমি বলিলাম, আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি। সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, তবে কি আপনি ধনীলোক হইবেন বলিয়া এই সকল কান্ড ঘটাইয়াছেন? দেশহিতৈষীতা, স্বার্থত্যাগ বা দারিদ্র্যব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থুলবুদ্ধি ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না। এতক্ষণ খানাতল্লাশি চলিতেছে। ইহা সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হয় এবং প্রায় সাড়ে এগারটায় শেষ হয়। বাক্সের ভেতর বা বাহিরে যত খাতা, চিঠি, কাগজ, কাগজের টুকরো, কবিতা, নাটক, পদ্য গদ্য প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা পাওয়া যায়, কিছুই এই সর্বগ্রাসী খানাতল্লাশির কবল হইতে মুক্তি পায় না।

খানাতল্লাসিতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল। ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষা করেন। যেন তাহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নতুন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। তল্লাশি শেষ হলে ধৃত তিনজনকে স্থানীয় থানায় প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে পুলিশ সদর দপ্তর লালবাজারে আনা হল। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, লালবাজারে কয়েক ঘন্টা বসাইয়া, রয়ড স্ট্রীটে লইয়া যায়, সেই শুভ স্থানে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইলাম। রয়ড স্ট্রীটে ডিকেটটিভ পুঙ্গব মৌলবী শামস উল আলামের সহিত আমার প্রথম আলাপ ও প্রীতি স্থাপন হয়। মৌলবী সাহেব আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে অতিশয় সরস বক্তৃতা শুনাইলেন। হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের একই মূলমন্ত্র, হিন্দুদের ওঙ্কারের ত্রিমাত্রা অ উ ম, কোরাণের প্রথম তিন অক্ষর হল অ ল ম ভাষাতত্ত্বের নিয়মে ল এর বদলে উ ব্যবহার হয়, অতএব হিন্দু ও মুসলমানের একই মন্ত্র। তথাপি নিজের ধর্মের পার্থক্য অক্ষুন্ন রাখিতে হয়, মুসলমানের সঙ্গে আহার করা হিন্দুর পক্ষে নিন্দনীয়। সত্যবাদী হওয়াও ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। সাহেবরা হলেন অরবিন্দ ঘোষ হত্যাকারী দলের নেতা, ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা। তবে সত্যবাদিতা রক্ষা করিতে পারিলে সিটিউশন সেভড হয়। মৌলবীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিপিন পালও অরবিন্দ ঘোষের ন্যায় উচ্চচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাই করিয়া থাকুন, তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মৌলবী সাহেব নিজের মত ছাড়িলেন না। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রবল ধর্মভাব দেখিয়া আমি অতিশয় চমৎকৃত ও প্রীত হইলাম। নিজে বেশি কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র বিবেচনা করিয়া নম্রভাবে তাঁহার অমূল্য উপদেশ শুনিয়া লইলাম এবং তাহা সযত্নে হৃদয়ে অঙ্কিত করিলাম। এত ধর্মভাবে মাতোয়ারা হইয়াও মৌলবী সাহেব ডিটেকটিভগিরি

ছাড়েন নাই। একবার বলিলেন, আপনি যে আপনার ছোট ভাইকে বোমা তৈয়ার করিবার জন্য বাগানটি ছাড়িয়া দিলেন, বড় ভুল করিলেন, ইহা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই। তাঁহার কথার অর্থ বুঝিয়া অমি একটু হাসিলাম, বলিলাম, মহাশয়, বাগান যেমন আমার, তেমনি আমার ভাইয়ের আমি যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, বা ছাড়িয়া দিলেও বোমা তৈয়ারী করিবার জন্য ছাড়িলাম, এ খবর কোথায় পাইলেন? মৌলবী সাহেব অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না, না, আমি বলিতেছি যদি তাহা করিয়া থাকেন। রয়ড স্ট্রীট থেকে শ্রীঅরবিন্দকে আবার লালবাজারে আনা হয়। তার নিজের কথায় শোনা যাক, লালবাজারে দোতলায় একটি বড় ঘরে আমাদের দুজনকে (শ্রীঅরবিন্দ ও শৈলেন) এক সঙ্গে রাখা হল। আহার হইল অল্পমাত্র জলখাবার। অল্পক্ষণ পরে দুইজন ইংরাজ ঘরে প্রবেশ করেন। পরে শুনিলাম একজন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে সাহেব। দুইজনে একসঙ্গে আছি দেখিয়া হ্যালিডে সার্জেন্টের উপর চটিয়া উঠিলেন, আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, খবরদার এই লোকটির সঙ্গে যেন কেহই না থাকে বা কথা না বলে। সেই মুহুর্তেই শৈলেনকে অন্য ঘরে সরাইয়া বন্ধ করে। আর সকলে যখন চলিয়া যায়, হ্যালিডে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া আপনার কি লজ্জা করে না? আমি বলিলাম, আমি লিপ্ত ছিলাম, ইহা ধরিয়া লইবার আপনার কি অধিকার? উহার উত্তরে হ্যালিডে বলিলেন, আমি ধরিয়া লই নাই, আমি সবই জানি। আমি বলিলাম, কি জানেন বা না জানেন আপনারই অবগত, এই হত্যাকান্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। হ্যালিডে আর কোন কথা বলিলেন না। এই সকল কথাবার্তার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করব, প্রশ্নোত্তর কালে প্ররোচনা সত্ত্বেও শ্রীঅরবিন্দ কতটা সতর্ক ও সংযত আচরণ করেছিলেন। আই সি এস পরীক্ষার প্রস্তুতি কালে তাঁকে যথেষ্ট আইন বিষয়ক পড়াশুনা করতে হয়েছিল। যার ফলে তিনি কোন ফাঁদে পা দেননি। জোর জবরদস্তি সত্ত্বেও তিনি কোন বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেন এবং নিজের অধিকার রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্রথম থেকে সরকার শ্রীঅরবিন্দকে যথাসাধ্য হেনস্তা করার চেষ্টায় ছিল। তাঁকে যে খাদ্য দেওয়া হত, তা ছিল খাওয়ার অনুপযুক্ত। তাঁর আইন ও কৌন্সিলী বাড়ি থেকে খাবার পাঠানোর সুপারিশ করলে পুলিশ কমিশনারের অনুমতি মিলল না। এইভাবে তিনরাত্রি লালবাজারে শ্রীঅরবিন্দের কেটে গেল। সোমবার ৫ই মে কলকাতা চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বন্দীদের পেশ করা হল। ইতিমধ্যে আটক ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্য হেতু (আটটি বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে ২৪ মে তারিখে প্রায় পঁচিশজনকে আটক করা হ০০য় এবং পরে সংখ্যায় আরও বাড়ে) সরকার সকলের বিরুদ্ধে একসঙ্গে আলিপুরে ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দায়ের করতে স্থির করে। শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্যদের বিচার সাপেক্ষে আলিপুর জেলে স্থানান্তর করা হল। এই বিচার আলিপুর বোমার মামলা নামে খ্যাত।

শ্রীঅরবিন্দের কারাজীবন আরম্ভ হয় ৫ই মে। পরের বছর ৬ ই মে তিনি যুক্ত নন। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, ১লা মে শুক্রবার ১৯০৮ জানিতাম না যে এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসরের কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল, সবই ছিন্ন হইবে, এক বৎসর কাল মানব সমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। আবার যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিতি অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নতুন মানুষ, নতুন চরিত্র, নতুন বুদ্ধি, নতুন প্রাণ, নতুন মন লইয়া নতুন কর্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে। বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম। ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ও বহুসংখ্যক বিপ্লবীদের আটক সংবাদ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। দেশবাসী হল হতবুদ্ধি। মজঃফরপুর বোমার ঘটনায় ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। যে দুজন যুবক ধরা পড়েছিল, তার মধ্যে প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তার এড়াতে নিজেকে গুলি করে। আর অন্যজন ক্ষুদিরামকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। তাঁর নাম শহীদ হয়ে রয়েছে। অতি অল্প লোকই বিশ্বাস করেছিল যে শ্রীঅরবিন্দ আতঙ্কবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। তবু তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সরকার উঠে পড়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে তিনি হচ্ছেন নাটের গুরু। সকল অনর্থের মূল। দেশবাসী হতচকিত, বিমূঢ় ও যুগপৎ হয়েছিল শোকাচ্ছন্ন। ১৭ ই মে ১৯০৮ শুরু হল ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্লির আদালতে আলিপুর বোমার মামলা। এটা ছিল প্রারম্ভিক বিচার। সব শুদ্ধ ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে যথেষ্ট প্রমানাভাবে তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। বাকী ৩৯ জনের বিরুদ্ধে তার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দও আছেন, আনীত অভিযোগের সাক্ষ্য প্রমাণ সাপেক্ষে শুনানি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আরম্ভ হল। এই বিচার জেলাধীশের আদালতে চলাকালে এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। একজন অভিযুক্ত বন্দী, নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হতে রাজী হল। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে। বিনিময়ে নরেন গোঁসাই আদালতে স্বীকারোক্তি। সমস্ত তথ্য সহ বিবৃতি পেশ করবে এবং সরকারের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। যখন এইসব ঘটেছে, গোঁসাইকে অন্যান্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে জেলের ইউরোপীয় মহল্লায় স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা করা গেল না। কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বোস নামে দুই বিপ্লবী স্থির করে ফেললেন গোঁসাইকে এই বেইমানির মূল্য প্রাণ দিয়ে শোধ করতে হবে। তাঁরাও রাজসাক্ষী হতে ইচ্ছুক এই খবর কর্তৃপক্ষকে পাঠালেন। ৩১ শে আগস্ট সকালে জেল ডিসপেনসারির সামনে তাঁদের নরেন গোঁসাই এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করা হয়। এখানে যখন কথাবার্তা চলছিল। হঠাৎ গুলির আওয়াজ শোনা গেল। গোঁসাই ছুটে পালাচ্ছে। পেছনে ধাবমান কানাই ও

সত্যেন, আর তাদের পেছনে কারারক্ষী বাহিনী। গোঁসাই আহত হয়ে পথের ধারে ড্রেনের মধ্যে পড়ে যায়। কানাই সত্যেনকে রক্ষীরা ধরে ফেলে এবং চরম হৈ চৈ ও উত্তেজনার মধ্যে স্থানান্তরিত করে। কানাই ও সত্যেনের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত বিচার শুরু হল। আত্মপক্ষ সমর্থনে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাঁদের ফাঁসি হয়। সকল দেশপ্রেমিকের চোখের জলে ধৌত হয়ে বীরের ন্যায় তাঁদের মৃত্যু হল। এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে গোঁসাইয়ের মৃত্যু মামলার উপর সামগ্রিকভাবে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে। সে ইতিমধ্যে এমন সব বিবৃতি দিয়েছিল যা শ্রী অরবিন্দের বিপক্ষে নানা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারত। গোঁসাই একজন প্রধান সাক্ষ্য হতে পারত কিন্তু তার মৃত্যুতে তার বিবৃতি সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করা গেল না, কারণ এই যে আসামী পক্ষ তাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় জেরা করার সুযোগ পাবে না। কার্যত তার বিবৃতি আইনের চক্ষে বাতিল বলে গণ্য হল। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কানাই এবং সত্যেন কি করে রিভলবার পেল? সত্য ঘটনা জানা যায়নি, কিন্তু পরে অনুসন্ধান করে জানা যায় যে সম্ভবত চন্দননগরের এক বিপ্লবী রিভলবার দুটি গোপনে জেলখানায় বারীনের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। পদ্ধতি যাই হোক না কেন, যে ভাবে বিশ্বাসঘাতকের মুখ বন্ধ করা হয়েছিল, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। প্রাথমিক বিচার পর্ব ১৯ই সেপ্টেম্বর শেষ হল। ৩৯ জন অভিযুক্তদের মধ্যে ৩ জন কানাই, সত্যেন ও নরেন গোঁসাই মারা গেছে। অবশিষ্ট ৩৬ জনকে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের শুনানী শেষে, ম্যাজিস্ট্রেট উচ্চতর আলিপুর দায়রা আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করে। সকল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারা সংঘবদ্ধভাবে, হিংসার আশ্রয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ভারতীয় দন্ডবিধি অনুসারে যা ছিল মারাত্মক অপরাধ। বারীন, হেমচন্দ্র দাস, উল্লাস কর দত্ত ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগ ও ছিল -ষড়যন্ত্র, গুপ্ত হত্যা প্রচেষ্টা অন্তর্ঘাতমূলক কার্যাবলী, অবৈধ বিস্ফোরক তৈরী ইত্যাদি ইত্যাদি এই সকল অভিযোগ প্রমাণিত হলে সর্ব্বোচ্চ দন্ড দিতে কোন বাধা ছিল না। শ্রী অরবিন্দকেও এই সকল অভিযোগে জড়ান হয়েছিল, বিশেষত ষড়যন্ত্র ও আতঙ্কবাদী কার্যকলাপে সহায়তা করার অপরাধে। প্রধান বিচারকার্য আরম্ভের মঞ্চ তৈরী শুরু হল বিচার ২৪ পরগনা ও হুগলীর জেলা ও দায়রা জজ মিঃ চার্লস পোর্টেন বীচক্রফট এবং আদালতে। সাক্ষ্য হিসাবে ৪০০০ দলিল ৩০০ থেকে ৪০০ দস্তাবেজ, বিস্ফোরক, বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র আদালতে পেশ করা হল। প্রায় ২০০ ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। মামলা শুরু হয়েছিল, ১৯শে অক্টোবর, ১৯০৮ আর চলেছিল ১৩ই এপ্রিল ১৯০৯ - মোট ১৩১ দিন। মামলার রায় প্রকাশ পায় ১৯০৯ সালের ৬ই মে। বিস্ময়কর এই আইন যুদ্ধ। যার ফলাফলের উপর বহু ব্যক্তির জীবন মরণ নির্ভরশীল তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই। এই মামলা অসাধারণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে, এর দৈনন্দিন কার্যবিবরণী সারা দেশের লোক শ্বাসরুদ্ধ আবেগের সঙ্গে লক্ষ্য করত। মামলার কিছু মুখ্য বৈশিষ্ট্য ও ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

আশ্চর্যজনক ঘটনা হল যে এই মামলার বিচারক ছিলেন বীচক্রফট সাহেব। তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের (আই সি এস) একজন সদস্য এবং ১৮৯০ সালে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একই বছরে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ বীরেক্রফট এর তুলনায় ভাল ফল দেখান। তাঁরা দুজনই ছিলেন কেমব্রিজ এর ছাত্র, শ্রীঅরবিন্দ পড়তেন কিংস কলেজে আর বীচক্রফট ক্লেয়ার কলেজে এ আই সি এস পরীক্ষায় ইন্টারমিডিয়েট ও ফাইনাল দেওয়ার সময় তাদের যে দেখা সাক্ষাৎ হত তার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁরা উভয়ে উভয়কে জানতেন। তবে বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা তাঁদের মধ্যে ছিল না। অন্যথায় বীচক্রফট মামলার ভার নিজের আদালতে গ্রহণ করতেন না। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে ভালভাবে জানতেন এবং সেই কারণে মামলাটি পরিচালনার সময় তিনি অতিরিক্ত মনোযোগ ও সতর্কতা অবলম্বন করেন। তাঁর সততা ও দক্ষতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পরবর্তী জীবনে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক হয়েছিলেন। প্রদত্ত মামলার রায় যে ন্যায্য হয়েছিল অনুমান করা যায় যখন সরকার এর বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে কোন আপীল করলেন না। যদি তাঁর জায়গায় অন্য কোন কম নিরপেক্ষ বিচারক এই মামলা পরিচালনা করতেন তবে ফলাফল উল্টো হতে পারত সরকার পক্ষ মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ইয়ারডলি নর্টনকে এই মামলায় নিযুক্ত করেন। নর্টন ছিলেন দায়রা মামলায় দুর্ধর্ষ, তার ধমকে ও জেরায় বহু সাক্ষী বশ্যতা স্বীকার করত এবং মামলা জিতিয়ে দিতে বাধ্য হত। প্রাথমিক শুনানিকালে শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য অভিযুক্তদের পক্ষে বহু উকিল মামলা পরিচালনা করেন। মামলার দায়রা আদালত পর্যায়ে চিত্তরঞ্জন দাশ অভিযুক্তদের বিশেষত শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে কৌশলীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি তখন উদীয়মান এক বিখ্যাত ব্যারিস্টার। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ইংল্যান্ডে পরিচয় হয়েছিল এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। তিনি নিজের অন্যান্য মামলা ত্যাগ করে, রাত্রিদিন পরিশ্রম করে বিনা পারিশ্রমিকে অদ্ভুত অধ্যবসায় ও উৎসাহে মামলাটির পরিচালনার দায়িত্ব নেন এবং আত্মত্যাগের এক নজীর সৃষ্টি করেন। মামলাটি পরিচালনায় তাঁর চরম উৎকর্ষতা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে তুলে ধরে এবং তিনি তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন রাজনীতি ক্ষেত্রে জাতীয় নেতার আসনে স্থান পান। সত্যকথা এই যে, চিত্তরঞ্জন দাশের আবির্ভাব শ্রীঅরবিন্দের স্বপক্ষে মামলাটির গতি ঘুরিয়ে দিল। কারামুক্তির পর উত্তরপাড়ায় তাঁর বিখ্যাত ভাষণে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, দায়রা আদালতে বিচার আরম্ভকালে আমি আমার কৌসলীকে লিখিত উপদেশ দিতাম- কোনটা মিথ্যা অভিযোগ এবং কিভাবে সাক্ষীকে জেরা করতে হবে। অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার আত্মপক্ষ সমর্থন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন ঘটল। অন্য এক কৌসুলী আমার পক্ষে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে দেখে সন্তুষ্ট হলাম। কিন্তু লিখিত উপদেশ প্রয়োজনীয় মনে

হয়েছিল। হঠাৎ সব কিছু আমাকে ত্যাগ করতে হল। নিজের অন্তর থেকে শুনতে পেলাম এই ব্যক্তিই তোমাকে বন্ধন মুক্ত করবে। কাগজপত্রের আর দরকার হবেনা। তুমি নও এবার থেকে আমিই উপদেশ দেব। এই মামলা দীর্ঘদিন ব্যাপী চালাতে যে প্রভূত খরচ হচ্চিল তা সহজেই অনুমেয়। এর ব্যয় নির্বাহের জন্য সরোজিনী এক সহায়ক নিধি গঠন করেন। শ্রীঅরবিন্দের ভগিনী ও দেশের দূর দূরান্তর থেকে জন সাধারণ যে যা পেরেছিলেন এই ফান্ডে সাহায্য করে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীদের বিপদে এগিয়ে আসেন। বিচার পদ্ধতি বা বিচারালায়ের পরিবেশ সম্পর্কে কিছু এখানে উল্লেখ করা দরকার। বিচারাধীন বন্দীদের দিনের পর দিন মামলা চলাকালে আদালতে পেশ করা হত। তাদের একটা জালের মধ্যে রাখা হত। আদালত ঘর ঘিরে থাকত বেয়নেটধারী সশস্ত্র পুলিশ। নর্টনকে বলতে শোনা যায়। সে ব্রীফের নিচে আত্মরক্ষার্থে গুলি ভর্তি পিস্তর নিয়ে আসত। এই রকম গম্ভীর পরিস্থিতিতে ও আদালতে মামলা চলাকালে বন্দীদের ব্যবহার ছিল আশ্চর্যজনক দৃশ্য। শ্রীঅরবিন্দ থাকতেন শান্ত, নির্লিপ্ত এবং আত্মমগ্ন বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। অন্যাদেব মধ্যেও কোন চঞ্চলতা লক্ষ্য করা যেত না। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগবিহীন ও প্রফুল্ল দেখাত। কারাকাহিনীতে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন.... এই অদ্ভূত দৃশ্য দেখা যাইত যে, মোকদ্দমা চলিতেছে, ত্রিশ চল্লিশজন আসামীর সমস্ত ভবিষ্যৎ লইয়া টানাটানি হইতেছে। তাহার ফল ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে পারে। অথচ সেই আসামীগণ সেইদিকে দিক্‌পাত না করিয়া কেহ বঙ্কিমের উপন্যাস, কেহ বিবেকানন্দের রাজযোগ বা সায়েন্স এফ রিলিজিয়ন্স, কেহ বা গীতা, কেহ পুরান কেহ ইউরোপীয় দর্শন একাগ্রমনে পড়িতেছেন। বিচারপর্ব অবশেষে শেষ হল। যদি এই মামলায় শ্রীঅরবিন্দ জড়িত না থাকতেন তবে অনেক আগেই মামলার নিষ্পত্তি হত। বস্তুত সরকার পক্ষ মূলত তাঁকেই অভিযুক্ত করতে সর্বতোভাবে প্রয়াসী ছিলেন। বিবাদীপক্ষের কৌঁসিলী সি আর দাশের সওয়াল ভাষণ দীর্ঘ আটদিন ব্যাপী চলছিল। আইনের দুনিয়ার এই সওয়াল অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বিচারক ও জুরিদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য দীর্ঘকাল বিখ্যাত হয়ে থাকবে। তিনি বলেছিলেন, আমার আবেদন এই ব্যক্তির সপক্ষে, আজ যিনি অভিযুক্ত হয়ে এই আদালতে বিচারাধীন। তিনি শুধু এখানেই নন, ইতিহাসের বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী। আমার আবেদন আপনাদের নিকট। যখন এই বিতর্ক কালের গর্ভে নীরব হবে, উত্তেজনা হবে প্রশমিত, যখন তিনি ধরাধাম ত্যাগ করবেন তার পরও তাঁকে লোকে মান্য করবে দেশপ্রেমের কবি। জাতীয়তার নবী এবং মানব প্রেমিক হিসাবে। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও তাঁর বানী শুধু যে ভারতবর্ষেই ধ্বনিত, প্রতিধ্বন্তি হবে তা নয়, ছড়িয়ে পড়বে সমুদ্র অতিক্রম করে দূর, দূরদেশে। এই কারণে আমার আবেদন এই ব্যক্তি আজ শুধু এই আদালতে কাঠ গড়ায় বিচারপ্রার্থী নন, ইতিহাসের ন্যায়ালয়ে বিচারপ্রার্থী। বিচারের রায় ১৯০৯

সালের ৬ ই মে প্রকাশিত হবে। ঐদিন যাতে কোন গন্ডগোল বা হাঙ্গামা না ঘটে তার জন্য ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। বন্দীদের আদালত কক্ষে আনা হল ১১টা বাজতে ১০ মিনিটে বিচারক আসন গ্রহণ করলেন। ১০ মিনিট পরে দন্ডাদেশ ঘোষণা করা হল। বারীণ ও উল্লাসকর এর মৃত্যুদন্ড, হেমচন্দ্র দাস ও অন্যান্য দশজনের যাবজ্জীবন দীপান্তর, সাতজনের দীপান্তর ও বিভিন্ন মেয়াদী কয়েদবাস। বাকী ১৭ জনের বেকুসর খালাস এর মধ্যে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ও নলিনীকান্ত গুপ্ত। দন্ডাদেশের কঠোরতা সত্ত্বেও শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে দেশের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। অবশ্য আপীলে বারীন ও উল্লাসকর এর মৃত্যুদন্ড মুকুব হয়ে যাবজ্জীবন দীপান্তর ধার্য হয়। শ্রীঅরবিন্দ সহ অন্যান্য যুক্ত অভিযুক্তদের সি আর দাশ এর গৃহে সোজা আনা হল। সেখানে তাঁদের রাজকীয় অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। মহিলারা তাঁদের মাল্যদানে সম্বর্ধনা জানালেন। প্রভৃত উল্লাস, আনন্দ ও ভুরিভোজনের ব্যবস্থা হল। অবশ্য এই সব আনন্দ উল্লাসের মধ্যে শ্রী অরবিন্দ ছিলেন বাহ্যত অবিচলিত ও উদাসীন দৃষ্টি গভীর। আমি এখান শ্রীঅরবিন্দের আলিপুর জেলের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই। এক অর্থে বাইরের নাটকীয় ডামাডোলের চাইতে যা ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্য ময়। তাঁর এক বছর স্থায়ী কাবাবাসের প্রথম মুহূর্ত থেকেই শ্রীঅরবিন্দকে নির্জন কারাকক্ষে রাখা হয়েছিল। কারাকাহিনীতে তিনি লিখেছেন, আমার নির্জ্জন কারা গৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ ছিল। ইহার জানালা নাই, সম্মুখভাগে বৃহৎ লোহার গারদ, এই পিঞ্জরই আমার নির্দিষ্ট বাসস্থান হইল। ঘরের বাইরে একটি ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জমি, ইটের উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা। সেই দরজার উপরিভাগে মানুষের চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রন্ধ্র।

দরজা বন্ধ হইলে শাস্ত্রী এই রন্ধ্রে চক্ষু লাগাইয়া সময় সময় দেখে, কয়েদী কি করিতেছে। কিন্তু আমার উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাকিত। এই রকম ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাঁর খাওয়া, থাকা, নিদ্রা, বিশ্রাম, মলমূত্র ত্যাগ সবই করতে হত। এই শোচনীয় অবস্থার তিনি কিভাবে বর্ণনা করেছেন, শোনা যাক, বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র ঘরে এমন ব্যবস্থা থাকায় সর্বদা, বিশেষত, আহারের সময় এবং রাত্রিতে বিশেষ অসোয়াস্তি ভোগ করিতে হইত। জানি শোবার ঘরের পার্শ্বে পায়খানা রাখা, স্থানে স্থানে বিলাতী সভ্যতার অঙ্গবিশেষ, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ঘরে শোবার ঘর, খাবার ঘর ও পায়খানা। ইহাকেই টু মাস অফ এ গুড থিং বলে। আমরা কু অভ্যাসগ্রস্ত ভারতবাসী, সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে পৌঁছা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। বাস্তবিক পক্ষে তাঁকে যে অবস্থায় থাকতে দেওয়া হয়েছিল তা ছিল মানবতাবিরোধী। ভরা গ্রীষ্মে তাঁকে আটক করা হয়েছিল আর ঐ ক্ষুদ্র গৃহ ছিল যেন উত্তপ্ত কটাহ। খাদ্য যে দেওয়া হত তা ছিল আতঙ্ককর, মোটা চাল, তাতে মশলা থাকতে তুষ, কাঁকর, পোকা মাকড়, চুল, ময়লা প্রভৃতি দ্রব্যাদি ডাল দেওয়া হত বিস্বাদ জলো, আর তরকারি মেশানো

থাকত ঘাস পাতায়। পানীয় জলেরও কার্পণ্য ছিল। শ্রী অরবিন্দের একটা কম্বল, একটা থালাও একটি বাটি দেওয়া হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, আমার আদরের বাটিরও তদ্রুপ। বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারা, গৃহে যাইয়া সেই বাটিতে জলা নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্বকার্য্যক্ষম মূল্যবান। বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। তাঁর প্রতি এই জঘন্য ব্যবহারের তীব্রতা প্রশমিত হত যখন তাঁর নিজের কথায় পাঠ করতাম, আলিপুর গভর্নমেন্ট হোটেলের যে বর্ণনা করিলাম, এবং ভবিষ্যতে আরও করিব, তাহা নিজের কষ্টভোগ জ্ঞাপন করিবার জন্য নয়, সুসভ্য ব্রিটিশ রাজ্যে মোকদ্দমার আসামীর জন্য কি অদ্ভুত ব্যবস্থা, নির্দোষীর দীর্ঘকালব্যাপী কি যন্ত্রণা হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য এই বর্ণনা। যে সব কষ্টের করেন দেখাইয়াছি, সে সব ছিল বটে, কিন্তু ভগবানের দৃষ্টি ছিল বলিয়া কয়েকদিন মাত্র এই কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার পরে কি উপায়ে তাহা পরে বলিব- মন সেই দুঃখের অতীত হইয়া কষ্ট অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, সেইজন্য জেলের স্মৃতি মনে উদয় হইলে ক্রোধ বা দুঃখ না হইয়া হাসিই পায়। কারাজীবনের সকল অমানুষিক অসুবিধা সত্ত্বেও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব ছিল। তিনি এই ব্যবস্থার প্রথাগত ত্রুটিই লক্ষ্য করেছেন- কারা কর্তৃপক্ষের মানবিকতাবোধের কোন অভাব ব্যক্ত করেননি। কারাকাহিনীতে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের চরিত্রে সমমর্মিতা ও সহানুভূতি লক্ষ্য করেছেন। জেল সুপার মিঃ এমারসনকে বলেছেন, য়ুরোপের লুপ্তপ্রায় খ্রীস্টান আদর্শের অবতার। সহকারী জেল ডাক্তার বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ও তাঁর উপরন্তু ডাক্তার ডেলীর মধ্যে অনেক মানবিক গুণাবলী লক্ষ্য করেছেন। ডেলীরি মধ্যে আইরিশ জাতির উদারতা ও ভাবাবেগ দেখতে পেয়েছেন। বস্তুত ডাক্তার ডেলীর আজ্ঞানুসারে শ্রীঅরবিন্দকে কিছুদিন পরে সকালে ও বিকালে তাঁর কক্ষের সামনে খোলা উঠানে পায়চারী করার অনুমতি দেওয়া হল। তাঁকে বাড়ির থেকে জামাকাপড় ও বই পত্তর আনার অনুমতি দেওয়ায় তিনি মেশোমশায় কৃষ্ণকুমার মিত্রকে গীতা ও উপনিষদ পাঠাতে বলেন। কারাগৃহে শ্রীঅরবিন্দের যে অপরিমেয় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটেছিল সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। আগে উল্লেখিত হয়েছে যে, এই প্রসঙ্গ তিনি তাঁর উত্তরপাড়া ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর এই উপলব্ধির পিছনে তীব্র সাধন সমর বেশ কিছুকাল চলেছিল। উত্তরপাড়ায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'যখন আমাকে গ্রেপ্তার করে লালবাজার হাজতে রাখা হল, আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়ে উঠেছিল, আমি ঈশ্বরের মনের ইচ্ছা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। কিছুক্ষণের জন্য অমার দ্বিধা জন্মেছিল এবং মনে মনে তাঁকে ডেকে বলেছিলাম- আমার এমন কেন হল? আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে আমি আমার দেশের কাজের জন্য মনোনীত ও উৎসর্গীকৃত। যতদিন না সেই কাজ সম্পন্ন হয় ঈশ্বরের করুণা আমাকে রক্ষা করবে।

তাহলে আমাকে এখানে কেনই বা আনা হল, আর এই অভিযোগে? এক, দুই, তিনদিনের বাদে আমার মধ্যে এক বানী শুনতে পেলাম, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর। আমি শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। লালবাজার থেকে আমাকে আলিপুরে নিয়ে যাওয়া হল। একটি নির্জন কক্ষে একা আমাকে একমাস আটক রাখা হয়। সেখানে রাত্রিদিন আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী শোনার আগ্রহে তিনি আমাকে কি নির্দেশ দেবেন, আমার কি হবে করণীয়। এই নির্জনতার মধ্যে আমার প্রথম উপলব্ধি ও শিক্ষা আমি লাভ করলাম। আমার মনে আছে, গ্রেপ্তার হওয়ার মাসখানেক আগে, আমার সকল কাজকর্ম থেকে সরে আসার জন্য এক আদেশ আমি পেয়েছিলাম, সকল কাজকর্ম স্থগিত রেখে নির্জনতায় নিজের মধ্যে ঈশ্বরের সান্নিধ্য যাতে আমি লাভ করি। আমার দুর্বলতায় অমি সে ডাকে সাড়া দিতে পারিনি। কাজ ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়, নিজের অহংকারে আমি ভাবতাম আমাকে না হলে চলবে না এবং কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কাজেই অবসর আমার আর নেওয়া হল না। ঈশ্বর আমাকে বললেন, যে বন্ধন তোমার ছিন্ন করার ক্ষমতা ছিল না, তোমার হয়ে আমি ছিন্ন করলাম। আমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য কখনই ছিল না যে এই অবস্থা চলতে থাকুক। আমার অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এই জন্য তোমাকে এখানে আনা হয়েছে। যা তুমি নিজের চেষ্টায় শিখতে পারবে না সেই শিক্ষা তোমাকে দেওয়া হবে- আমার কাজের নিমিত্ত দীক্ষা হবে তোমার। তারপর গীতা আমার হাতে তুলে দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করল, আমার উপলব্ধি ঘটল শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাজে কি দাবি করেছিলেন, আর যারা ঈশ্বর অভিপ্রেত কর্মে আগ্রহী তাঁদের কর্তব্য কী। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উপলব্ধির কথা বলেছেন, তিনি ঈশ্বর হিন্দু ধর্মের মূলতত্ত্ব আমাকে শিক্ষা দিলেন। তিনি জেলারদের হৃদয়ে আমার জন্য সহানুভূতি সৃষ্টি করলেন। আমার হয়ে জেলখানার ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন, এই ব্যক্তি নির্জন কক্ষে হাঁপিয়ে উঠেছেন, অন্তত সকালে বিকালে আধঘন্টা এঁকে কারাগৃহের বাইরে হাঁটা চলার অনুমতি দেওয়া হোক। সেই ব্যবস্থা মঞ্জুর হয়। আর আমার এই ভ্রমণকালেই ঈশ্বরের শক্তি আমার মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করে। যে জেল আমাকে মানবজগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে। সেই দিকে আমি তাকালাম, কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই, আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। আমার কারাকক্ষের বাইরে যে গাছের ছায়ায় আমি ঘুরে বেড়াতাম দেখি সে তো গাছ নয়, দেখলাম বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে দাঁড়িয়ে আমাকে ছায়া দান করছেন। আমার কক্ষের গরাদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখি যে কোথায় লোহার গারদ, দরওয়াজা, এত বাসুদেব। নারায়ন শাস্ত্রী হয়ে আমাকে পাহাড়া দিচ্ছেন। যে কর্কশকম্বলে আমাকে শয়ন করতে হত, মনে হত শ্রীকৃষ্ণের হাত প্রসারিত সেখানে, ভালবাসা ও বন্ধুত্বের দুই হাত। এই ছিল ঈশ্বর প্রদত্ত অন্তদৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়। আমি জেলখানার

বন্দী চোর, খুনী প্রভৃতিদের মধ্যে দেখতে পেতাম বাসুদেবকে। কুকার্যরত ও তামস এই সকল আত্মার অধিকারীদের মধ্যে দেখতে পেতাম স্বয়ং নারায়ন বিরাজিত। এই সকল চোর, ডাকাত প্রভৃতি অপরাধীদের আমার প্রতি সদয়, সহানুভূতি সূচক ব্যবহার, প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও এই মানবিক ব্যবহার আমাকে লজ্জায় ফেলে দিত। এদের মধ্যে এমনি একজন ছিল যাকে আমি মনে মনে সাধুব্যক্তি বলে মানতাম- আমার দেশের নিরক্ষর এক চাষী ডাকাতির মামলার দশবছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত। আমাদের চক্ষে তথাকথিত ঘৃণ্য ছোটলোক বলে যাদের পরিচয়। ঈশ্বর আমাকে আর একবার বললেন, এইসব লোকদের মধ্যে কাজ করবার জন্য তোমাকে পাঠানো হয়েছে। জাতির এই অবস্থার জন্যই আমি এদের উন্নতি চাই। শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছেন, নিম্ন আদালতে মামলা চলাকালে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যখন আমাকে পেশ করা হয় তখনও আমার এই অনুভূতি কাজ করছিল। ঈশ্বরের বানী শুনতে পেলাম, যখন তোমায় জেলখানায় আনা হল, তখন ভগ্নহৃদয়ে তুমি কি বলে ওঠনি, কোথায় তোমার সুরক্ষা? এখন তাকিয়ে দেখ ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারী কৌন্সলীর দিকে। আমি তাকিয়ে দেখি ম্যাজিস্ট্রেটের জায়গায় বাসুদেব বসে, নারায়ন স্বয়ং বিচারকের আসনে আসীন। আমি সরকারী উকিলের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, কোথায় সরকারী উকিল? দেখলাম সেই আসনে নারায়ন উপবিষ্ট। আমার সুহৃদ ও বন্ধু স্মিতহাস্যে বলছেন, এখনও ভয় পাচ্ছ। তিনি বললেন, আমি সকলের মধ্যে অবস্থিত এবং সকল বাক্য ও কার্যের অধিনিয়ন্তা। আমার সুরক্ষা তোমাকে ঘিরে আছে, তুমি ভয় পেয়ো না। মামলা তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও। শুধু তোমার জন্য বা মামলার জন্য তোমাকে এখানে আনা হয়নি। এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে। এই বিচার আমার কাজের সুবিধার জন্য। অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়। ভীত হয়ো না। সব কিছু আমি পরিচালনা করছি। তুমি নিজের কাজের দিকে নজর দেওয়ার জন্য তোমাকে কারাগারে আনা হয়েছে। যখন মুক্তি পাবে, মনে রেখো কোন ভয় কোন দ্বিধা তোমার জন্য নয়। মনে রাখবে অন্য কেউ বা তুমি কিছু করছ না সব কিছুই আমি করাচ্ছি। অতএব সংশয়, বিপদ কষ্ট দুঃখ অসুবিধা বা অসম্ভব যা কিছুই মনে হোক না, কোন কিছুই অসম্ভব বা দুঃসাধ্য নয়। আমি এই জাতিকে উন্নত করছি, আমি বাসুদেব, আমিই নারায়ন। আমার ইচ্ছামত সব কিছু সংঘটিত হবে, অন্যের ইচ্ছায় নয়। আমি যা করতে চাইব। অন্য কোন শক্তির সাধ্য কি তা রোধ করে। শ্রীঅরবিন্দের নিজের বক্তব্যের উপর মন্তব্য নিস্প্রয়োজনে স্বয়ং পাঠে অনুভব করা যাবে এর অন্তর্নিহিত আবেগ, শ্রীঅরবিন্দ একে বলেছেন, এই হচ্ছে বিশ্বচেতনার উপলব্ধি। সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বরের মধ্যে সর্বভূতের অধিষ্ঠান-বাসুদেব সর্বমিতি। শ্রীঅরবিন্দের এই ছিল দ্বিতীয় দিব্যানুভূতি। প্রথমটি ব্রহ্ম নির্বাণ, যা তাঁর ঘটেছিল বরোদায়। মোট চারটি উপলব্ধির ভিত্তির উপর শ্রীঅরবিন্দের যোগ এবং আধ্যাত্মদর্শন স্থাপিত। কিছুদিন বাদে শ্রীঅরবিন্দকে একটি

বড় হলঘরে বিচারাধীন অন্য বন্দীদের মধ্যে রাখা হল। শ্রীঅরবিন্দ তখন নিজের সাধনায় এমনি গভীরভাবে লিপ্ত ছিলেন যে অন্য বন্দীদের স্বাভাবিক হাসিঠাট্টা, খেলাধুলা ও কথাবার্তায় ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। এখানে তিনি পূর্বে অপরিচিত অনেক সহ বন্দীদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেলেন। কারাকাহিনীতে তিনি এদের কথা বলেছেন, এই সকল যুবকদের দেখে মনে হত প্রাচীন ভারতের উন্নতমনা, অসীম সাহসী পুরুষ সকল যেন কোন সৎকার্যে পুনরায় ফিরে এসেছেন। উত্তরপাড়া ভাষণেও তিনি এদের সম্বোধন করেছেন, অসীম সাহসী যুবকবৃন্দ বলে, নরেন গোঁসাই এর হত্যাকান্ডের পর জেলে নিরাপত্তা বিধি ব্যবস্থা কঠোর করা হল। শ্রীঅরবিন্দকে পুনরায় নির্জন কক্ষে স্থানান্তর করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তখন সাধনায় এমনি মগ্ন যে নির্জনকক্ষে হয়ে উঠল আশ্রম বিশেষ। এই সময় তাঁর বহু অত্যাশ্চর্য অতিপ্রাকৃত উপলব্ধি ঘটেছিল। যা পরবর্তীকালে দুয়েকটি তিনি উল্লেখ করেছেন। এই সকল অনুভূতির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল যে, প্রায় দুই সপ্তাহকাল তাঁর নির্জন কারাকক্ষে বিবেকানন্দের উপস্থিতি ও তাঁকে উপদেশ দান। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, বিবেকানন্দের আত্মা আমাকে প্রথম অতিমানসের ইঙ্গিত দেন। সকল বস্তুতে সৎচেতনার দর্শন আমার এই ভাবেই হয়েছিল। বিবেকানন্দ অবশ্য অতিমানস শব্দটি ব্যবহার করেননি। অতিমানস কথাটি আমার। অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়েছিল চিত্রকলা বিষয়ক মূল্যায়ন ক্ষমতা। ভাস্কর্য সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল কিন্তু চিত্রকলা সম্পর্কে ছিলাম অজ্ঞ। হঠাৎ আলিপুরে ধ্যান করার মধ্যে কারাকক্ষের দেওয়ালে কয়েকটি চিত্র দেখতে পেলাম। আর আশ্চর্য আমার মধ্যে শিল্পীর দৃষ্টি খুলে গেল এবং আমার চিত্রকলার জ্ঞান পূর্ণ হল। অবশ্য এর মধ্যে প্রযুক্তি গত খুঁটিনাটি বাদ দিতে হবে। একবার শ্রী অরবিন্দের সাধনকালে মনে হয়েছিল যে (অষ্ট) সিদ্ধি যেমন লখিমা আয়ত্ব করা সম্ভব কিনা, হঠাৎ তিনি দেখলেন মাটি থেকে বেশ উঁচুতে তিনি উঠে গেছেন। আর একবার উর্দ্ধ বাহু অবস্থায় ধ্যান করতে করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, কারারক্ষী বাইরে থেকে এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে সংবাদ দেয় যে তিনি মারা গেছেন। আবার একবার এগারদিন উপবাসের মাধ্যমে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন কিরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি তাঁর লাভ হয়। যদিও ১০ পাউন্ড ওজন তাঁর কমে যায়, কিন্তু স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয়নি। তিনি যাহার উপর এক ঘড়া জল তুলতে এই সময় পারতেন যা অন্য সময় পারেননি। গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফলে শ্রীঅরবিন্দ কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন এক সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তি হিসাবে। বাইরের পরিস্থিতিওে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে বন্দেমাতরম পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তিলককে ছয়বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করে সুদূর ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত করা হয়েছিল। সরকার জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী সংগঠনগুলির উপর কঠোর হস্তে দমননীতি প্রয়োগ করে। ধূমায়িত অসন্তোষ তলে তলে সঞ্চিত হচ্ছিল, বিচ্ছিন্ন এখানে ওখানে সন্ত্রাস ও বিক্ষোভ

ব্যতীত অন্য কোন বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছিল না। ৩০ শে মে ১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ উত্তরপাড়ায় তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। কারাগার তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বিষয়ক উদ্ধৃতি যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই ভাষণের অন্তর্গত। প্রায় দশ হাজার শ্রোতা নীরবে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশে উত্তরপাড়ায় তাঁর ভাষণ শোনেন। তাঁর কারাগারের পূর্বের পরিস্থিতি এবং পরবর্তী অবস্থার আলোচনা করে তিনি ভাষণ শুরু করেন। তিনি বলেন, প্রায় এক বছর পূর্বে আমি আপনাদের এখানে এসেছিলাম। আমি তখন একা ছিলাম না। জাতীয়তাবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন আমার পাশে। তিনি এখন আমাদের থেকে অনেক দূরে। হাজার মাইল ব্যবধানে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। আর যাঁরা আমার সঙ্গে কর্মরত ছিলেন অনুপস্থিতি। দেশের উপর দিয়ে যে ঝঞ্ঝা বয়ে গেল তার দরুণ তাঁরা ছড়িয়ে গেলেন দূর দূরান্তে। আমি যখন জেলে যাই সকল দেশবাসী বন্দেমাতরম ধ্বনিতে ছিল সঞ্জীবিত। বুকে ছিল জাতি গঠনের আদর্শ, হতাসা থেকে উজ্জীবিত লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্দীপনা। আমি জেল থেকে বেরিয়ে সেই ধ্বনির জন্য প্রতীক্ষা করলাম। কিন্তু প্রত্যক্ষ করলাম হতাশ নিস্তব্ধতা। দেশের উপর চেপে বসেছে। নিশ্চুপতার বোঝা, দেশের মানুষ যেন বিমূঢ়। ঈশ্বর নির্দিষ্ট ভবিষ্যত উজ্জ্বল স্বর্গের পরিবর্তে যেন হতাশার আকাশ থেকে দেশবাসীর উপর নেমে আসছে বজ্র ও বিদ্যুতের কষাঘাত। দিশাহারা জনগণ চারিদিকে প্রশ্ন করে চলেছে 'আমরা এখন কি করব? কি কাজ আমরা করতে পারি? আমি নিজেও জানি না পথ কোন দিকে। আমি জানিনা পরবর্তী পর্যায় কোথায় শুরু হবে। কিন্তু আমি স্থির নিশ্চয় জানি যে, সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে ধ্বনি, যে আশা উত্থিত হয়েছিল, আজ তাঁরই ইচ্ছায় এই নীরবতা নেমে এসেছে। বাদ প্রতিবাদ ও আন্দোলনের পশ্চাতে যিনি ছিলেন, বিরতি ও নিস্তব্ধতার মধ্যেও তিনি রয়েছেন। এ তাঁরই দান, পিছন ফিরে জাতি পর্যালোচনা করুক এবং জানুক ঈশ্বরের অভিপ্রায়। আমি নিজে এই অবস্থায় হাল ছাড়িনি। কারাগারে এই নীরবতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, বিরতি ও নীরবতার মধ্যেই দীর্ঘ এক বৎসর কাল কারাগারে আমাকে শিক্ষাদান চলেছিল।' কিন্তু হিন্দুধর্ম বলতে আমরা কি বুঝব? কি এই ধর্ম যাকে আমরা সনাতন ও শাশ্বত বলি? এই ধর্মকে বলা হয় হিন্দুধর্ম, কারণ হিন্দুজাতি এই ধর্ম আচরণ করে, কারণ এই ভূখন্ডে এই ধর্ম সমুদ্র ও হিমালয়ের কোলে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ এই পুণ্য প্রাচীন ভূমিখন্ডে আর্য জাতিকে এই ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শুধু একটি মাত্র দেশেই এই ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র গন্ডীর মধ্যে এই ধর্ম আবদ্ধ নয়। যাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলি, আসলে সে হচ্ছে সনাতন ধর্ম। কারণ এ হচ্ছে এক সার্বজনীন ধর্ম সকলে যার অন্তর্ভুক্ত। যে ধর্ম সার্বজনীন নয় তা সনাতন হতে পারে না। সঙ্কীর্ণ, সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ধর্মের স্থায়িত্ব ও উদ্দেশ্য সীমিত হতে বাধ্য। এই সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিষয়ক এক উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী শ্রীঅরবিন্দ করেছিলেন। ১৯১০

সালের জানুয়ারী মাসে তামিল জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক ইন্ডিয়াতে তিনি এক সাক্ষাৎকার দেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, ১৯০৭ সালের পর আমরা এক নতুন যুগ সন্ধিক্ষণে বাস করছি, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যা শুভ ফলদায়ক। শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্ব অভ্যুত্থান ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনসমূহ লক্ষ্য করবে। উচ্চস্থানে আসীন যারা তারা আসবে নেমে, আর যারা পতিত তাদের হবে উত্থান। যারা অত্যাচারিত, নিপীড়িত তাদের উত্থান ঘটবে। মানব সম্প্রদায় ও জাতিসমূহ এক নতুন চেতনায় জাগরিত হবে। নতুন চিন্তা, ধ্যান ধরমা ও প্রয়াস নতুন লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। এই সকল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। এই রচনা শ্রীঅরবিন্দের স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকাশ পায়। আমাদের গ্রন্থে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আবার আসবে। ১৯১০ সালের ২৪ শে জানুয়ারী কলিকাতা হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে প্রকাশ্য দিবালোকে গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট শামস উল আলমকে হত্যা করা হয়। কারাকাহিনীতে শ্রীঅরবিন্দ এই গোয়েন্দা অফিসার সম্পর্কে কৌতুককর নানা উক্তি করেছেন। তার কার্যের প্রকৃতি ও কর্মের অতি নিষ্ঠা তাকে বিপ্লবীদের কাছে লক্ষ্য বস্তু করে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবে তার হত্যাকাণ্ডে সরকারী দমন পীড়ন শুরু হবে এবং রাজনৈতিক পরিবেশ আবার উত্তেজনা মুখর হয়ে ওঠে। কর্মযোগীন কার্যালয়, ৪ নং শ্যামাপুকুর লেনে, শ্যামবাজারে সন্ধ্যার দিকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সম্পাদকীয় কাজকর্মে যেতেন। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সম্ভবত ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ অন্যান্য দিনের ন্যায় সম্পাদকীয় দপ্তরে গেলেন। কয়েক জন তরুণ সহকারীর সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় লিখনের বৈঠকে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন সুরেশ চক্রবর্ত্তী (মনি)। তাঁর স্মৃতিকথা থেকে পরবর্তী ঘটনাবলীর বর্ণনা পাওয়া যাবে। তিনি লিখেছেন, আবহাওয়া হালকা হাসি ঠাট্টায় মসগুল ছিল, এমন সময় কর্মযোগিন এর এক সহকারী রাম মজুমদার আচমকা ঘরে ঢুকে খবর দিলেন যে তিনি বিশ্বস্ত পুলিশ সূত্রে জানতে পেরেছেন যে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্দে পুলিশ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেছে। এক গভীর নিস্তব্ধতায় আমরা সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। শ্রীঅরবিন্দ শান্তস্বরে বললেন, আমাকে চন্দননগর যেতে হবে, তিনি ঘরের বাইরে চলে এলেন, পিছনে রামবাবু ও। আর্য্য কিছু দূরে বীরেনও আমি এইভাবে নীরব এক শোভাযাত্রা শুরু হল। শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগরে ছয় সপ্তাহ ছিলেন। প্রথমে মতিলাল রায়ের বাড়ি, তারপর আরও কয়েকটি বাড়িতে যাতে করে তাঁর অবস্থান পুলিশ বা গুপ্তচরের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। কঠোর গোপনীয়তা ও সতর্কতা এব্যাপারে প্রয়োজন ছিল । তার মতিলাল সাধ্যমত সব ব্যবস্থাই করেছিলেন। বস্তুত চন্দননগরে অবস্থান ব্যাপারে সরকার কোন হদিসই করতে পারেনি অথচ সারাদেশে শ্রী অরবিন্দকে তারা খোঁজ করে বেড়িয়েছে। চন্দননগর অবস্থানকালীন সংগোপনে অবস্থান ও সকল কার্যকলাপ বন্ধ করে গভীর সাধনা ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দ নিজে তাঁর কার্যবিধি সম্পর্কে কিছু জানাননি।

যা কিছু আমরা জেনেছি তা মতিলালের পরবর্তীকালে লিখিত পুস্তক আত্মস্মৃতি থেকে। শ্রী অরবিন্দের পক্ষে এই সময় ছিল গভীর সাধনার পর্যায়। যখন কথাবার্তা বলতেন মনে হত তাঁর মধ্য দিয়ে অন্য কেউ কথা বলছে। তাঁর সামনে খাদ্য দিলে যান্ত্রিকভাবে তা তিনি গ্রহণ করতেন। তখনও তিনি ধ্যানস্থ থাকতেন। আহার করতেনও স্বল্পই। তিনি ধ্যান করতেন চোখ খোলা অবস্থায় এবং ধ্যানে নানা সূক্ষ্ম দৃশ্য ও মূর্তি এসে উপস্থিত হত। তিন দেবী মূর্তির উদয় হত, যাঁদের তিনি বৈদিক দেবী ইলা, মহি (ভারতী) এবং সরস্বতী বলে চিনতে পেরেছিলেন। মতিলাল নিজেও যোগের প্রতি আকৃষ্ঠ হন। শ্রীঅরবিন্দ তাকে পথ নির্দেশ ও উপদেশ দেন, ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ কর। কলকাতার এত কাছে চন্দননগরে থাকা শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। অন্য কোথায় যাওয়ার নানা পরিকল্পনা চলছিল। এমন সময় শ্রীঅরবিন্দ শুনতে পেলেন সেই আদেশ। পন্ডিচেরী যাও। শ্রীঅরবিন্দ দ্বিধাহীন চিত্তে সেই আদেশ গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান তাঁর আশ্রিতকে এইভাবেই চালনা করেন ও সুরক্ষা দেন। গীতার ভাষায় মামেকং শরণং ব্রজ। শ্রীঅরবিন্দের প্রস্তাবিত কলকাতা থেকে পন্ডিচেরী যাওয়ার সব ব্যবস্থাই করা হল। চাঁদপাল ঘাট থেকে পয়লা এপ্রিল প্রত্যুষে S.S Dupleix জাহাজ ছাড়বে। পুলিশের চোখ এড়িয়ে কীভাবে শ্রীঅরবিন্দকে চন্দননগর থেকে কলকাতায় আনা যায় সুকুমার তার আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। তিনি প্রয়োজনীয় সতর্কতার জন্য স্থির করলেন, যাতে নৌকার মাঝিরাও শ্রীঅরবিন্দের গন্তব না জানতে পারে, তাঁকে সরাসরি চন্দননগর থেকে কলকাতায় আনা হবে না। চন্দননগর শহর হচ্ছে গঙ্গার পশ্চিম তীরে। আর কলকাতা ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে গঙ্গার অপর পাড়ে, পূর্বদিকে অবস্থিত। সুকুমার ঠিক করলেন, চন্দননগর ও কলকাতার মাঝামাঝি গঙ্গার পূর্ব দিকে। আগরপাড়া হবে শ্রীঅরবিন্দের যাত্রাপথের প্রথম গন্তব্য। আর অমর চ্যাটার্জী গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে উত্তরপাড়া থেকে নৌকা করে আগরপাড়া এসে শ্রীঅরবিন্দকে নৌকায় তুলে নেবেন। তাঁরা অবশ্য তৎক্ষণাৎ আগরপাড়া থেকে কলকাতা রওনা দেবেন না। তাঁরা আবার গঙ্গা পার হয়ে উত্তরপাড়ার আরো দক্ষিণে আরেক ঘাটে অপেক্ষা করবেন। অপরদিকে নগেন, সুরেন ও বিজয় নাগ কলকাতা থেকে একটা নৌকা ভাড়া করে ঐ পূর্বনির্ধারিত ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। আরো ঠিক হয়েছিল যদি বিলম্ব দেখেন,অমরের নৌকা ঘাটে অপেক্ষা না করে মাঝগঙ্গা দিয়ে চলতে শুরু করবে। দুদলের নৌকায় একই ধরনের পতাকা পরিচয়ের সুবিধার জন্য থাকবে। নৌকা দুটি মুখোমুখি হলে নগেনের নৌকা শ্রীঅরবিন্দকে তুলে নিয়ে চাঁদপাল ঘাটে সরাসরি জাহাজে পৌঁছে দেবে। শ্রীঅরবিন্দ ও বিজয় জেটির পরিবর্তে জাহাদের দড়ির মই দিয়ে উঠবেন ঠিক ছিল। তাঁদের মালপত্র নির্দিষ্ট কেবিনে সময়মত পৌঁছে দেওয়া হবে এবং জাহাজের ক্যাপ্টেনের অনুমতিও সেইমত নেওয়া হবে। এই পরিকল্পনা ছিল বেশ বিশদ বিস্তারিত ও দক্ষতার সঙ্গে তৈরি। সুকমার পথের নানা

রকম ঘুরপাক করে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ যে নদীবক্ষ থেকে সরাসরি জাহাজে উঠবেন, এটা ভাল পরিকল্পনা হয়েছিল। নচেৎ জেটি থেকে জাহাজে উঠতে গেলে পথে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টির সামনে পড়তে হত Dupleix। জাহাজ ছাড়ার আগের দিন ৩১ শে মার্চ সকালে মতিলাল রায় চন্দননগরের বুড়াইচণ্ডীতলা ঘাটে শ্রীঅরবিন্দকে বিদায় জানালেন। নিজে সঙ্গে না গিয়ে মতিলাল শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দুজন বিশ্বস্ত অনুচর দিলেন। পূর্বনির্ধারিত মত নৌকা ভাটিতে গঙ্গা অতিক্রম করে পূর্বতীরে আগরপাড়া এসে পৌঁছাল। ইতিমধ্যে অমর চ্যাটার্জী নৌকা ভাড়া করে বিশ্বস্ত অনুচর মন্মথ বিশ্বাস সহ আগরপাড়া রওনা দিলেন। এই যাত্রায় কোন অসুবিধার সম্মুখীন তারা হয়নি। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তারা আগরপাড়ায় মিলিত হলেন। আমরা এখন এই নাটকের অংশীদার কি করছেন দেখি। ৩১ শে মার্চের সেই সকালে সুকুমার নগেনকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে পাঠালেন। সুকমারের স্মৃতি কথায় বলি আমি নগেন্দ্রকে বললাম জাহাজের ক্যাপটেনকে টিকিট দেখিয়ে শ্রীঅরবিন্দের স্টীল ট্রাঙ্ক দুটো তাঁদের কেবিনে রেখে আসতে। নগেন্দ্র ট্রাঙ্ক দুটো রেখে এসে আমাকে খবর দিল। আমি সুরেন চক্রবর্তীকে ডেকে অতঃপর নৌকা ভাড়া করে গঙ্গার উত্তর দিকে যেতে নির্দেশ দিই। আমি একটি পতাকা তাকে দিয়ে নৌকার মাস্তুলে ওড়াতে বললাম। তাকে আরো বলা হল এমনি আরেকটি পতাকা উড়িয়ে আসা নৌকার সঙ্গে তাদের আগরপাড়ার বিপরীত দিকে গঙ্গাবক্ষে দেখা হবে। সেই নৌকার আরোহীদের নিজের নৌকায় তুলে নিয়ে চাঁদপাল ঘাটে নোঙর ফেলে থাকা Dupleix জাহাজে উঠিয়ে দিতে হবে। সুরেন কোন প্রশ্ন বা অনুসন্ধিৎসা প্রদর্শন না করে উপদেশ মত তার কাজ করতে প্রস্তুত হতে থাকল। জাহাজের কেবিনে ট্রাঙ্ক রেখে আসার পর নগেনকে সুকুমার বললেন যে, সুরেনের সঙ্গে গিয়ে তাদের নৌকায় আরেকটি নৌকা থেকে দুই ব্যক্তিকে নামিয়ে কলম্বোগামী জাহাজে তুলে দিতে হবে। নগেন এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন, সুকুমার দাকে আমি বললাম, এই দুই ব্যক্তিকে আমি চিনব কি করে? তিনি বললেন, সুরেনকে সব বুঝিয়ে বলা আছে। সুকুমারদার কথা শুনে হঠাৎই আমার মাথায় এক চিন্তার উদয় হল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যাত্রীদের মধ্যে আপনার আরোদা নেই তো? একটি বিস্মিত হয়ে সহাস্যে তিনি বললেন, দেখছি তুমি বেশ চালাক হয়ে উঠেছ। কি করে আন্দাজ করলে? আমি বললাম, এমনিই মনে হল। তিনি আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, দেখ অন্য কেউ যেন না জানতে পারে। দুপুর নাগাদ নগেন্দ্র ও সুরেন নৌকা করে গঙ্গাবক্ষে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য যে নৌকায় শ্রীঅরবিন্দ অমর ও মন্মথ অআসছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করার। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎ যা ঘটে গেল তাকে ভাগ্য বা কোন অদৃশ্য হস্তের হস্তক্ষেপ ছাড়া কি বলব? নৌকাদুটির গঙ্গাবক্ষে বা নির্দিষ্ট ঘাটে দেখা হল না। সম্ভবত নগেন ও সুরেনের নৌকা দেরীতে ছেড়েছিল অথবা গঙ্গায় নৌকা দুটি পরস্পরের

নিদর্শন চিহ্ন চিনতে ভুল করেছিল। আসল কারণ যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হল। Dupleix জাহাজে করে পন্ডিচেরী যাওয়ার পরিকল্পনা অমরের জানা ছিল না। তার কাছে জাহাজের টিকিটও ছিল না। প্রয়োজনীয় নির্দেশ সহ টিকিট ছিল নগেনের কাছে। কিন্তু দুই দলের দেখা বা সংযোগ ঘটল না। এত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবস্থাদি গ্রহণ বুঝি ব্যর্থ হতে চলল। পন্ডিচেরী প্রস্থানের পর শ্রীঅরবিন্দ সকলপ্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও সম্পর্কে ছিন্ন করেন। প্রথমত ব্রিটিশ শাসনে জাতির মধ্যে যে জড় ও দাস সুলভ মানসিকতা পুষ্ট হয়েছিল, তা থেকে মুক্তি। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং বন্দেমাতরম এ প্রকাশিত উদ্দীপনাময়ী রচনাবলী জাতির উপর এক প্রগাঢ় প্রভাব ফেলেছিল এবং আগেই বলা হয়েছে, শ্রীঅরবিন্দই প্রথম ব্যক্তি যিনি খোলাখুলি স্পষ্ট ভাষায় ভারতের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি করেন। দ্বিতীয়ত রাজনীতিকে তিনি আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত করেন। জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে ঈশ্বরকে স্থাপন করেন নেতা, প্রথপ্রদর্শক শক্তি ও সামর্থের নিয়ামক রূপে, দেশকে তিনি কোন রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক সংস্থানরূপে কল্পনা করেননি। তাঁর কাছে দেশ ছিল দিব্য জননী- যে ভাবনায় তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করে গেছেন। পরিশেষে, শ্রীঅরবিন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা অসহযোগিতা তত্ব ও প্রয়োগ কৌশল দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপরেখা রচনা করেছিলেন। তাঁর ভাবধারা ও কর্মপ্রণালী সমসাময়িক লোকে সঠিক হৃদয়ঙ্গম না করলেও পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর প্রভাব ফেলেছিল (অনেক সময় অজ্ঞাতসারেই) যথা অসহযোগ আন্দোলন,যার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী এবং অন্তিমে সাফল্যমন্ডিত। শ্রীঅরবিন্দের হঠাৎ করে পন্ডিচেরী চলে যাওয়া এবং রাজনীতির সহিত সংশ্রব বর্জন এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে যে ভাবে তিনি কিছুকালর আগেও ঘটনাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইংরেজ সরকার বিশ্বাস করেনি যে শ্রী অরবিন্দ রাজনীতি ত্যাগ করেছেন বরঞ্চ তাদের সন্দেহ ছিল শ্রী অরবিন্দ গোপনে বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রস্তুতিতে রত। আর যারা দৈনন্দিন রাজনীতিতে আসক্ত তাদের মতে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি বর্জন রীতিমতো নিন্দনীয়। ভারত ও বিশ্বের নিকট তিনি বিস্মৃত। শুধুমাত্র নিজের মুক্তির জন্য লালায়িত, পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন পুরুষ। আজ অবধি অনেকের মনে সংশয় রয়েছে। কেন তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের নিজের বক্তব্যে কোন সংশয়ের অবকাশ অবশ্য ছিল না। এই বিষয়ে এক শিষ্যকে তিনি লিখেছিলেন, আমি রাজনীতি থেকে এই জন্য সরে আসিনি যে সেখানে আমার কিছু করার ছিল না। এই ধারণা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। আমি চলে এসেছি যাতে আমার যোগসাধনায় কোন বিঘ্ন না ঘটে। আর এই ব্যাপারে আদেশও পেয়েছিলাম সুনির্দিষ্ট। আমি রাজনীতির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করেছি সত্য, কিন্তু আমি জানতাম যে, যে কাজ আমি আরম্ভ করেছিলাম আমার প্রদর্শিত পথে

অন্যরা তা চালিয়ে যাবে আমার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও যতদিন না অন্তিম সাফল্য আসে। আমার রাজনীতি থেকে সরে আসার পেছনে কোন হতাশা বা ব্যর্থ মনোভাব দায়ী নয়। শ্রী নিবাসাচারী পন্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আসছেন জানতে পেরে শুধু যে বিস্মিত হয়েছিলেন তাই নয়, কথাটা বিশ্বাসও করেননি। পন্ডিচেরীর ন্যায় বৈশিষ্ট্যহীন স্থানের পক্ষে এইরূপ প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক। সুরেশের প্রতিক্রিয়া এব্যাপারে তার স্মৃতিকথার সূত্র ধরে লক্ষ্য করা যাক, আমি সৌন্দর্যপ্রিয় ফরাসী জাতি ও তার সুন্দর রাজধানী প্যারিসের কথা শুনেছিলাম। (সেই তুলনায়) পন্ডিচেরী ছিল অতি সাধারণ এক শহর, তার বাড়িঘর দুয়ারও অতি নগন্য। নলিনীকান্ত তাঁর স্মৃতিকথায় আরো কঠিন শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন। জায়গাটা এতই নির্জন ছিল যে আমরা আজকাল কল্পনায়ও আনতে পারব না। নির্জনই বা বলি কেন, বলা যায় মৃত, যেন এক মৃতের নগরী। শুনে আশ্চর্য হইনি যখন লোকে বলত শ্রীঅরবিন্দ আপন সাধনার জন্য শ্মশান ভূমিতে নলিনীকান্ত আরো বলেছেন, ভূতপ্রেতের অভাব ছিল না। এই সব গুন্ডা বদমায়েসদের, ফরাসিতে যাদের বান্দেস বলত, ছিল অবাধ রাজত্ব,যাদের মদত দিত দুর্নীতিপ্রিয় রাজনীতিবিদ এবং সরকারী কর্মচারীরা বিশেষ করে রাজনৈতিক নির্বাচন কালে। এইসব দেখে মনে হতে পারে বসবাসের পক্ষে পন্ডিচেরী এমন কিছু অনুকূল স্থান ছিল না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের আগমনের পশ্চাতে এই সকল সুবিধা অসুবিধা আদৌ বিবেচিত হয়নি- তিনি আদিষ্ট হয়ে এখানে আসেন। কোন প্রশ্ন বা সংশয়ের সেখানে স্থান ছিল না। অন্তরের এই আদেশই তাঁকে পন্ডিচেরী নিয়ে এসেছিল। প্রথমে হয়ত তিনি এখানে দীর্ঘকাল থাকতে চাননি। ক্রমে সাধনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধন পীঠস্থান পন্ডিচেরীর সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে, তাঁর অচঞ্চল সিদ্ধিস্থল হিসাবে। তিনি নিরবচ্ছিন্ন চল্লিশ বৎসর কাল এখানে অতিবাহিত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন ইংরাজ সরকারের হস্তক্ষেপের বাইরে এক নিরাপদ আশ্রয়, যেখানে নিরুপদ্রবে তিনি সাধনা করতে পারেন। কার্যত যা হয়েছিল, নলিনীকান্তের ভাষায়, শ্রীঅরবিন্দই পন্ডিচেরীকে আশ্রয় দিলেন নিজের চেতনালোকে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বাইরের থেকে কোন বস্তুর সঠিক বিচার সম্ভব নয়। পন্ডিচেরীর সাম্প্রতিক অতীত সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, পন্ডিচেরীর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন ছিল। একসময় বেদপুরী নামে খ্যাত এই জনপদ বৈদিক শাস্ত্রাধ্যয়নের এক মহান কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হত। কথিত আছে ঋষি অগস্ত্য একদা দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন বৈদিক আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষাদান উদ্দেশ্য। এই পন্ডিচেরীতেই বৈদিক শিক্ষার এক কেন্দ্র তিনি স্থাপন করেন। মহান ঋষি অগস্ত্য ছিলেন এই জনপদের আধ্যাত্মিক রক্ষক। এই ঘটনার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রেও। তিনি উত্তর থেকে দক্ষিণে এই পন্ডিচেরীতে ক্ষেত্রেও। তিনি উত্তর থেকে দক্ষিণে এই পন্ডিচেরীতে পদার্পণ করেন। পৃথিবীকে বেদের এক নতুন ভাষ্য শোনান যার মধ্যে নিহিত রয়েছে

বীজাকারে ভবিষ্যতের আধ্যাত্মিক জ্ঞানভান্ডার। এই দুই ঘটনার মিল কি নিছক কাকতালীয় না, আমাদের অজ্ঞাত এমন গূঢ় শক্তিসমূহ রয়েছে যারা দৃশ্যপটের পশ্চাতে ঘটনাবলী বা সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রক? জাহাজ থেকে শ্রীঅরবিন্দকে যে গৃহে নিয়ে যাওয়া হয় সেটা ছিল কালভে শঙ্কর চেট্টিয়ার নামে পন্ডিচেরীর এক বিশিষ্ট ও বিত্তশালী ভদ্রলোকের। তিনি বদান্যতা সহকারে শ্রীঅরবিনকে ঐ গৃহে থাকতে দেন। কয়েক বছর আগে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা কালে স্বামী বিবেকানন্দ ঐ গৃহে অবস্থান করেন। শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে বাসস্থানটি ছিল উপযুক্ত। তিনি বাড়িটির সর্বোচ্চতলে যে ঘরে থাকতেন সে ঘরটি ছিল ছাদের পিছর দিকে, সদর রাস্তা থেকে অদৃশ্য এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির বাইরে। প্রথম দিকে শ্রীঅরবিন্দ কড়া সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। বিজয় ও সুরেশকে প্রবেশদ্বার সর্বদা পাহারা দিতে বলা হয়েছিল এবং ভাল করে যাচাই না করে কোন আগন্তুকের প্রবেশ সেখানে ছিল নিষিদ্ধ। এই দুই ভক্ত এমনি নিষ্ঠাবান যে প্রথম তিনমাস এরা বাড়ির বাইরে একপাও রাখেননি। সতর্কতার কারণ ছিল। ইংরাজ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করতে বিফল হয়ে ছিল সত্য কিন্তু তারা চুপচাপ পরাজয় মেনে নেবে এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না। বস্তুত ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি থেকে সরকার শ্রীঅরবিন্দের খোজ খবর হারিয়ে ফেলেছিল। তিনি কোথায় থাকতে পারেন সে বিষয়ে জল্পনা কল্পনার অবধি ছিল না। চন্দননগরে আত্মগোপনকালীন শ্রীঅরবিন্দের একটি ক্ষুদ্রপত্র ঘটনাকে আরও বিভ্রান্তিকর করেছিল। পন্ডিচেরী যাত্রার কয়েকদিন আগে ২৬ শে মার্চ কর্মযোগিন পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। আমরা স্থানীয় সংবাদসূত্রে জেনে আশ্চর্য হচ্ছি যে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা থেকে অন্তর্ধান করেছেন এবং বর্তমানে তিব্বতে সাধু সন্তদের সান্নিধ্যে শাস্ত্রালোচনায় রত আছেন। আমরা নিজেরাই এই রহস্যজনক অন্তর্ধানের সংবাদ জানি না। বস্তুত তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন, যদি তিনি কুটুমী বা অন্য ঋষি প্রবরের সঙ্গে নাক্ষত্রিক কার্যে লিপ্ত থাকেন তবু তাঁর সত্তার অপর কোষের নিকট সে সংবাদ অজ্ঞাতই থাকবে। তাঁর সাধনার জন্য চাই অখন্ড নীরবতা ও কোহাহলশূন্য পরিবেশ। সেই কারণে তাঁর ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। সরকার যে এই সংবাদে খুব প্রীত হয়েছিল তা বলা চলে না। অবশেষে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকার আইনের সাহায্য নিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমাদের মনে আছে ১৯০৯ সালে জুলাই এবং ডিসেম্বর মাসে কর্মযোগিন এ শ্রীঅরবিন্দের দুটি খোলা চিঠি প্রকাশিত হয়।

আইনগত পরামর্শের পর সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দ্বিতীয় পত্র আমার দেশবাসীর প্রতি রাজদ্রোহাত্মক ছিল। ১৯০৭ সালে বন্দেমাতরম এ প্রকাশিত রচনাবলীর জন্য শ্রীঅরবিন্দকে সাজা দেওয়া যায়নি। কারণ অভিযোগকারী আপত্তিজনক লেখাগুলি যে শ্রীঅরবিন্দের রচনা তা

সরকার প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে সে বালাই ছিল না।কারণ খোলা চিঠিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের স্বাক্ষরিত। সাফল্যের ব্যাপারে এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে সরকার শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করল এবং ৪ঠা এপ্রিল আমার দেশবাসীর প্রতির লেখক শ্রীঅরবিন্দও কর্মযোগিন এর মুদ্রক ও প্রকাশক মনমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হল। ঘটনাবলীর কি আশ্চর্য সমাপতন! ৪ঠা এপ্রিলই শ্রীঅরবিন্দ পন্ডিচেরীতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের সীমানা পেরিয়ে নিরাপদে এসে পৌঁছালেন। শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তারি পরোয়ানার কথা পরে জানতে পেরেছিলেন কিন্তু সে সতর্কতার ব্যবস্থা তিনি নিয়েছিলেনতার কারণ তিনি ভালভাবেই সরকারের মনোভাবের সাথে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য পন্ডিচেরীতে ফরাসি সরকারের অনুমতি ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তারের কোন অধিকার ভারত সরকারের ছিল না। এই রকম অনুমতি পাওয়া কোন সম্ভাবনা সাধারণত ছিল না। পন্ডিচেরী সরকার নিজেদের অধিকার ভারত সরকারের ছিল না। পন্ডিচেরী সরকার নিজেদের অধিকার সম্পর্কে বিশেষপ্রকার সদাসতর্ক ছিলেন এবং রাজনৈতিক আশ্রয়দান সম্মানজনক ব্যাপার বলে গণ্য করতেন। ইংরাজ প্রভুত্ব তৎকালে প্রচন্ড শক্তিশালী এবং ফরাসি দেশের সঙ্গে ইংল্যান্ডের মৈত্রী চুক্তি ছিল। এছাড়া ফরাসী সরকারের অনুমতি ক্রমে তাদের একদল গুপ্তচর পন্ডিচেরীতে অবস্থান করত। তাদের কাজ ছিল প্রচুর পয়সা দিয়ে স্থানীয় গুপ্তচর নিয়োগ করা আর পলাতক রাজনৈতিক ব্যক্তিদের খোঁজ খবর করা। বাস্তবিক পক্ষে ভারত সরকার অচিরেই পন্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আগমন জানতে পারে। ৯ই এপ্রিল, মাদ্রাজের এক গোয়েন্দা পন্ডিচেরী সূত্রে অবগত হয়ে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানায় যে, যে ব্যক্তির তল্লাস তাঁরা করছেন সেই ব্যক্তি জাহাজে পন্ডিচেরীতে পৌঁছায় এবং শ্রীনিবাসাচারী তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। তাঁদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেতে কয়েকদিন দেরী হবে। অতঃপর শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সহকর্মী বৃন্দের উপর সদাসতর্ক গোয়েন্দা নজরদারী চালু হল, যাতে ভারত বর্ষের সব চাইতে বিপজ্জনক ব্যক্তিটি পালিয়ে যেতে না সক্ষম হয়। এইভাবে সর্বপ্রকারে তাদের চেষ্টা ছিল শ্রীঅরবিন্দকে বিরক্ত করা। আর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী থাকায় শ্রীঅরবিন্দ ব্রিটিশ সীমানায় পা দিলেই গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা ছিল। অন্য একটি কারণেও সুরেশ ও বিজয় সতর্কতা অবলম্বন করেছিল যাতে শ্রীঅরবিন্দকে কেউ কোনওভাবে বিরক্ত না করে। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা এই সময়ে এক চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। তিনি তাঁর নিজের ঘর থেকে কদাচ বেরোতেন এবং খুব প্রয়োজন ছাড়া কোন দর্শনার্থীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। সুরেশ ও বিজয় ব্যতীত, মাত্র অন্য দুই ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎকারের কোন বাধা ছিল না। এরা ছিলেন শ্রীনিবাসচারী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুব্রহ্মানিয়ম ভারতী। ভারতীর বয়স মাত্র ২৮, সমসাময়িক বিখ্যাত তামিল কবি হিসাবে তখনও তিনি পরিচিত হননি। কিন্তু তাঁর কবি খ্যাতি, দেশাত্মবোধক কবিতাসমূহ এবং সরকারের নির্ভিক সমালোচনা, তাঁকে বহুল

পরিচিতি এনে দিয়েছিল। তাঁর উত্তেজক রচনাবলীর জন্য তাঁকে মাদ্রাজ ত্যাগ করতে হয়। তিনি পন্ডিচেরীতে আশ্রয় নিলেন এবং ইন্ডিয়া পত্রিকা প্রকাশনায় শ্রীনিবাসচারীকে সাহায্য করতে লাগলেন। তৎকালীন অন্যান্য সংবেদনশীল যুবকবৃন্দের ন্যায় ভারতী বন্দেমাতরম্ এ প্রকাশিত লেখাগুলি দ্বারা প্রভুত পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন স্বভাবতই শ্রীঅরবিন্দকে সাক্ষাত দেখার সুযোগ পেয়ে তিনি উল্লসিত হলেন। প্রথম থেকেই শ্রীঅরবিন্দের নিকট তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টার পর শ্রীনিবাসাচারীর সঙ্গে এসে দেখা করতেন। শ্রীঅরবিন্দও তাঁদের সঙ্গে খোলামনে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন, গল্প হাস্যরসাত্মক কাহিনী প্রভৃতি আদানপ্রদান চলত। কোন ক্রমেই সেই পরিবেশে গুরুতর বিষয়ে মেঘ এসে জমা হত না। লুব্ধ আগ্রহে ভারতী শ্রীঅরবিন্দের কথোপকথন শুনতেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ভারতী সেই সময়ের কোন দিনলিপি বা শ্রীঅরবিন্দের কোন চরিত্রাঙ্কন রেখে যাননি। অন্যথায় ভারতীর ন্যায় সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক মূল্যবান দলিল রেখে যেতে সক্ষম হতেন। শঙ্কর চেট্টিয়ারের বাড়িতে প্রথম দিকে থাকাকালীন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এক বিদগ্ধ ফরাসি বুদ্ধিজীবী এম পল রিশারের দেখা হয়। রিশার পন্ডিচেরীতে তাঁর এক বন্ধুর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে এসেছিলেন। পন্ডিচেরীর এক বিশিষ্ট নাগরিক জির নাইডুর মাধ্যমে রিশার এবং শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎকার রিশারকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কয়েক বছর পর তিনি জাপানে যান এবং এক শ্রোতৃমণ্ডলীর উপস্থিতিতে বলেন, সময় আসছে মহৎ বস্তুসমূহ, মহৎ ঘটনাবলী, মহত্তর ব্যক্তিবৃন্দ এবং মহোত্তম দিব্য পুরুষগণের আবির্ভাব এই এশিয়া ভূখণ্ডে আসন্ন। সারা জীবন আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই উদ্দেশ্যে অন্বেষণরত। আমি অনুভব করতাম এই সকল মহাপুরুষ বৃন্দ নিশ্চয়ই পৃথিবীর কোন না কোন প্রান্তে আছেন। কারণ তাঁরা যদি না থাকতেন তবে পৃথিবীর অস্তিত্ব লুপ্ত হত। এই সকল মহাপুরুষরাই পৃথিবীর প্রাণসম্পদ ও জ্যোতিস্বরূপ। এই এশিয়া ভূখণ্ডে আমি এমনি একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি। যিনি আগামীকালের পথপ্রদর্শক ও গুরু। তিনি একজন ভারতবাসী হিন্দু। তাঁর নাম অরবিন্দ ঘোষ। রিশারের পন্ডিচেরী আগমন ও শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎতার ছিল গভীর অর্থবহ। এই সূত্রে তাঁর স্ত্রী মীরার সহিত শ্রীঅরবিন্দের যোগাযোগ ঘটে এবং চার বছর পরে তাঁর পন্ডিচেরী আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। পরবর্তীকালে রিশারের আগমন উপলক্ষে মীরা বলেন, ১৯১০ সালে আমার স্বামী একাকী পন্ডিচেরী আসেন এবং এক বিশেষ আকর্ষণীয় পরিস্থিতিতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর থেকে আমরা দুজনেই ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চেয়েছি, যে ভারতবর্ষকে সর্বদা আমার মাতৃভূমি বলে মনে হত। ১৯১৪ সালে এই সৌভাগ্য আমাদের দুজনের জীবনে ঘটল। শ্রীঅরবিন্দকে দেখা মাত্র আমার মনে হল এতদিন এই ব্যক্তিকেই তো আমি কৃষ্ণ বলে জেনে এসেছি। আর একথা বললে যথেষ্ট হবে যে, আমি

স্থির করে ফেললাম তাঁর পাশেই আমার স্থান, আমার কর্মধারা এই ভারতেই। এই ব্যাপার কেমন অবিশ্বাস্য বা বিস্ময়কর যে গূঢ় অধ্যাত্মলোকে শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ মীরা পেয়েছিলেন পন্ডিচেরী আসার বহুপূর্বে। বিস্ময়কর নিশ্চিতরূপেই, তবে অবিশ্বাস্য নয়। আমি এমন এক উদাহরণ দিতে পারি যেখানে অধ্যাত্ম- জগতে যোগী পুরুষেরা স্থান ও কালের উর্দ্ধে বিচরণ করেন এবং ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে বলতে পারেন। ধনী জমিদার কে ভি রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার এই রকম এক ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। রঙ্গস্বামী নিয়মিত শঙ্কর চেট্টিয়ারের বাড়ি যেতেন এবং শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং ছিলেন এই ঘটনার সাক্ষ্য। আয়েঙ্গার পরিবার প্রসিদ্ধ দক্ষিণ ভারতীয় যোগী নাগাই জাপটার ভক্ত ছিলেন। তাঁর দেহান্তকালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় অতঃপর কে তাঁদের আধ্যাত্ম জগতে গুরু হবেন। তিনি বলেন, এক মহাযোগী উত্তরাপথ থেকে দক্ষিণে আসবেন এবং আয়েঙ্গার যেন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কি করে আয়েঙ্গার এই মহান যোগীকে চিনবেন প্রশ্ন করাতে তিনি বলেন, এই উত্তরযোগী দক্ষিণে আসবেন তাঁর যোগ সাধনার সুবিধার্থে আর তাঁর তিনটি বাণীর জন্য তিনি সকলের নিকট পরিচিত হবেন। বহুকাল পরে শঙ্কর চেট্টিয়ারের বাসগৃহে আয়েঙ্গার শ্রী অরবিন্দকে দর্শন করে চমৎকৃত হলেন এবং তাঁর গুরু বর্ণিত উত্তরযোগী বলে শ্রীঅরবিন্দকে চিনতেও পারলেন। এই সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ স্বয় লিখে গেছেন, 'উত্তরযোগী এই নাম আমাকে দেওয়া হয়েছিল। বহুপূর্বে এক প্রসিদ্ধ তামিল যোগী ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে ত্রিশ বছর পরে আমি যে সময় এসেছি তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে উত্তর ভারত থেকে এক যোগী আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে দক্ষিণে আসবেন এবং পূর্বযোগের সাধনায় ব্রতী হবেন। ভারতবর্ষ যে অচিরেই স্বাধীনতা লাভ করবে এটা তার একটা ইঙ্গিত। তিনি আরও তিনটি স্মারকচিহ্নের কথা বলেছিলেন- যার দ্বারা এই যোগীকে চেনা যাবে এবং আমার স্ত্রীকে (মৃণালিনী) লেখা পত্রে এ সকল বিষয় জানতে পারবে। শঙ্কর চেট্টিয়ারের বাড়িতে থাকাকালীন শ্রীঅরিবিন্দ স্ব-চালিত লেখন ব্যাপারে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেন, যা তিনি বরোদা ও কলকাতায় মাঝে মাঝে করতেন। তিনি প্ল্যানচেটের সাহায্য নিতেন না। একটা কলম হালকাভাবে ধরে বসতেন, এবং তাঁর নিজের কথায় বলি, এক বিদেহী আত্মা আমার হাত ও কলমের মাধ্যমে তার ইচ্ছামত লিখে চলত। চেট্টিয়ারের বাড়ির আসরে এইভাবে সম্পূর্ণ একখানি পুস্তক যৌগিক সাধনা লেখা হয়েছিল। পুস্তকটি নয় খন্ডে বিভক্ত এবং যোগসাধনা সম্পর্কিত উপদেশ ও নির্দেশ সম্বলিত। রঙ্গস্বামী মুগ্ধ হয়ে বইখানি ছাপানোর সব ব্যয় বহন করেন এবং লেখকের নাম দেন উত্তরযোগী। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য সর্বদা বলতেন বইটি তাঁর নিজের লেখা নয়। এবং পুস্তকের মতামতের জন্য তাঁর কোন দায়িত্ব নেই। যদিও বইখানির অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এর পুনর্মুদ্রনে অসম্মতি জানান। অবশেষে ১৯২৭ সালে বইখানির প্রকাশনা বন্ধ করা হয়। স্বচালিত লেখার ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দের মত হচ্ছে, সচরাচর এই

সব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যক ঘটনার পশ্চাতে অন্য জগতের বিদেহিরা হস্তক্ষেপ করে। সব সময় যে উচ্চমানের এমন কিছু নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এই সব লেখা অবচেতন মনের ভাবনাচিন্তা নাটকীয় রূপ দিতে চেষ্টা করে, মগ্ন-চৈতন্যের কোন মধুর তন্ত্রীতে আঘাত করে- আর ভূত,ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের নানা ঘটনার বর্ণনা দেয়। এ ছাড়া এইসব লেখার কোন বিশেষ মূল্য নেই। কি অপূর্ব নিস্পৃহতা ও বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্তে শ্রীঅরবিন্দ উপনীত হয়েছিলেন, যেন এক বৈজ্ঞানিক। তাঁর গবেষণাগারে পরীক্ষা-নীরিক্ষার উপর সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন। আলিপুর জেলে একবার দশদিন তিনি উপবাসে থাকেন। এবার তিনি কুড়িদিন উপবাস করবেন স্থির করেন। শ্রীঅরবিন্দের এই উপবাস সম্পর্কে উল্লেখ করে এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে সম্পূর্ণ ভাবে আহার ত্যাগ করা সম্ভব কিনা। তিনি বলেছিলেন, আমি যেবার চেট্রিয়ার গৃহে ২৩ দিন উপবাস করি। প্রায় এই সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিলেন। আমি নিয়মিত আট ঘন্টা চলাফেরা করতাম। আমার চিন্তা ও সাধনা ঠিকই চলছিল। ২৩ দিনের মাথায় আমি একটুও দূর্বল হয়ে পড়িনি। কিন্তু আমার ওজন কমে গেছিল এবং এর প্রতিকারের উপায় খুজে পাইনি। সচরাচর অন্য ব্যক্তিদের ন্যায় স্বল্পাহার দিয়ে উপবাসও ভঙ্গ করিনি। আগে যে পরিমাণ খেতাম তা দিয়ে শুরু করি। আরেকবার বলেন যে, ঐ প্রকার উপবাস সম্ভব। কারণ তখন মানুষ পার্থিব বস্তুনিচয়ের পরিবর্তে প্রাণের স্তরে শক্তি আহরণ করতে পারে। আমরা লক্ষ্য করেছি, উপবাস কালেও শ্রীঅরবিন্দ আট ঘন্টা হাটাচলা করতেন। বস্তুত এই পদচারণা তিনি বরোদায় শুরু করেন এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে তাঁর যোগের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এই পদচারণার জন্য তিনি কদাচ বাইরে যেতেন, ঘরের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি হেঁটে যেতেন। ফলে যে সব বাড়িতে তিনি থাকতেন তার একটিতে ঘরের মেঝে তাঁর পদচারণায় ক্ষয়ে গিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটি পদরেখা তৈরী করেছিল। তিনি বলেছেন, এই পদসঞ্চারণ কালে সর্বোচ্চ শক্তি তিনি নামিয়ে আনতেন। শ্রীঅরবিন্দ শঙ্কর চেট্রিয়ারের বাড়িতে অতিথি হিসাবে বাস করছিলেন। কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য এই ব্যবস্থা চলতে পারে না। ১৯১০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি শহরের দক্ষিণ প্রান্তে এ এক ভাড়া বাড়িতে উঠে গেলেন। বাড়িটি ছিল ছোট, সুন্দর চেট্রি নামে এক ব্যক্তি ছিলেন গৃহস্বামী। বাড়ি বদলানোর কিছুকাল আগে সেপ্টেম্বর মাসে মৃণালিনীর খুড়তুতো ভাই সৌরিন বসু কলকাতা থেকে এসে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগ দিলেন। নলিনীকান্ত গুপ্ত এলেন নভেম্বর মাসে। বিজয়, সুরেশ, সৌরিন ও নলিনী এই চার তরুণ এখন শ্রীঅরবিন্দের সহচর। তাদের নতুন বাসস্থানে পাঁচজনের স্থান সঙ্কুলানের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। এরপর বেশ কয়েক বছর ধরে চলল আর্থিক টানাটানি, সময়ে সময়ে যা সঙ্কটজনক রূপে দেখা দিত। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকেও খারাপ খবর আসতে থাকল। ১৯১০ সালের জুন মাসে কলিকাতা চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কর্মযোগিন রাষ্ট্রদ্রোহীতা

মামলার শুনানি শুরু হল। শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতিহেতু মুদ্রক মনমোহন ঘোষ (ইনি শ্রীঅরবিন্দের ভাই নন) ছিলেন প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে ছয় মাসের কারাদন্ড দিলেন। নভেম্বর মাস নাগাদ ভাগ্য একটু সুপ্রসন্ন হল। নলিনী পন্ডিচেরীতে আসার জানা গেল যে হাইকোর্ট চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনানি ধার্য করেছেন এবং ৭ ই নভেম্বর মনমোহন ঘোষকে অভিযোগ মুক্ত ও কারামুক্তির আদেশ দিয়েছেন। ফলস্বরূপ শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে আনীত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আদেশ বাতিল বলে গণ্য হল। শ্রীঅরবিন্দকে কারারুদ্ধ করার এই তৃতীয় প্রচেষ্টাও বিফলে গেল। হাইকোর্টের রায়ে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে বলা হল আমলাতন্ত্র ভ্রান্তিবশত তাঁকে মামলায় জড়িত করেছে। বিলেতের পার্লামেন্টে হাউস অব কমন্স এ বিষয়ে সরকারকে কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ ভারতে ফিরে আসতে কোন আইনগত বাধার সম্মুখীন হতেন না। পন্ডিচেরীতে অবস্থানের সিদ্ধান্ত থেকে তিনি কিন্তু সরে এলেন না। ৭ ই নভেম্বর যেদিন কলিকাতা হাইকোর্টের রায় বেরোয়, মাদ্রাজের দি হিন্দু পত্রিকার সম্পাদককে শ্রীঅরবিন্দ এক পত্র দেন। এই পত্রে তিনি প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেন যে, পন্ডিচেরীতে তিনি এসেছেন রাজনৈতিক কোলাহলের বাইরে যোগ সাধনায় ব্যাপৃত থাকতে। আপাতত তিনি সকলপ্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর নিয়েছেন। ১৯১২ সালের জুলাই মাস নাগাদ শ্রীঅরবিন্দকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অজুহাতে দোষী সাব্যস্ত করার এক ষড়যন্ত্র হয়। এই ষড়যন্ত্রের উদ্ভাবক ছিল ময়ুরেশান নামে অপর এক কুখ্যাত ব্যক্তি, পেশার গুপ্তচর এবং সি আই ডি পুলিশের সঙ্গে হরিহর আত্মা। এই সময়ে বহু তামিল বিপ্লবী পন্ডিচেরীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ভিভিএস আইয়ার। আইয়ার ছিল শ্রীনিবাসাচারীর খুব ঘনিষ্ঠ এবং শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ পরিচিতি। ময়ুরেশান কতকগুলি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক প্রচারপত্র সংগ্রহ করেছিল এবং কতকগুলি নকশা ও চিঠি জাল করেছিল। কয়েকটি কাগজের উপর মা কালীর ছাপ ও বাংলা লেখা যোগাড় করে বাঙালী স্বদেশী বিপ্লবীদের সঙ্গে তামিল বিপ্লবীদের যোগসাধন ও অপরাধমূলক কাজকর্মের প্রসার আনতে সে সচেষ্ট হয়। এইসব কাগজপত্র একটি টিনের মধ্যে ভর্তি করে সে ভিভি এস আইয়ের বাড়ির কুয়োয় ফেলে দিল। এইভাবে সাক্ষ্য স্থাপন করে সে ফরাসী কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ পেশ করল যে বিপ্লবীরা অতিশয় গোপনে মারাত্মক শান্তিভঙ্গকারী কাজকর্মে লিপ্ত আছে যাতে ফরাসী সরকারের সুনামের ক্ষতি হতে পারে। সে আবেদন করে বিপ্লবীদের আস্তানা, বিশেষত আইয়ার ও শ্রীঅরবিন্দের বাসস্থানের যেন তল্লাসি নেওয়া হয়। কিন্তু ময়ুরেশানের দুর্ভাগ্যবশত পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই আইয়ারের বাড়ির ঝি টিনটি আবিষ্কার করে। সে যখন কুয়ো থেকে

জল তুলছিল টিনটি তার বালতিতে উঠে আসে। সে টিনটি নিয়ে গৃহস্বামীকে অবিলম্বে দেখায়। আইয়ার টিনটি খুলে দেখেন এবং শ্রীনিবাসাচারী ও ভারতীয় সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা তিনজন অতঃপর শ্রীঅরবিন্দের নিকট যান। শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের সাক্ষ্যবস্তু নিয়ে ফরাসি কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে উপদেশ দেন এবং কি পরিস্থিতিতে টিনের মধ্যের চিঠিপত্র, নকশা ইত্যাদি তাঁরা পেয়েছেন পরিস্কার কর্তৃপক্ষকে খুলে বলতে বলেন, ময়ুরেশানের অভিযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন আগেই। অতএব তার চালাকি ধরতে তাদের কোন কষ্ট হল না। যেহেতু সরকারিভাবে অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছিল, যথারীতি তল্লাসি তাদের করতে হল। তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট যাকে বলা হত, স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের বাসস্থানে এলেন। কোন আপত্তিকর বস্তু মিলল না, বস্তুত কিছু পুস্তক ব্যতীত বাড়িটি ছিল একেবারে ফাঁকা। ম্যাজিস্ট্রেট যখন পুস্তকগুলির মধ্যে কয়েকটি বই গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় রচিত দেখতে পেলেন, অভিভূত হয়ে তিনি বলে উঠেন, (ইনি দেখছি ল্যাটিন, গ্রীক জানেন) এই ভাবে এক প্রীতিকর পরিস্থিতি খানাতল্লাসি শেষ হয়। কিন্তু ময়ূরেশানের পরিণতি শেষ পর্যন্ত ভাল হয়নি। বিপ্রবাবা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা অভিযোগের জন্য পাল্টা অভিযোগ আনলেন। তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য নন্দগোপাল চেট্টির মত ময়ুরেশান পণ্ডিচেরী থেকে পালিয়ে নিকটবর্তী ব্রিটিশ এলাকা কাড্ডালের যায়।

শ্রীঅরবিন্দ পরিহাসছলে বলেছিলেন সে এইভাবে রাজনৈতিক উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছিল। ১৯১৩ সালের শেষদিকে এই ঘটনা ঘটে। এতে জানা যায় ব্রিটিশ শাসকেরা শ্রীঅরবিন্দের কার্যকলাপের প্রতি নজরদারি করতে কি রকম প্রয়াসী ছিল। বিজয় নাগের এক সম্পর্কিত ভাই নগেন কলকাতায় অসুস্থ হয়। শ্রীঅরবিন্দের অনুমতিক্রমে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সে পণ্ডিচেরী আসে। নগেনের সঙ্গে বীরেন রায় নামে এক ভৃত্য ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে বীরেন ছিল এক অর্থে নগেনের সহায়ক, আর সে ভাল রাঁধতেও পারত। নগেনের পণ্ডিচেরী আগমনে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। নগেন ছিল আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল, বাড়ি ভাড়া নিতে সে সাহায্যও করেছিল। ইতিমধ্যে বীরেন পরিবারের একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হিসাবে স্থান করে নিয়েছিল। বাসা বদলের পর একদিন সকলে লক্ষ্য করল যে হঠাৎ বীরেন মাথা মুড়িয়ে এসেছে। সুরেশও তার যুবকোচিত খেয়ালীপনায় নিজের মস্তক মুন্ডন করতে প্রবৃত্ত হন। বীরেনের শত নিষেধ সত্বেও সুরেশ মাথা মুড়িয়ে ফেলল। দু'একদিন পরে সন্ধ্যায় সবাই শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে বসে। এমন সময় এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। বীরেন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো যে সে একটা স্বীকারোক্তি করতে চায়। ঘরের পরিবেশ সেই সময় বেশ লঘু ছিল, কেউই তার কথার গুরুত্ব দিতে চায়নি। বীরেন চিৎকার করতে করতে বলে উঠে যে সে সি আই ডি

নিযুক্ত গুপ্তচর। সে আর ব্যাপারটা গোপন রাখতে পারছে না। এ সত্ত্বেও ঘরের অন্যান্য সকলে মনে করেছিল যে বীরেনের এ হচ্ছে এক ধরণের পরিহার। তারা হাসতে শুরু করে দেয়। এতে বীরেন আরো ভড়কে গিয়ে ঘরের বাইরে ছুটে গেল এবং কতকগুলি ১০০ টাকার নোট হাতে ফিরে এল। সি আই ডির সঙ্গে তার যোগাযোগের এই হচ্ছে প্রমাণ, না হলে সে এত টাকা কোথায় পাবে? অবশেষে অনুতপ্ত বীরনে শ্রীঅরবিন্দের পদতলে লুটিয়ে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং ঐ অর্থ তাঁর চরণে নিবেদন করে। ১৯১২ সালের আগস্ট মাসে মতিলাল রায়কে শ্রীঅরবিন্দ আরও সুস্পষ্টভাবে তাঁর উপলব্ধি ও সাধনার অভীষ্ট সম্পর্কে এক চিঠিতে জানাচ্ছেন ১৫ ই আগস্ট আমার ব্যক্তিগত জীবন ও সাধনার ক্ষেত্রে সর্বদাই এক সন্ধিক্ষণ ও তাৎপর্যময় দিন হিসাবে এসেছে। অন্যের ক্ষেত্রে সরাসরি নয়। এবারের ঘটনা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার ব্যক্তিগত সাধনা বলা যায় চরম সিদ্ধিলাভ করেছে। দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধিলাভ বা পরব্রহ্মে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান সম্ভব হয়েছে। অহংসত্তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে, আছে মাত্র অন্নময়আত্মা। শারীর সত্তা অপেক্ষা করে আছে আরেক উপলব্ধির, তারপর পুরানো পৃথক অস্তিত্বের ঘটবে বিলুপ। আমার ভবিষ্যৎ সাধনার লক্ষ্য জীবন, প্রকৃত জ্ঞান ও শক্তি আমি পূর্বাহ্নেই যে অভিজ্ঞতাজাত শক্তি লাভ করেছি, তা নয়, বরং জ্ঞান ও শক্তির সমন্বয় একাধারে আমার সাধনার উদ্দেশ্য প্রভাবিত। আমার কাজের একটা সুস্পষ্ট চেহারা রূপ নিয়েছে। তার খানিকটা আভাস তোমাকে দিতে আমি ইচ্ছুক। তুমি আমাকে কেন্দ্র করে আছ, তোমার জানা দরকার সেই কেন্দ্র কি রশ্মি বিচ্ছুরণ করতে চলেছে। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মানব বুদ্ধির প্রত্যন্ত প্রদেশে সনাতন ধর্মের পুনঃ সম্প্রসারণ ও ব্যাখ্যা- শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বেদের প্রকৃত অর্থ শিক্ষাদান করেন.. তিনি উপনিষদের যে অর্থ কোন ভারতীয় বা ইউরোপীয়ের পূর্বে জানা ছিল না আমাকে শিক্ষা দেন। আমাকে বেদ ও বেদান্তের ভাষ্য নতুন করে প্রচার করতে হবে- দেখাতে হবে কিভাবে সকল ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে এবং মূলত সব ধর্মই এক। এইভাবে প্রমাণিত হবে যে ভারতবর্ষই সকল ধর্মের কেন্দ্রস্থল এবং সনাতন ধর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুক্তি।

বৈদিক জ্ঞানের আলোকে প্রতিষ্ঠিত হবে যোগ সাধনা, যা শুধু আত্মার বন্ধন মোচন ঘটাবেই না বরং সমগ্র মানব সমাজকে উন্নীত করে সত্যযুগের ঘটাবে অভ্যুদয়। কাজ এখনই শুরু করতে হবে। অভীষ্ট সাধন হবে কলির অবসানে।

ভারতবর্ষ হচ্ছে এই কেন্দ্রভূমি। পৃথিবীতে তার যোগ্য স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা

করতে হবে। এই পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ হবে পূর্বোক্ত উপায়ে। মানব প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায়। একমাত্র যোগের মাধ্যমে।

পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠিত করতে হবে। যাতে করে এই সম্পূর্ণতা সে ধারণ করতে পারে। শ্রী অরবিন্দ এই সময় সাধনায় এমনি মগ্ন থাকতেন যে বাড়ির বাইরে আদৌ বের হতেন না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি পন্ডিচেরীতে (বাইরের) সকল সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর অবস্থান জানতেন ও তাঁকে ভক্তি করতেন। তাদের শ্রদ্ধা যে কত অকৃত্রিম ও প্রগাঢ় ছিল তা জানা যায় এমনি একটি ঘটনা থেকে। ব্রিটিশ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে এক ষড়যন্ত্রের জালে ফেলতে চেয়েছিল। ফরাসী ভারতে এই সময়ে এলাইন্স অ্যাক্ট বা বিদেশিদের জন্য এক আইন ছিল যে, কোন ব্যক্তি পন্ডিচেরীতে দীর্ঘকাল বসবাস করতে ইচ্ছুক হলে তাকে তার পূর্বতন বাসস্থানেব কোন উচ্চ সরকারি কর্মচারীর নিকট থেকে গুড কনডাক্ট বা নির্দোষ চরিত্রের প্রশংসাপত্র জোগাড় করতে হত। অন্যথায় পন্ডিচেরীর পাঁচ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রশংসাপত্র দাখিল বাধ্যতামূলক ছিল। এই প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন। আমাকে বলতে হবে না যে, প্রথম উপায়টি আমাদের নিকট ছিল অসম্ভব এবং প্রশ্নাতীত। আমরা দ্বিতীয় উপায়টি বেছে নিলাম। নিম্নোক্ত পাঁচজন ভদ্রলোক আমাদের পরিচয় পত্রে স্বাক্ষর করলেন। রাসেনড্রেন, ডি জির নাইড়ু, ল্যা. বো, শঙ্কর চেট্রিয়ার (যার গৃহে শ্রীঅরবিন্দ প্রথম পন্ডিচেরী এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন) এবং মুরুগেশ চেট্রিয়ার। এই পাঁচজনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত। এই উপলক্ষ্যে তাঁদের সাহস ও বদন্যতা ছিল সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁদের হস্তক্ষেপের ফলেই পন্ডিচেরীতে বসবাস আমাদের পক্ষে সুগম হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় শ্রীঅরবিন্দ সাধারণ ঘনিষ্ঠ সহযোগিদের সঙ্গে সময় কাটাতেন। নিয়মিত অভ্যাগতদের মধ্যে সুব্রহ্মনিয়ম ভারতীয় ও শ্রীনিবাসাচারী নিত্য আসতেন। শ্রীঅরবিন্দের তরুণ সহযোগীবৃন্দ ও এই সব আলোচনায় যোগ দিতেন এবং মাঝে মাঝে কোন বিশেষ বিষয়ের উপর অধ্যয়ন ও আলোচনা চলত পরপর কয়েকটি বৈঠক ধরে। নলিনীকান্তের কলম থেকে আরেকটি সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরি। এক সময়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল বেদপাঠ। রোজ সন্ধ্যায় এক ঘন্টা গেস্ট হাউসে এই পাঠ চলেছিল বেশ কয়েকমাস। শ্রীঅরবিন্দ এসে আসন গ্রহণ করতেন আর আমরা থাকতাম চারপাশে বসে। সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী আর আমার উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি। কোন দিন বা ঋগ্বেদের কোন সূত্র শ্রীঅরবিন্দ পাঠ করতেন। প্রত্যেক পংক্তি ও অনুচ্ছেদের অর্থ ব্যাখ্যা করে অবশেষে সম্পূর্বাংশের অনুবাদ করতেন। আমি তার অনুলিপি রাখতাম। ঋগ্বেগের বহু শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল, অর্থ ভেদের মতানৈক্য ও বিরাজমান। সেক্ষেত্রে

শ্রীঅরবিন্দ বলতেন, তাঁর প্রদত্ত অর্থপাঠ শর্তসাপেক্ষে গ্রহণীয়। শব্দটি উৎপত্তির ব্যাপারে সকল বিষয় পর্যালোচনা করেই শেষে এর অর্থ উদ্ধার সম্ভব। তাঁর নিজস্ব ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা ছিল এই প্রকার- বিষয়টি পাঠ করার পর তাঁর আপন প্রজ্ঞাবলে প্রকৃত অর্থের সন্ধান, তারপর কার্যকারণ নিরিখে আপাত প্রত্যক্ষ বিষয়ের পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন। এই সময় শ্রীঅরবিন্দের কাছে গ্রীক, ল্যাটিন ও সামান্য ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষার সৌভাগ্য নলিনীর হয়েছিল। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল অভিনব। নলিনী লিখেছেন, প্রাথমিক বা শিশুপাঠ্য পুস্তক দিয়ে তিনি নতুন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেননি। তিনি প্রথমেই ক্লাসিকস বা ঐ ভাষার কোন প্রামান্য রচনা দিয়ে আরম্ভ করতেন। তিনি সর্বদা বলতেন শিশুদের শিক্ষা শিশুপাঠ্য পুস্তক দিয়ে আরম্ভ করা উচিত। কিন্তু বয়স্কদের ক্ষেত্রে যারা কিছুটা শিক্ষিত তাদের জন্য, পাঠ্যবস্তু নির্বাচন হবে তাদের বয়সও মানসিক বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে। সেইজন্য আমি যখন গ্রীক পড়তে শুরু করি। প্রথমে আরম্ভ করেছিলাম ইউরোপিডিয়াস এর মিডিয়া দিয়ে। আমার দ্বিতীয় পাঠ্যপুস্তর ছিল সৃপোক্লেস এর এন্টিগুনি। ল্যাটিন আরম্ভ করি ভিরিগিল এর অ্যানসিড আর ইটালিয়ান ডোনেট দিয়ে। এই পদ্ধতির লাভের দিকটা অন্তত আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলতে গেলে যেন ভাষার অন্তস্থলে কেউ প্রবেশ করেছে, যেখানে শক্তি সৌন্দর্য মহিমায় জীবন ও হৃদয় সদা সান্দ্যমান। ১৯১৩ সালের শেষের থেকে নতুন বাসস্থলির ব্যবস্থাদি বেশ ভালভাবেই চলতে থাকল। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সুরেশ, সৌরিন ও নলিনী বাংলায় ফিরে গেল, বিজয়ের উপর থাকল গৃহস্থালির ভার। সেপ্টেম্বর মাসে তারা আবার পন্ডিচেরী ফিরল। ৪ঠা অগস্ট ইউরোপে যুদ্ধ বেঁধে উঠল। এই প্রকার চরম পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক প্রতিবাদীদের জব্দ করতে ভারত সরকার বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ করল। যদি নলিনী সৌরীনরা বাংলাদেশে সে সময় থাকত তবে তাদের ভাগ্যে কারাবাস ছিল অনিবার্য। ১৯১৪ সালে সারা পৃথিবী জুড়ে যুগান্তকারী বিপ্লবাত্মক নানা ঘটনা ঘটতে শুরু করল। শ্রীঅরবিন্দের পক্ষেও বছরটি ছিল রূপান্তরের বৎসর। তাঁর নীরব যোগ সাধনার সমাপ্তি ঘটতে চলল। ১৫ ই আগষ্ট নতুন পত্রিকা এরিয়া প্রকাশিত হল এবং এর পাতায় পাতায় শ্রীঅরবিন্দের যোগ লব্ধ জ্ঞান সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছিল। আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ঘটনা এই সময়ে ঘটেছিল। ২৯ শে মার্চ মীরা রিশার আমাদের শ্রীমা প্রথম পন্ডিচেরী এলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। ১৮৭৮ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী মীরা আলফাসা প্যারিস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন মরিস আলফাসা অ্যাড্রিয়ানোপোল এর এক তুর্কি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী এবং মা ছিলেন কায়রোর এক মিশরীয় মহিলা ম্যাথিলদে ইসমালুন পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন অভিজাত বংশীয় তাঁদের প্রথম সন্তান

মাতেওর জন্ম হয় ১৮৭৬ সালে। এর এক বর পরে আলফাসা পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য প্যারিস চলে আসেন এবং কালক্রমে ফরাসি নাগরিকত্ব লাভ করেন। মীরা প্যারিসে বড় হতে থাকেন এবং বাল্যকাল সেখানেই কাটান। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তাঁর জীবনে অদ্ভুত ও প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ ঘটেছিল। তিনি বুঝতে পারেন যে নিছক গতানুগকিত জীবন যাপনের জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। এক মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তাঁর জন্ম। এই জন্য প্রস্তুতি হিসাবে তিনি আভ্যন্তরীণ উন্নত এক জীবনাদর্শ সচেতনভাবে অনুসরণ করে চলেছিলেন। যে সময়ে তাঁর বয়সি অন্যান্য ছেলেমেয়েরা সচরাচর খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকত। সম্ভবত তিনি আপন মগ্নসত্তায় এমনি নিবিষ্ঠ থাকতেন যে পড়াশুনা আরম্ভ করতে তাঁর একটু দেরী হয়েছিল। কিন্তু যখন পড়াশুনা শুরু হল, দেখা গেল তিনি খুব দ্রুত উন্নতি করে চলেছেন। তাঁর পাঠ্যবিষয়ে আগ্রহ ব্যুৎপত্তি ও জ্ঞান ছিল অপরিসীম। পর্যবেক্ষণের শক্তি ও তাঁর ছিল তীক্ষ্ন। তিনি এক বার বলেছিলেন, ছোটবেলা থেকেই আমার পর্যবেক্ষণের শক্তি ছিল। দৃশ্যমান জগতই যে তাঁর পর্যবেক্ষণের বিষয় ছিল তা নয়। মাঝে মাঝে দৃশ্যমান বস্তু এবং নিজের আন্তর গতিবিধির সহিত তিনি একাত্মচৈতন্য হয়ে যেতেন। বস্তুত বাল্যকাল থেকেই তিনি যোগ অনুশীলন করেছেন। অবশ্য তখন সেটা ওই নামে অভিহিত করতেন না। বাইরের জগতের কার্যকলাপের প্রতি কিন্তু মায়ের কোন উদাসীনতা ছিল বলা চলে না। আট বছর বয়স থেকে তিনি টেনিস খেলতে শুরু করেন এবং অনেক বয়স অবধি তিনি টেনিস খেলেছেন। তিনি সব সময় সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে চেষ্টা করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে তিনি কখনও জিততে পারেননি কিন্তু খেলাটা রপ্ত করতে পেরেছিলেন। অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে মীরার ছিল সহজ প্রবণতা। মাত্র বার বছর যখন তাঁর বয়স তখন তিনি সজ্ঞানে অতিপ্রাকৃত বিদ্যা অনুশীলন আরম্ভ করেন। তিনি নিজের দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসতেন এবং এমন সব অদ্ভুত জগতে প্রবেশ করতেন যা সময়ে সময়ে মোটেই সুখদায়ক হত না। কিন্তু তিনি ভয় পেতেন না। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মা বলেন, আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে আমি আদৌ ভয় পেতাম না। আমি ছিলাম ভয় ডরহীন। যখন কেউ আপন দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসে তখন এক অজ্ঞেয় যোগসূত্রে তার সত্তা বাঁধা থাকে- যদি সেই যোগসূত্র কোন কারণে ছিন্ন হয় তা হলেই সব শেষ। যত বয়স বাড়তে থাকে মায়ের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে পৃথিবীতে তাঁর জন্ম হয়েছে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত। তাঁকে পরবর্তী সময়ে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কখন এবং কিভাবে তিনি এই উদ্দেশ্য বিষয়ে সচেতন হন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এব্যাপারে কবে থেকে আমি সচেতন হয়েছিলাম বলা শক্ত। যেন এটা ছিল আমার জন্মসূত্রে পাওয়া। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি ও

বুদ্ধি বাড়তে থাকে এবং সচেতনতা স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এগার থেকে তের বছরের মধ্যে পরপর আমার কতকগুলি আত্মিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। শুধুমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেই নয়, মানুষের সঙ্গে ভগবানের একাত্মতা ও তাঁকে উপলব্ধি, চেতনায় ও কর্মে এবং তাঁর অবতরণ এই পৃথিবীতে এক দিব্য চেতনায় ঘটা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কার্যকরী শিক্ষা, আমি যখন নিদ্রিত থাকতাম, বিভিন্ন শিক্ষাগুরু আমাকে দিয়ে যেতেন, যাঁদের মধ্যে এই পার্থিব জগতে কাউকে কাউকে পরে আমি দেখেছি। পরবর্তীকালে যখন আন্তর ও বাহ্য উন্নতিলাভ ঘটতে থাকল এইসব গুরুদের একজনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও আত্মিক যোগাযোগ সুস্পষ্ট হয়ে প্রায়শ ঘটতে থাকে। যদিও আমি ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের ব্যাপারে ছিলাম সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তবু তাঁকে আমি জানতাম কৃষ্ণ বলে। আর এও জানতাম একদিন এই পৃথিবীতেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে এবং তাঁর সঙ্গেই দৈবকর্মে আমাকে নিযুক্ত হতে হবে। আমরা জানি, শ্রীঅরবিন্দকে মা যখন পন্ডিচেরীতে প্রথম দেখেন তখনই চিনতে পারেন যে এঁকেই তিনি এতদিন কৃষ্ণ বলে জেনে এসেছেন। ১৬ বছর বয়সে মীরা (শ্রীমা) একটি চিত্রাঙ্কন শিক্ষালয়ে যোগ দেন এবং একাডেমিক জুলিয়ান নামক প্রসিদ্ধ শিক্ষালয়ে শিক্ষানবিশ শেষ করেন। চিত্রাঙ্কনে তাঁর দক্ষতা এমনি হয়েছিল যে মায়ের আঁকা চিত্রসমূহ প্যারিসের জীবিত চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রাবলীর বার্ষিক প্রদর্শনীতে সমসাময়িক বিখ্যাত শিল্পী রনোয়ার, সেজান, প্রভৃতির সঙ্গে প্রদর্শিত হত। সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল প্রগাঢ় এবং অর্গান বাজাতেন সমাহিত একাত্মচিত্তে। ১৮৯৭ সালে প্রসিদ্ধ শিল্পী গ্যুস্তাভ মোরের ছাত্র হেনরী মারিসে এর সঙ্গে মীরার বিবাহ হয়। পরে বছর আগস মাসে তাঁদের পুত্র অঁদ্রে জন্মগ্রহণ করেন। এর পরের কয়েক বছর প্রসিদ্ধ সব শিল্পীদের সাহচর্যে সৃজনশীল মনোরমা পরিবেশে মায়ের জীবন কেটে যায়। এতে করে শিল্পীদের জীবনযাত্রা প্রণালী বুঝতে এবং প্রকৃত শিল্পকর্মের পদ্ধতিগত অভিজ্ঞতা তাঁর লাভ হয়। তিনি এই সময় প্রচুর পড়াশুনা করেন এবং ফ্রান্সে ও ইটালীর যাদুঘর, দুর্গ এবং ঐতিহাসিক হর্ম্যরাজি পরিদর্শন করেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপ্তি, বিদগ্ধতা ও বৈচিত্র্যের এক বিরল সংমিশ্রণ ঘটায়। এই সকল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি সর্বদা আত্মমগ্ন হয়ে থাকতেন সত্যই, কিন্তু চিরাচরিত ধারায় আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জগতের মধ্যে তিনি পার্থক্য করেননি বা এই দুই বিষয়ের মধ্যে কোন অছিদ্র স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান মনে করতেন না। সকল জীবনই যোগ শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন। আর মায়ের ক্ষেত্রেও ঐ একই উপলব্ধি। এ সময়ে তিনি কতকগুলি ভারতীয় ধর্মপুস্তকের সাথে অনুবাদ মাধ্যমে পরিচিত হন। একজন ভারতীয় পর্যটকের মাধ্যমে গীতার সহিতও পরিচয় ঘটে। যদিও অনুবাদ ছিল দুর্বল । কিন্তু মায়ের অন্তর্দৃষ্টি এর মর্মধাবনে সফল হয়েছিল। তিনি কোন বিশেষ পুস্তক বা ধর্মগ্রন্থের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। অথবা কোন গুরু তাঁকে পথ দেখাননি।

তিনি নিজের অভিজ্ঞতার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল যা তাঁকে নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট পথে চালিত করে। এই একই সময়ে মীরাকে কেন্দ্র মনি করে অধ্যাত্ম অনুসন্ধানীদের এক গোষ্ঠী প্যারিসে মিলিত হবেন। এই সঙ্ঘের নামকরণ হয়েছিল আইডিয়া। প্রবন্ধাদি পাঠ হত সভায় এবং মাঝে মাঝে মীরা তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন। এই সংঘের সদস্যবৃন্দ মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই আগ্রহশীল ছিলেন। জর্জরিত অসংখ্য সমস্যার সঙ্গতি পূর্ব সমাধানে ছিলেন উৎসুক। কিন্তু প্রচলিত ধর্মসমূহের সর্বরোগহর ফতোয়ায় এঁরা বিশ্বাস করতেন না। নিজের অন্তরে যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান তাঁরই সন্বেষণ করেন। তাঁদের পাঠচক্রের অন্যতমা সদস্য ছিলেন বিখ্যাত তিব্বত বিশারদ মাদাম আলেকজান্দ্রা, ডেভিড নীল।

পরবর্তীকালে মায়ের পূর্ব জীবন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, বন্ধুবান্ধব পরিবৃত আমাদের সান্ধ্য বৈঠকগুলি ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ভাবনায় বেশ সুন্দর কেটে যেত। আমরা মাঝে মাঝে ময়দানে চলে যেতাম এবং দেখতাম কেমন করে গঙ্গা ফড়িংয়ের মত হাওয়াই জাহাজগুলি আকাশে উড়ে যাচ্ছে। তাঁর মায়ের মার্জিত রুচি, বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান ও অতীন্দ্রীয় বুদ্ধিমত্তা আজও আমার মনে পড়ে। তাঁর প্রেম ও মাধুর্য কোন মহৎ কাজের পর সহজেই নিজেকে সরিয়ে রাখা ইত্যাদি সত্বেও তাঁর প্রচন্ড আত্মিক শক্তি আমাদের কাছ থেকে তিনি লুকাতে পারেননি। ১৯০৬ সাল নাগাদ মীরা এক পোল উদ্বাস্তু মাক্স তেঁঅ র সংস্পর্শে আসেন। তেঁঅ ছিলেন গূঢ় বিদ্যায় পারদর্শী। তাঁর স্ত্রী আলমাও ছিলেন অতীন্দ্রীয় সাধনায় পারঙ্গম। তাঁরা ত্লেমস নামক আলজেরিয়ার এক শহরে বাস করতেন। শহরটি ছিল সাহারা মরুভূমির প্রান্ত সীমায়। তেঁঅর সঙ্গে সাক্ষাৎকার মায়ের গূঢ় বিদ্যা অধিগত করার সংকল্পকে আরো সুদৃঢ় করে। পরের দু'বছর বেশিরভাগ সময় তিনি ট্রেলেমেন এ অতিবাহিত করেন। এখানে তাঁর বহু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এমন কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা তিনি আমাদের বলেছিলেন। এগুলি তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে রয়েছে। চেতনার এমন সব প্রদেশের অস্তিত্ব এবং এমন সব সত্ত্বা পত্রাবলীর ধ্যে রয়েছে। চেতনার এমন সব প্রদেশের অস্তিত্ব এবং এমন সব সত্তা শক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যা সাধারণ ধারণার অতীত। এইসব সত্তা ও শক্তিকে প্রয়োজনে বশীভূত করাও সম্ভব। কিন্তু মা বলতেন যে, এইসব শক্তিকে যদি াধ্যাত্মিক অনুভবে চালিত করা না যায় তবে বিপদ আসতে পারে। যে সেটা প্রয়োগ করছে এবং অন্যদের ক্ষেত্রেও। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি এতই নিশ্চিত ও সুদৃঢ় ছিল যে এ ব্যাপারে তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মায়ের ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয়বাদ ছিল দিব্য সাধনার উপায় বিশেষ। কখনও তিনি এইসব অশরীরী শক্তির অপপ্রয়োগ বা তথাকথিত অলৌকিক কান্ড কারখানার পক্ষে ছিলেন না। ১৯০৮ সালে মীরা আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। সেই বছরেই হেরি মরোসেট এর সঙ্গে তাঁর

বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং তিনি ১ নং রু ডে লেভিস এর এক বাড়িতে উঠে আসেন। এখানে তাঁর জীবনের আরেক অধ্যায় শুরু হল। বহু ছাত্র, জিজ্ঞাসু এবং অন্যান্য ব্যক্তি আধ্যাত্মিক সত্যের অনুসন্ধানে তাঁর কাছে আসত। তিনিও তাদের জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। ১৯১০ সালে পল রিচার্ডের এর সঙ্গে তাঁরআবার বিবাহ হয়। রিচার্ড ছিলেন এক প্রখর বুদ্ধিজীবী, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আধ্যাত্মবাদে সমান উৎসাহী পুরুষ। যখন রিচার্ড ভারতবর্ষ ভ্রমণ শেষে প্যারিসে ফিরে আসেন এবং শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের কথা প্রথম জানতে পারেন। তিনি এই দেশের প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর ভাগ্য ভারতবর্ষের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত। ১৯১২ সালের কোন এক সময়ে থেকে মা ডায়েরী লিখতে শুরু করেন ও নিজের আস্পৃহা ও অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেন। এই ডায়েরী লেখা কয়েক বছর ধরে চলেছিল। এব থেকে কিছু বাছাই করা অংশ ইংরাজীতে অনুদিত হয়। কিছু অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দ স্বয় করেন। প্রেয়ারর্স এন্ড মেডিটেশান (ধ্যান ও প্রার্থনা) নামে প্রকাশিত হয়। আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই সাহিত্যকৃত্য কিন্তু বেশি রক্ষা করা যায়নি। মা এই ব্যাপারে বিশেষ রক্ষণশীলা ছিলেন না। ১৯১২ সালেই তিনি কসমিক নামে একদল অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিবৃন্দের সঙ্গে যুক্ত হন। এই দলে মোট বারোজনের মত ব্যক্তি ছিলেন। এরা সপ্তাহে একদিন করে বসতেন। আগের থেকে আলোচ্য বিষয ঠিক করা থাকত এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও পাঠ চলত। প্রথম অধিবেশনে মায়ের আলোচ্য পাঠ ছিল কোন উদ্দেশ্য সাধন আমাদের অভীষ্ঠ? কোন পথে আমাদের প্রচেষ্টা সঞ্চালিত হবে এবং কিসের মাধ্যমে মা নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন। আমাদের অভীষ্ঠ লক্ষ্য হচ্ছে এই বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সৌষম্য নামিয়ে আনা। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই অভীষ্ঠ সাধনের উপায় হচ্ছে মানব ঐক্যের উপলব্ধি। সকল মানুষের মধ্যে রয়েছে যে এক দিব্য সত্তা তার প্রকাশ। অন্য কথায় এই ঐক্যসাধন হবে প্রত্যেকের মধ্যে যিনি অবস্থিত সেই ঈশ্বরের রাজ্য সংস্থাপন আর এই জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য হচ্ছে-

(১) প্রত্যেকের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও সাযুজ্যের অবহিতি।

(২) মানুষের মধ্যে এতাবৎকাল অজ্ঞাত সত্তার একাত্মীকরণ এবং যে সকল মহাজাগতিক শক্তি অদ্যাবধি ছিল। অর্গলবদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপন।

(৩) মানুষের বর্তমান মানসিক অবস্থা (ধারণক্ষমতা) সাপেক্ষে চিরকালীন সত্যের ঘোষণা।

(৪) সমবেতভাবে এক আদর্শ সমাজস্থাপন। এমন এক স্থানে যেখানে এক নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটবে। যারা হবে ঈশ্বরের সন্তান।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, এখনও মা শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করেননি এবং তাঁর কোন রচনা

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, এখনও মা শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করেননি এবং তাঁর কোন রচনা পাঠ করেননি। অথচ মায়ের এই কার্যধারা সেই সময়ে পন্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ অনুসৃত কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯১৪ সালে মীরার সুযোগ এল ভারতবর্ষে আসার। পল রিচার্ড পন্ডিচেরী নির্বাচন ক্ষেত্রে থেকে ফরাসী পার্লামেন্টের সদস্য পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে স্থির করেন। শ্রীঅরবিন্দের সহিত তাঁর পত্রালাপ ছিল এবং তাঁকে দেখার আগ্রহও রিচার্ড এর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। মীরার পক্ষেও এই সাক্ষাৎকার ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। ১৯১৪ সালের ৬ ই মার্চ পল ও মীরা রিচার্ড জাপানী জাহাজ কাগামারুতে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কলম্বো বন্দরে তাঁরা নেমে, ভারতবর্ষের মূল ভূখন্ডে পৌঁছালেন। সেখান থেকে ট্রেনে ২৯ শে মার্চের খুব ভোরে পন্ডিচেরী পৌঁছান। বিকাল ৩.৩০ মিনিটে মা শ্রী অরবিন্দকে প্রথম দেখলেন ।রিচর্ড ও মীরা শ্রী অরবিন্দের ৪১ নং র‍্যু ফ্রাঁসোয়া মারত্যাঁ ভবনে দেখা করতে এলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সিঁড়ির মুখে শ্রীঅরবিন্দ তাদের অভ্যর্থনা করলেন। মীরা সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দকে চিনতে পারলেন। ইনিই তো কৃষ্ণ যাঁকে তিনি বহুবার দর্শন করেছেন। পরের দিন ৩০ শে মার্চ মীরা তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, শত সহস্র ব্যক্তি গভীর অজ্ঞতায় নিমজ্জিত এটা কিছু বড় ব্যাপার নয়। গতকাল যাঁকে আমরা দর্শন করলাম তিনি এই ধরাধামে আবির্ভুত। তাঁর উপস্থিতিতে নিশ্চিত প্রমাণ যে, একদিন এই অন্ধকার কেটে যাবে। আসবে আলোকপ্রবাহ। হে প্রভু তোমার রাজত্ব নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে এই পৃথিবীতে। অনেক বছর পরে শ্রীঅরবিন্দের অনুজ বারীন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, মা তাঁর প্রার্থনায় লিখেছেন, আপনাকে দেখার পর তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু তাঁকে প্রথমে দেখে আপনার কি মনে হয়েছিল? শ্রীঅরবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, তাঁকে দেখে আমার সর্বপ্রথম প্রত্যয় হল যে পরিপূর্ণ সমর্পন দেহের প্রত্যন্ত কোষসমূহ পর্যন্ত এই মানব দেহেই সম্ভব। যখন মা এসে আমাকে নমস্কার করলেন। বুঝতে পারলাম ইনিই সেই মুর্তিমতী পূর্ণআত্মসমর্পন। শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের এই সাক্ষাৎকার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে ছিল অপরিমেয়। ক্রমে তা ধীরে ধীরে প্রকাশ ও বৃদ্ধি পায়। বাহ্যত মনে হবে এ যেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই ধারার মিলন । কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং ছিলেন প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমন্বয়ী প্রতিভা। আর মায়ের ক্ষেত্রে ঘটেছিল ইউরোপীয় সভ্যতার সুন্দরতম প্রকাশও প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক অনুসৃতি। না, তাদের মিলন ছিল আরো গভীর ও অর্থবহ। আমরা একবার শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করি মায়ের আগমন কি প্রভূতভাবে আপনার কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হয়নি? তিনি জবাবে বলেন, নিশ্চয়ই। তা না হলে আমার সকল দর্শন মায় নির্বাণাদি সবই পার্থিব দৃষ্টিতে তত্ত্বকথায় আবদ্ধ হয়ে থাকত। শ্রীমা স্বয়ং এই সবের পার্থিব রূপায়ন করেছেন। মা ব্যতীত সুশৃঙ্খল অভিপ্রকাশ ছিল অসম্ভব। এই কথারই প্রতিধ্বনি

আমরা পাই শ্রীমায়ের নিগূঢ় বাণীতে। তিনি ছাড়া আমাব কোন অস্তিত্ব নেই। আমাকে বাদ দিয়ে তাঁর প্রকাশ থাকত অজ্ঞাত। রিশার ও মীরা ৩নং রু্য দ্যুপ্লেক্স এ থাকতেন। নাতি দূরে রু্য ফ্রাঁসোয়া মারত্যাঁ এ থাকতেন শ্রীঅরবিন্দ। মীরা বিকালে ৪.৩০ মিনিট নাগাদ প্রত্যহ শ্রীঅরবিন্দকে দেখতে আসতেন। সঙ্গে থাকত নিজের হাতে তৈরি কিছু মিস্টি খাবার। পরে রিশার একে যোগ দিতেন। তাঁর নির্বাচনি কাজের শেষে। সপ্তাহে একদিন রবিার শ্রীঅরবিন্দ রিশারদের বাসগৃহে সন্ধ্যাকালে যেতেন এবং তাঁদের সঙ্গে নৈশাহার করতেন। নলিনী ও অন্য যুবকেরাও ফুটবল খেলার শেষে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেন। অনেক কিছু পরিকল্পনা, আলোচনা হত। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলত এই সব আলোচনা। রিশারের নির্বাচনী কার্যে শ্রীঅরবিন্দের সহায়তা অবশ্যই ছিল কিন্তু তিনি জানতেন রিশারের জয়ের আশা কম। এতে তিনি নির্বাচন ক্ষেত্রে দেরীতে নেমেছেন। তাছাড়া পন্ডিচেরীতে রাজনীতি এতই ভ্রষ্টাচারপূর্ণ ছিল যে কোন সৎ প্রার্থীর নির্বাচনে জয়ী হওয়া ছিল অসম্ভব। সুতরাং প্রত্যাশিত ভাবেই রিশার পরাজিত হলেন। মতিলাল রায়কে শ্রীঅরবিন্দ এই সময়ে লেখেন যে, কয়েকটি কেন্দ্রে পল রিশার এর স্থলে বিপক্ষীয় প্রার্থী দল ব্রাইসেন নামে ভোটপত্র ছাপা হয়। ফলস্বরূপ এই সহজ উপায়ে তাঁর পরাজয় ঘটে। পরাজয় সত্ত্বেও বহু সংখ্যক তরুণ রিশারকে সমর্থন করেন। রিশার পন্ডিচেরীতে যাতে এদের মধ্যে কাজ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে থেকে গেলেন। এই উদ্দেশ্যে সঠিক প্রয়োজনের জন্য তিনি একটি সমিতিও গঠন করেন। যার নামকরণ হল দি নিউজ আইডিয়া। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা সক্রিয়ভাবে এই সমিতির সহিত জড়িত ছিলেন। মা প্যারিসে থাকাকালীন এইরূপ এক সংগঠন পরিচালনা করতেন। শ্রীঅরবিন্দের কথায় এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল এক সমবৌদ্ধিক জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হওয়া, আধ্যাত্মিক মানসিকতা ও আদর্শ যা তারা নিজ জীবনে ও সামাজিক কার্যকলাপে উপলব্ধি করতে উৎসুক এমনি এক সৌভ্রাতৃত্বমূলক মানসিকতায় একত্রিত হওয়া, কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক আলোচনা ছিল এই আদর্শের পরিপন্থী এবং সদস্যদের মাত্র দুটি নিয়ম অনুসরণ করতে হত। এক ,প্রতিদিন ধ্যান ও আত্মসমীক্ষায় কিছু সময় যাপন আর দুই, অপরের প্রয়োজন বা সাহায্য নিমিত্ত অন্তত একটি সুযোগের সৃষ্টি বা সদ্ব্যবহার। এই সংঘের কেন্দ্র স্থল ছিল পন্ডিচেরী। সেখানে একটি সাধারণ পাঠগৃহ ও পাঠাগার ছিল। একটি শাখা অফিস ছিল কারিকলে। অবশ্য পল রিশারের মহত্তম অবদান ছিল, আর্য পত্রিকা প্রচারের প্রস্তাবনা ও সহায়তাদানে। স্মৃতিচারণায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, রিশার আমাকে এসে প্রস্তাব দিল, আসুন জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করি। আর আমি বললাম, বেশ সমন্বয় শুরু হোক। আজ যখন শ্রীঅরবিন্দের বিভিন্ন রচনা সাবা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান পরিচিতি পাচ্ছে তখনও আর্য পত্রিকা ও তার সুবিপুল সাফল্যের কথা অনেকেই জানেন না। আর্য ছিল একটি দার্শনিক মাসিক পত্রিকা। ১৯১৪

পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ প্রায় সাড়ে ছয় বছর ধরে তাঁর সকল উল্লেখযোগ্য ও প্রধান রচনা সকল প্রকাশ করেন। ব্যতিক্রম শুধু সাবিত্রী মহাকাব্য। ১৯১৪ সালের জুন মাসে যখন পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প নেওয়া হয়, মতিলাল রায়কে এক চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ জানান যে, এই পত্রিকায় বেদের নব ভাষ্য প্রকাশিত হবে। উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা থাকবে। আমার যোগ সম্পর্কিত রচনাসমূহ এবং বেদান্তদর্শন (শঙ্কর ভাষ্য নয়, বৈদিক বেদান্ত) বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। যার মধ্যে আদর্শ জীবন ধারণা বা মানবতার অভীষ্ট। তারই উপনিষদীয় ভিত্তি আলোচিত হবে। আমার সম্পর্কে বলি, পৃথিবীর কাছে আমার কর্মধারার এ হবে মেধাগত বিষয়। আর্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১৯১৪ সালের ১৫ই আগস্ট প্রকাশিত হল। শ্রীঅরবিন্দের ৪২ তম জন্মদিবসে। পত্রিকার প্রচ্ছদপত্রে সম্পাদক মন্ডলীর নাম ছিল শ্রীঅরবিন্দ। ঘোষ পল ও মীরা রিশার। একই সঙ্গে ফরাসী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশিত হল। মুখ্যত আর্য প্রভাবিত রচনাবলীর অনুবাদ সমন্বয়ে। আর্য প্রকাশনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, প্রথমত এ হবে আমাদের জীবনের অস্তিত্বের চরম সমস্যাবলীর সুষ্ঠু নিয়মাবদ্ধ পাঠ। দ্বিতীয়ত জ্ঞানের সমন্বয় সাধনের অত্যুচ্চ প্রয়াস, যার মাধ্যমে ঘটবে প্রচা ও প্রতীচ্যের মানবজাতির বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মিলন। তিনি আরও লিখেছিলেন, ভাবী কালের চিন্তাধারার খোরাক যোগানো হবে এর লক্ষ্য। অতীত চিন্তারাশির যা কিছু মহত্তম তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের ভিত্তিভূমি রচনা হবে এর অভীষ্ট। শ্রীঅরবিন্দ আর্য শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন আর্য শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতিগত পার্থক্য বোঝাতে, জাতিগত বৈষম্য বোঝাতে হয়। কারণ আর্যজাতি বলতে এমন এক জনগোষ্ঠী বোঝায় যাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আচার ব্যবহারে, আদর্শ ও আকাঙ্খায় রয়েছে স্বকীয়তা। আর্য শব্দের অন্তর্নিহিত মৌলিক অর্থ হচ্ছে প্রয়াস। উন্নয়ন এবং উত্তরণ। সেই প্রকৃত আর্য যে নিজেকে বহিঃপ্রকৃতি থেকে জয়ী করতে পেরেছে, পেরেছে আন্তর সত্তা থেকে যা কিছু মানব প্রগতির পরিপন্থী তার বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে। আত্মজয় এই নীতির প্রথম সোপান। হিলটার আর্য শব্দের অপপ্রয়োগ করে উন্নত। উগ্র জাতীয়তা ও দম্ভের মূর্ত প্রতীক হিসাবে এর ব্যবহার করে। হিটলারের মতে আর্য বলতে বোঝাবে রক্তকেশী নির্ভীক জাতি। যারা হবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অধীশ্বর। মনে হয় শ্রীঅরবিন্দ এই অপপ্রয়োগ ও দুর্যোগের বিষয় আগেই জানতে পেরেছিলেন। আর এই কারণে আর্য শব্দের প্রকৃত অর্থ পূর্বাহ্নেই ব্যাখ্যা করেছেন। মা জাপান যাত্রার পূর্বে কিছু টাকা পাঠান, যাতে সৌরিনের তত্বাবধানে আর্য ভান্ডার নামে এক দোকান খোলা সম্ভব হয়। আশা করা হয়েছিল এই দোকানের আয় থেকে শ্রীঅরবিন্দের গৃহস্থালীর কিছু খরচ উঠে আসবে। ১৯১৬ সালে আর্য ভান্ডার খোলা হয়। দ্বারোদঘাটনের দিন শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যা হোক এই ব্যবসা বেশি দিন চলেনি। আর অর্থকষ্টও বেশ কয়েক বছর

ধরেই চলেছিল। অন্তর্জগতে এই অসুবিধা গুলি ছিল শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ব্যর্থ করতে উদ্যত আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংগ্রামের আভাস মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের মতে, অর্থ হচ্ছে বিশ্বজনীনি শক্তির প্রতীক, মূলত ও কার্যত অর্থ দিব্য সম্পদ অহং এবং আসুরিক প্রভাব ও ব্যবহার থেকে অর্থকে জয় করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ একবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আজকে যেহেতু অর্থ আসুরিক শক্তির কবলে সে কারণে আমাদের লড়াইয়ে এর প্রয়োজন আছে। যখন এই শক্তি দেখবে তুমি এর বিরুদ্ধে, তোমার চেষ্টাকে ব্যর্থ করতে সে উদ্যত হবে। তোমার প্রয়োজন ঐ অসুরসক্তি অপেক্ষা বৃহত্তর কোন শক্তির আহ্বান করা যাতে অশুভ শক্তি পরাভূত হয়। জাপানে পৌঁছানোর পরে মনে হয় মা শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর সাধনপথের কিছু অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতার সম্পর্কে লেখেন। ১৯১৬ সালের ২৬ শে জুন, এক দীর্ঘপত্রে তাঁদের যোগের পথে বিশেষ বিশেষ অসুবিধার কথা উল্লেখ করে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন, সাধারণভাবে যোগের সাধনা একটি মাত্র লক্ষ্যে নির্দিষ্ট থাকে। ফলে প্রতিবন্ধকতা খুব কমই আসে। আমাদের যোগসাধনা দুরূহ ও বহুবিস্তারী এবং উচ্চ অভীষ্টে স্থাপিত। এই কারণেই আমাদের সাধনপথ অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছানোর পূর্বে সহজতর হতে পারে না। বিশেষত আধ্যাত্মিক জগতে এই সকল বিবদমান অসুরশক্তি সর্বদাই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং সিদ্ধির পথ আবরিত করতে চাইবে। আমাদের মধ্যে কারো একজনের পূর্ণ সিদ্ধি ঘটলে এই অশুভ শক্তির পরাজয় সম্ভব হবে। সত্যকথা এই যে, আমাদের নিজস্ব প্রয়াসে বিজয় সুদূর পরাহত। উচ্চতম শক্তির সঙ্গে সর্বতো যোগাযোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘটবে নিশ্চিত বিজয়। অন্তিম লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তি নিয়ত বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আমাদের সাধনার প্রতি প্রমাণ করে অন্তে জয় সুনিশ্চিত। সময়ের উপর আমাদের হাত নেই। তাই আমি বিরক্তি ও সর্বপ্রকার অধৈর্য দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ১৯১৭ সালে আর এক অতিথি শ্রীঅরবিন্দের কাছে আসেন, তিনি হোম-রুল আন্দোলনের নেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের সচিব বি শিবা রাও। পঞ্চাশ বছরেরও পরে শিবা রাও সেই সাক্ষাৎকারের এক সুন্দর বিবরণী দেন, হোমরুল আন্দোলন তৎকালে মূলত যুদ্ধকালীন অন্তরীন বন্দীদের সহায়তায় দ্রুত জনসমর্থন ও শক্তি সঞ্চয় করেছিল। নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকার কর্মীদের মধ্যে আমরা কয়েকজন আন্দোলন ও সংগঠন কাজে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এই পর্যায়ে আমি পন্ডিচেরীতে এসে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করি। শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ সালে বাংলা ত্যাগ করে পন্ডিচেরীতে বসবাস করছিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে সেই সময়েও অখন্ড শান্তি ও পবিত্রতা লক্ষ্য করে আমি সবিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলাম। তিনি খুবই মৃদুস্বরে কথা বলছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমতী বেসান্তের হোমরুল আন্দোলন ও তাঁর জার্মানির বিপক্ষে মিত্র শক্তিকে অকপট সাহায্যদান সমর্থন করেন। ১৯১৮ সালে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ব্রিটিশ

সরকার ভারতবর্ষে স্বায়ত্বশাসনের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে।

শ্রীমতী ব্যাসান্তের অনুরোধক্রমে এই সংস্কার সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ ১০ ই আগস্ট ১৯১৮ সাল নিউ ইন্ডিয়া পত্রিকায় একটি চিঠি দেন। তিনি এই সংস্কার প্রস্তাবকে নিপুণহাতে রচিত এক চৈনিকধাঁধার সঙ্গে তুলনা করেন। তিনদিন পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পরও এই সব আইনের মধ্যে তিনি সত্যকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষুদ্রাংশও আবিষ্কার করতে সমর্থ হননি। পরিবর্তে নতুন নতুন সাংঘাতিক দায়িত্বহীন ক্ষমতা সরকারের হাতে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় সংস্কারটি কিভাবে গ্রহণীয় হতে পারে? পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন (সরকারের সঙ্গে) সংঘর্ষ এড়ানো যাবে না। বড় জোর সাময়িকভাবে দূরে থাকা সম্ভব। যদি তা ঘটে, তবে আমাদের কাল বা পরশু সংঘর্ষের পথে যেতেই হবে। আর তখন সংঘর্ষ হবে আরো কঠিন ও তীব্র। চিঠিটি শ্রীঅরবিন্দের নামে প্রকাশিত হয়নি। পত্র লেখকের নাম ছিল- জনৈক জাতীয়তাবাদী ভারতবাসী। তিনি এই সময়ে সরাসরি কোন রাজনৈতিক বিষয়ক মন্তব্য নীতিগতভাবে করতেন না। তাঁর যোগসাধনার পরিধি তৎকালে বহুধা বিস্তৃত হয়েছিল এবং আমাদের অজ্ঞাত ও গূঢ় প্রদেশে তাঁর অভীষ্ট পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি যোগশক্তি প্রয়োগ করতে সাতিশয় আগ্রহী ছিলেন। ২৪ শে এপ্রিল ১৯২০। শ্রীমা দ্বিতীয়বার পন্ডিচেরীতে এলেন, আর ফিরলেন না। পল রিশারও মায়ের সঙ্গে আসেন। ফ্রান্সে পরিচিত একজন খ্যাতনামা ইংরাজ মহিলা যিনি মায়ের সঙ্গে জাপানে ছিলেন, এই সঙ্গে তিনি পন্ডিচেরীতে এসেছিলেন। মহিলাটির নাম ছিল ডরোথি হজসন। শ্রীঅরবিন্দ তার নামকরণ করেন বাসবদত্তা। সংক্ষেপে দত্তা। যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ সরকার মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার প্রস্তাবকে ১৯১৯ সালের ভারত সরকার আইন রূপে ঘোষণা করল। শ্রীঅরবিন্দ যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হল, এই আইনে সকল ক্ষমতা পূর্বের মত প্রকৃত অর্থে ব্রিটিশ রাজের হাতেই থাকল। এতৎসত্বেও অনেকে পরীক্ষামূলক ভাবে এই সংস্কার গ্রহণ করতে চাইলেন। জাতীয় নেতৃত্বে এই সময়ে বিশেষ শূন্যতা ঘটেছিল। ১৩ই এপ্রিল ১৯১৯ এ জালিয়ান ওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যান্ডে রাজনীতিক বাতাবরণ ক্ষুব্ধ আক্রোশ, অপমান ও নৈরাশ্যে ছিল আবৃত। অ্যানি বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনের পরিণতি ব্যর্থতায় পরিসমাপ্ত হয়। এদিকেকংগ্রেসের উপর প্রভাব ও নেতৃত্ব স্থাপনে গান্ধীজীর আগমনের তখনও বিলম্ব ছিল। মান্দালয় কারাগার থেকে তিলক সদ্য মুক্তি পেয়ে ভারতে ফিরেছেন এবং নতুন করে জাতীয়তাবাদী শক্তি গোষ্ঠীগুলিকে সংঘবদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন। ১৯১৯ সালের শেষের দিকে তিলক তাঁর এক অনুগামী জোসেফ ব্যাপটিস্টকে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করেন তিনি যেন তাঁদের প্রস্তাবিত জাতীয়তাবাদী মুখপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। এক দীর্ঘ পত্রে (৫ ই জানুয়ারী ১৯২০) শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দেন, আপনাদের লোভনীয় প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে অপারগ। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসেবে

তিনি বলেন, তাঁর সংশয় আছে যে সরকার তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবেন কিনা। যদি কোন সংঘাত বাধে তাঁকে আবার কারারুদ্ধ করা হবে। আমার হাতে এখন অনেক কাজ। তিনি জানান, সরকারের অতিথিশালায় বিশ্রাম নিয়ে সময় নষ্ট করতে তিনি চান না। এমনকি যদি আশ্বাস দেওয়া হয় পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার তবুও তিনি বর্তমানে যেতে পারবেন না। তিনি পন্ডিচেরী এসেছেন স্বাধীনতা ও শান্তির মধ্যে এক অভীষ্ট লক্ষ্যের সন্ধানে, যেখানে বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি এখানে আসার পর রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তাঁর ছিন্ন হয়েছে। তিনি তাঁর নিজের পথে দেশের জন্য করণীয় সবকিছুই করে চলেছেন। আর যতদিন না তা সম্পূর্ণ হচ্ছে অন্য কিছু প্রকাশ্যে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। যদি তিনি ব্রিটিশ ভারতে থাকতেন তাহলে অনিচ্ছাসত্বেও বিভিন্ন কার্যকলাপে তাঁকে অংশ নিতে হত। পন্ডিচেরী তাঁর নিভৃত আলয়। তাঁর তপস্যার গর্ভগৃহ, সন্ন্যাসীদের আদর্শে নয়, তাঁর নিজের আবিষ্কৃত এক নতুন ধরনের তপস্যাক্ষেত্র। তাঁকে এই কাজে বিজয়ী হতে হবে। তাঁকে পন্ডিচেরী ত্যাগের পূর্বে পূর্বশর্ত হিসাবে অন্তঃসজ্জায় সজ্জিত ও নিপুণ হতে হবে। কয়েকমাস পরে শ্রীঅরবিন্দকে রাজনৈতিক মঞ্চেও ফিরিয়ে আনার এক প্রবল চেষ্টা হয়েছিল। ১৯১০ সালের ১লা আগস্ট লোকমান্য তিলকের তিরোভাব ঘটে। বিপিন পালের অনুরোধক্রমে শ্রীঅরবিন্দ প্রয়াত নেতার উদ্দেশ্যে এক মনোরম প্রশস্তি রচনা করেন। এই লেখা পাল সম্পাদিত দি ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটি শুরু হয়েছিল এইভাবে, এক মহান চিন্তানায়ক, এক দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তিত্ব, নিজ কর্মক্ষেত্রে সার্থক এক মহান নেতা আজ আমাদের মধ্যে নেই। জাতীয়তাবাদী নেতারা চাইলেন শ্রীঅরবিন্দ এসে নেতৃত্বের হাল ধরুক। এই উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট কংগ্রেসী শ্রীঅরবিন্দের পূর্ব পরিচিত ডাক্তার বি এস মুঞ্জে, জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পন্ডিচেরী আঁসেন। দীর্ঘ কথোপকথনের পর মুঞ্জে ডিসেম্বর ১৯২০ সালে কংগ্রেসের আসন্ন নাগপুর অধিবেশনে পৌরোহিত্য করতে শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি রাজি হননি। এরপর ডাক্তার মুঞ্জে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে পুনরায় অনুরোধ করেন তিনি যেন সভাপতি হতে সম্মতি দেন। ১৯২০ সালের ৩০ শে আগস্ট শ্রীঅরবিন্দ জরুরি উত্তরে তাঁর অসম্মতির পক্ষে অনেকগুলি কারণ নিদর্শন করে লেখেন, প্রধান ককারণ হচ্ছে আমি মুখ্যত আর রাজনীতিবিদ নই। আমি এখন অন্যবিধ এক কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি। যার ভিত্তি আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন আমি প্রায় বৈপ্লবিক পর্যায়ে শুরু করেছি। আমি এই কাজে যেন পরীক্ষাগারে পর্যবেক্ষণ ও সকল শক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছি। যোগ শিক্ষায় নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে বারীনের মন্তব্য, আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে শানান লোহা এই সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন, দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের

মধ্যে দেবতা আছে। তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলে কর্ত্তে পারে। বড় আধার, ক্ষুদ্র আধার আছে জানি, তোমার নিজের সম্বন্ধে সে বর্ণনাকে আমি এক্যুয়ারেট বলে গ্রহণ করছি না। তবে যেরূপ আধারই হোক একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হয়, তারপর বড় ছোট এ সবেতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বেশি বাধা হতে পারে, বেশি সময় লাগতে পারে, বিকাশের তারতম্য হতে পারে, তারও কিছু ঠিক নাই। ভিতরের দেবতা সে সব বাধা ন্যূনতার হিসাব রাখে না, ঠেলে ওঠে। আমারও কি কম দোষ ছিল মনের চিত্তের প্রাণের দেহের। বা কম বাধা? সময় কি লাগে নি? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন দিনের পর দিন, মুহূর্তের পর মুহূর্ত? দেবতা হয়েছি বা কি হয়েছি, জানি না, তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি ভগবান যা গড়তে চেয়েছেন- তাহাই যথেষ্ট। সকলেরও তাই। আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তি এই যোগের সাধক। রাজনীতি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য ছিল খুবই সুস্পষ্ট। রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে। বিলাতী আমদানী, বিলাতী ঢংয়ের অনুকরণ মাত্র। তবে তারও দরকার ছিল, আমরাও বিলাতী ধরনের রাজনীতি করেছি, না করলে দেশ উঠত না। আমাদেরও এক্সপেরিয়ান্স লাভ ও পূর্ণ ডেভেলপমেন্ট হত না। এখনও তার দরকার আছে, বঙ্গদেশে তত নাই, যেমন ভারতের অন্য প্রদেশে। কিন্তু এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরবার। ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম তারই অনুরূপ করা চাই। এই দশ বৎসর আমার ইনফ্লুয়েন্স মৌনভাবে এই বিলাতী রাজনীতি ঘটে ঢেলেছি। ফলও হয়েছে। এখনও তাহাই করতে পারি, যেখানে দরকার, কিন্তু যদি বাহিরে গিয়ে আবার সেই কর্ম্মে লাগি, রাজনীতিক পান্ডাদের সঙ্গে মিশে কাজ করি, একটি পরধর্মের, একটি মিথ্যা রাজনীতিক জীবনের পোষণ করা হবে। চিঠির শেষাংশে শ্রীঅরবিন্দ বাঙালি চরিত্রের কয়েকটি ত্রুটিও দুর্বলতার উল্লেখ করেন। যথা বাঙালি সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। পরবর্তী অংশের বক্তব্য অপূর্ব। সেই জন্যে আমি আর ইমোশনাল এক্সিটমেন্ট, ভাব, মনমাতানোকে বেজ করতে চাই না। আমি আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে চাই বিশাল বীর সমতা, সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারের সকল বৃত্তিতে পূর্ণ দৃঢ় অবিচলিত শক্তি। শক্তি সমুদ্রে জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মির বিস্তার। সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম আনন্দ ঐক্যের স্থির এক্সটেসি। লাখ লাখ শিষ্য চাই না। কেশ ক্ষুদ্র আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাহাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই। আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হৌক অপরের স্পর্শে জেগে হউক কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভাগবত জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে। ১৯২২ সালে ১লা জানুয়ারী থেকে গৃহস্থালীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব মা নিজের কাঁধে নিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ও মাকে নিয়ে বাসিন্দাদের

সংখ্যা হয়েছিল নয়। প্রথম যে চারজন তরুণ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এসেছিলেন, এরা ছাড়া কে অমৃত আসেন ১৯১৯ সালে। বারীন এলেন তাঁর পত্রালাপ অন্তে। দত্তা এসেছিলেন মায়ের সঙ্গে। বাসিন্দাদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত বাসস্থানের খোঁজ চলল। ১৯২২ এর সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীঅরবিন্দ মা, দত্তা ও আরো কয়েকজন র‍্যু দ্য লা মারিন এর উপর একটি বাড়িতে উঠে এলেন। এই বাড়িটি পরবর্তীকালে লাইব্রেরী হাউস বা পাঠাগার গৃহরূপে আখ্যাত হয়। বর্তমানে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সংলগ্ন প্রধান গৃহের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। র‍্যু ফ্রাঁসোয়া মারত্যাঁ-র অন্য বাস গৃহটিও রেখে দেওয়া হল। আশ্রমিক অতিথিদের বাসের সংস্থানএই গৃহে হত। যা থেকে এর নাম হয়েছিল গেস্ট হাউস বা অতিথি নিবাস। আশ্রমিক সংখ্যা বাড়তেই, কোন পরিকল্পনা ব্যতিত, এ ক্ষুদ্র আধ্যাত্মিক সংঘের বা কেন্দ্রের সূচনা হল। শ্রীঅরবিন্দকে মধ্যমনি করে এই কেন্দ্র যেন সহজ শক্তিতে বৃদ্ধি পেতে থাকল। তাঁর নিজের কার্যপ্রণালী ঋজু বা অনমনীয় ছিল না বা অপরের উপর কিছু তিনি চাপিয়ে দিতে চাইতেন না। সাধারণত সকালে (ব্রেকফাস্ট বা প্রাতঃরাশের পর ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে) অতিথিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ঘটত। এই সাক্ষাৎকারীদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। বিকাল ৪টা নাগাদ হত সমবেত ধ্যান (এই ব্যবস্থা মা আসার পর ১৯২১ সালে প্রচলিত হয়)। শ্রীঅরবিন্দ মা এবং প্রায় সকলে আশ্রমিক এই সমবেত ধ্যানে যোগ দিতেন। পরে সন্ধ্যা সমাগমে, শিষ্য ও নির্ধারিত অভ্যাগতগণ নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হতেন এবং শ্রীঅরবিন্দ তাদের প্রশ্নের উত্তর দান ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। এই সাক্ষাৎকার ছিল ঘরোয়া এবং শ্রীঅরবিন্দের অবসর বা বিশ্রাম সময়ানুযায়ী ঘটত। প্রকৃত অর্থে এই সান্ধ্য বৈঠক ছিল ১৯১৮ সাল থেকে চালু। গেস্ট হাউসের একতলার বারান্দায় অনুষ্ঠিত আলাপের উত্তরসুরী। লাইব্রেরী হাউসের একতলায় অনুরূপ বারান্দা ছিল, যেখানে সান্ধ্য বৈঠক বসত। ভক্ত শিষ্যরা মাটিতে বসতেন। শ্রীঅরবিন্দের জন্য চেয়ারও টেবিলের সুবন্দোবস্ত ছিল। অধীর আগ্রহে উপস্থিত সকলে শ্রীঅরবিন্দের আগমনের অপেক্ষায় থাকত। পুরানী লিখেছেন, শ্রীঅরবিন্দ আসতেন ধুতি পরে, দেহের অনাবৃত ঊর্দ্ধাংশ থাকত কাপড়ের খুঁটে ঢাকা। খুব কম সময় তাঁকে চাদর বা শাল ব্যবহার করতে দেখা যেত। তাঁর কথা অনুযায়ী, তাও ঘটত আবহাওয়া দেবতার সম্মানে। মাঝে মাঝে শ্রীঅরবিন্দ অনেকক্ষণ ধরে ৯নং দ্য লা মারিন-এর বাড়ির বারান্দায় পর্দার (খসের) অন্তরালে থেকে উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এই বৈঠকে একান্তই ছিল শ্রীঅরবিন্দের সময়ের উপর নির্ভরশীল। শ্রীঅরবিন্দের (বাহ্যিক কোন অভিপ্রকাশ ব্যতিরেকেই) একাদিক্রমে দিনের ৩/৪ অংশ কেটে যেত গভীর নীরবতায়। সমস্ত ব্যাপার এতই খোলামেলা ছিল যে কখন আলাপ আলোচনা কোন মুখী হবে বলা সম্ভব ছিল না। সমবেত উপস্থিত মন্ডলী এক অপ্রত্যাশিত আনন্দ ও মুক্ত সজীব সাক্ষাৎকারের অপেক্ষায় থাকত। লঘু হাস্যরস, বাক্যালাপ,

কৌতুক বা সমালোচনা, এসব ছিল ব্যক্তি গত স্তরে... কিন্তু ঐ বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বা আগ্রহের কোন অপ্রতুলতা লক্ষিত হত না। পুরানী ১৯২৩ সালে আশ্রমবাসী হন। সেই থেকে সান্ধ্য বৈঠকের বিশদ বিবরণ তিনি লিখে রাখতেন। যদিও এগুলি প্রকাশের প্রাথমিক ইচ্ছা ছিল না, পরে পুস্তকাকারে এই কথোপকথন প্রকাশিত হয়। আমরা নানা বিষয়ে সাধনা, রাজনীতি, কলা সাহিত্য শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদির উপর শ্রীঅরবিন্দের মনোমুগ্ধকর আলোকপাত ও মন্তব্য এই কথোপকথনকালে করতে দেখি। অবশ্য আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এই কথোপকথনের নথিপত্র শ্রীঅরবিন্দ দেখেননি। সান্ধ্য বৈঠক পুস্তকের ভূমিকায় পুরানী লিখেছেন, আমাদের ছোট গন্ডির মধ্যে ঘরোয়াভাবে যেসব আলোচনা হত, সেগুলি কিন্তু বিষয়, ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মতামতের নিরপেক্ষ প্রকাশ বলা চলে না। প্রায়ই ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের স্তরে অথবা সমবেত পরিবেশ উপলক্ষ্য করে তিনি উত্তর দিতেন। এই আলাপন ছিল অনেকটা আধ্যাত্মিক ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখে আধ্যাত্মিক দাওয়াই, কোন প্রশ্ন , ঘটনা বা গতিবিধির সাধারণ দার্শনিক ব্যাখ্যা নয়। কোন কোন আলোচনার নীট ফল ছিল শিষ্যদের মানব বুদ্ধির অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা বোঝান আর প্রকৃত সত্যের সন্ধানে মানব বুদ্ধির অপ্রতুলতা। পাঠাগার গৃহে বাসের প্রথম বৎসর মা ছিলেন অন্তরালে। ক্রমশ তাঁর উপস্থিতি এবং প্রভাব শিষ্যদের সমবেত জীবনযাত্রা ও সাধারণ ক্ষেত্রে প্রকাশ পেতে থাকল। ভক্তশিষ্যরা লক্ষ্য করতো শ্রীঅরবিন্দ যোগ সাধনায় মায়ের সাহায্য প্রায়শ চাইতেন। নলিনী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, প্রথম প্রথম শ্রীঅরবিন্দ মাকে মীরা এই নামে ডাকতেন। পরে (মানে বেশ কয়েক বছর পরে) আমরা লক্ষ্য করলাম ম অবধি শেষে তিনি থেমে যেতেন এবং মীরা বলতেন খানিকটা ইতস্তত করে। আমাদের কাছে একটু আশ্চর্য মনে হত কিন্তু পরবর্তীকালে এর অর্থ আমরা জানতে পারি। শ্রীঅরবিন্দ মা বলতে চাইতেন কিন্তু এ ডাকের জন্য আমরা তখনও তৈরি হইনি। কাজেই তিনি মাকে মীরা নামে ডাকতেন। আমাদের সঠিক মনে নেই কোন বিশেষ দিনে। শুভ মুহূর্তে মাকে শ্রীঅরবিন্দ মা বলে ডাকেন কিন্তু সময়ের অলিখিত ইতিহাসে নিশ্চিত সে দিনটি ছিল এক দিব্য মুহূর্ত। ক্রমে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা যতই তীব্র ও গভীরতর হতে থাকলর তিনি পর্দার আড়ালে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন এবং শিষ্য ও ভক্তেরা মায়ের দিকে প্রেরণা ও নির্দেশের জন্য ক্রমে আকৃষ্ট হতে থাকলেন। শ্রীঅরবিন্দের ভগ্নি, সরোজিনী আসেন ১৯২১ সালে। স্টেশনে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে যান। বিদায় জানাতেও তিনি স্টেশনে গিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সরোজিনীকে তাঁর যুদ্ধেও আত্মনিয়ন্ত্রণ বইখানির গ্রন্থসত্ত্ব দান করেন যাতে তিনি আর্থিক সহায়তা লাভে উপকৃত হন। প্রায় এই সময় এক অসাধারণ আগন্তুকের আগমন ঘটে। একনি এক দীর্ঘকায় পোশাক পরিচ্ছেদে দস্তুরমত সন্ন্যাসী এসে হাজির। মাথায় জটা, হাতে লোহার

চিমটা আর সঙ্গে কয়েকজন চেলা। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে চান। সকলে তাঁর প্রস্তাবে ইতস্তত ভাব দেখাতে তিনি একজনকে ডেকে আস্তে আস্তে বললেন, শ্রীঅরবিন্দকে বলুন গ্যাব্রিয়েল এসেছে। শ্রীঅরবিন্দ এই সংবাদ পেয়ে জোরে বলে উঠেন, কি আশ্চর্য, গ্যাব্রিয়েল যে অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীকে আমার দেওয়া নাম। যুবক অমরেন্দ্রনাথকে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দেন। আমাদের মনে আছে, যে কজন শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর থেকে নিস্ক্রমনে সাহায্য করেন অমরেন্দ্র ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। আগন্তুক সন্ন্যাসীকে শ্রীঅরবিন্দের নিকট নিয়ে যাওয়া হয় এবং আনন্দপূর্ণ পুনর্মিলন ঘটে। বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেতে তিনি সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করেন। তিনি সারা দেশ ঘুরে বেড়াতেন এবং কালক্রমে কিছু চেলাও জুটিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বাংলায় ফিরে যেতে বলেন। যুদ্ধের পর দেশের পরিস্থিতি বদলেছে। তিনি নিজের আত্মপরিচয় দিয়ে যেন বিপ্লবমূলক কাজ থেকে বিরত থাকেন। পরের দিন গ্যাব্রিয়েল শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ মত পন্ডিচেরী ত্যাগ করেন। ১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীঅরবিন্দকে ফিরে আসতে অনুরোধ করেন। তিনি যেন কংগ্রেসের হাল ধরেন। এই সময়ে নতুন ভারত শাসন আইন অনুসারে গঠিত আইন সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে পরিবর্তন পন্থী এবং অ -পরিবর্তনপন্থীদের মধ্যে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। নভেম্বরে শ্রীঅরবিন্দ বারিনকে দিয়ে যে জবাব পাঠান তা ছিল ব্যাপটিস্টা ও ডাক্তার মুঞ্জেকে প্রেরিত তাঁর পূর্বের চিঠির অনুরূপ। তিনি লেখেন, আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে, সকল কাজ ও জীবনের সত্যকার ভিত্তি হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা- অর্থাৎ যোগের সাহায্যে এক নবচেতনার উন্মেষ সাধন।

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে মানুষের এই ব্যর্থ ঘূণাবর্ত থেকে মুক্তি নেই যদি না সে এক উচ্চতর ভিত্তিভূমিতে উঠতে পারে। বহির্জগতে আমার কাজকর্ম বন্ধ থাকবে যতদিন না আমি নিশ্চিতভাবে এই শক্তির অধিকারী হতে পারব। আর এই ভিত্তিভূমি সুসম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমার দ্বারা অন্য কিছু সম্ভব নয়। ১৯২৩ সালের জুন মাসে চিত্তরঞ্জন দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা করছিলেন রাজনৈতিক কারণে। তিনি ঐ সময় পন্ডিচেরী আসেনও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু এবং অন্যান্য সমমনস্ক কংগ্রেসী নেতারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে স্বরাজ্য দল স্থাপন করেন এবং আইনসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জন শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করেন তিনি যেন এই নতুন দলকে সাহায্য করেন। শ্রীঅরবিন্দ খোলাখুলি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না দিলেও বলেন, যে তাঁর আধ্যাত্মিক সহায়তা তিনি নিশ্চিত দেবেন। মনে হয় এই সময় চিত্তরঞ্জন শ্রীঅরবিন্দের নিকট যোগ দীক্ষা কামনা করেন কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ রাজি হন

না। অনেক বছর পরে এই ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তিনি ছিলেন প্রবীণ নেতৃত্বের শেষ প্রতিনিধি। তিনি এখানে এসে আমার শিষ্য হতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম রাজনীতির সংসর্গ না ত্যাগ করলে তাঁর পক্ষে যোগের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া তাঁর স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছিল। চিত্তরঞ্জন এরপর বেশিদিন বাঁচেননি। ১৯২৫ সালের ১৬ ইন জুন তাঁর দেহাবসান হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পুরাতন বন্ধুর প্রতি এক অবিস্মরণীয় শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে এক বিরাট ক্ষতি হল। রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা, চরিত্ররে আকর্ষণীয় ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ও প্রয়োজনীয় বিচক্ষণতা এবং মানসিক নমনীয়তায় চিত্তরঞ্জন ছিলেন তিলকের উত্তরসূরী। তিনি ভারতকে স্বরাজের পথে চালনা করতে পারতেন। অন্ধ্রের এক রাজনীতিবিদ ভি ভি সুব্বারাও ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারে বেশ মূল্যবান কেন না পরবর্তীকালে সুব্বারাও এর এক বিশদ চিত্রালেখ্য আমাদের উপহার দেন। তিনি লিখেছিলেন যে, শ্রীঅরবিন্দের গাত্রবর্ণ ছিল উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়। বলা হয় যে তাঁর প্রথম জীবনে তিনি বেশ কালো ছিলেন এবং তাঁর পাতলা লম্বা কাঁচাপাকা দাড়ি ছিল। তাঁর চেহারা ছিল পাতলা ধরনে, গান্ধীজীর চাইতে বেশি লম্বা হবেন না। তবে অতটা কৃশকায় ছিলেন না। তাঁর চোখ দুটি ছিল দীর্ঘাকৃতি এবং দৃষ্টি ছিল মর্মস্পর্শী (মর্মভেদী)। তিনি মিহি সুতির ধুতি পরিহিত ছিলেন। খদ্দর নয়। তাঁর অঙ্গবস্ত্র ছিল দুটি- এক ধুতি, অন্যটি উপবীতের ন্যায় কাঁধের উপর রাখা, যাতে করে ডান কাঁধ ও হাত অনাবৃত থাকত...। শ্রীঅরবিন্দের স্বর ছিল কোমল কিন্তু স্পষ্ট এবং সুরেলা। তাঁর বাচনভঙ্গী ছিল দ্রুত, স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এবং বিশ্লেষণধর্মী। মাত্র পনের মিনিট কথাবার্তায় তিনি সংক্ষেপে তাঁর দর্শন আমাকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি ছিলেন সাধাসিধে, সরল, ভদ্র এবং মিষ্টভাষী, আর প্রশ্নোত্তরকালে খোলা মনের মানুষ। একবার দেখেই তিনি মানুষ চিনতে পারতেন। কোন লোকের ফটো দেখে তিনি সেই ব্যক্তির মনের ভাব বুঝতে পারতেন। সময়ের ব্যাপারে তিনি খুবই মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি ছিলেন স্নেহশীল ঠিক যেমন শিশুর প্রতি বর্ষণশীল। তাঁর আচরণ লক্ষ্য করে আমার এই মনে হয়েছিল যে, প্রয়োজনে তিনি কঠোর হতে পারতেন। নিজের ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ বিধি ছিল রাজকীয় মহিমামন্ডিত। ১৯২৪ সালে আর এক উল্লেখযোগ্য অতিথি আসেন। তিনি বাঙালি প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ রায়। দিলীপ নিজেও ছিলেন সুগায়ক। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখিন এবং দিলীপ স্বচ্ছন্দে জীবনের যে কোন বিভাগে উন্নতি করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল এক অদ্ভুত অস্থিরতা যা তাঁকে আধ্যাত্মিক মার্গে টেনে এনেছিল। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দেন। দিলীপ তাঁর গ্রন্থ মনীষীদের সঙ্গে এ এই সাক্ষাৎকারের বিশ্বস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ

করেন। বইটি সকলের পাঠ করা উচিত। আমরা তার থেকে বিশেষ কোন উদ্ধৃতি দেব না। শুধু শ্রীঅরবিন্দের নিকট তিনি উপস্থিত হলে যা বলেছিলেন, তাঁর উল্লেখ করছি- জ্যোতির্ময় এক পুরুষ মহাত্ম, সঙ্গীত তাঁকে ঘিরে বাতাসে গুঞ্জন তুলছে। শান্তির এক গভীর দীপ্তি তাঁকে ঘিরে রেখেছে, অনির্বচনীয় প্রশান্তি স্বতই অন্যকে আকর্ষণ করছে তাঁর মুগ্ধকারী পরিমন্ডলে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি যা সর্বাধিক আমাকে মুগ্ধ করেছিল- আঃ কি তীক্ষ্ন আলোকোজ্জ্বল সেই দৃষ্টি। দিলীপ রায় পরে আশ্রমে যোগ দেন এবং শিষ্য হিসেবে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর এক বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। দেশের সামনে যে সকল সমস্যা রয়েছে সে বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দেব সঙ্গে তাঁর এক বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। দেশের সামনে যে সকল সমস্যা রয়েছে সে বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মতামত জানতে চেয়ে এই সময়ে একবার গান্ধীজী তাঁর পুত্র দেবদাসকে পন্ডিচেরী পাঠান। মনে হয় না যে এই সাক্ষাৎকার ফলপ্রসু হয়েছিল। দেবদাস অহিংসা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মতামত জানতে চান। শ্রীঅরবিন্দ কোন উত্তর না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন। মনে কর আফগানরা ভারত আক্রমণ করল, তখন অহিংসা দিয়ে কিভাবে তার মোকাবিলা করবে? দেবদাস বোধকরি অসাবধানতাবশত শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর ধূমপানে আসক্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ দেবদাসকে বলেন, তার ধূমপানে অনাসক্তির কারণই বা কি? দেবদাস গান্ধীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব ছিল যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনার অঙ্গ হিসাবে সমতা অভ্যাসও আয়ত্ব করেছেন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করতে পেরেছেন। এমন কি তাঁর খাবারে নুন দিতে ভুল হলেও তিনি মন্তব্য করতেন না। আর ধূমপান? ১৯২৬ সালে অনায়াসে ধূমপানের অভ্যাস তিনি ত্যাগ করেছিলেন। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম থেকেই এক উর্ধ্বতন শক্তির চাপ অসহনীয় ভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। অবশেষে ২৪ শে নভেম্বর সেই মহতী দিবসের আবির্ভাব ঘটল। যে দিনটির জন্য শ্রীমা বহুদিন অপেক্ষা করে আছেন সূর্য অস্তপ্রায় সকলে যে যার কাজে ব্যস্ত- কেউ বা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরিয়েছে। এমন সময় মা সকলকে ডেকে পাঠালেন। তাড়াতাড়ি বারান্দায় যেখানে সাধারণত ধ্যান হয় সেখানে জড়ো হতে বললেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকলের কাছে সংবাদ চলে গেল। ৬টা নাগাদ প্রায় সকল শিষ্য এসে হাজির। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বারান্দার দেওয়ালে, শ্রীঅরবিন্দের ঘরের দরজার কাছে, কালো রেশমের এক পর্দা, সোনালী লেস দিয়ে তিনটি চিনা ড্রাগন তাতে আঁকা। ড্রাগন তিনটি এমনভাবে আঁকা ছিল যাতে একটির লেজের অংশ অপরের মুখ গহ্বরে প্রবেশ করে আছে। এইভাবে ড্রাগন তিনটি পর্দার সমস্ত অংশ জুড়ে আঁকা হয়েছিল। আমরা পরে জানতে পারি যে, চিন দেশে এক কিংবদন্তী আছে যে যখন তিনটি ড্রাগন (তিন ভুবনের প্রতীক- স্বর্গ,

মর্ত্য, রসাতল) একত্র মিলিত হবে তখন সত্যের ঘটবে অভিপ্রকাশ। আজ ২৪ শে নভেম্বর সেই সত্য নেমে এসেছে-পর্দার তিনটি ড্রাগন প্রতীকার্থে সার্থক হয়েছে। শিষ্যরা সবাই একত্রিত হলেন। বাতাসে এক গভীর নীরবতা বিরাজ করছিল। অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছিল যেন উর্দ্ধ হতে আলোকের বন্যা নেমে আসছে। মাথার উপর একটা চাপ সকলে অনুভব করল। সমস্ত আবহাওয়া যেন বিদ্যুতায়িত হয়ে উঠেছিল। সেই নিস্তব্ধতায়, প্রত্যাশা, আস্পৃহার সেই পরিমন্ডলে বিদ্যুতায়িত বায়ুমন্ডলে, অন্যদিনের ন্যায় অথচ অস্বাভাবিক এক আওয়াজ দরজার পিছন থেকে শোনা গেল। বাঞ্ছিত মুহূর্ত বাঁধভাঙ্গা আবেগে উপস্থিত হল। অর্ধ উন্মুত দরজার মধ্য দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে দেখা গেল। শ্রীমা নীরব দৃষ্টি দ্বারা শ্রীঅরবিন্দকে প্রথমে প্রবেশ করতে অনুরোধ করলেন। শ্রীঅরবিন্দ ইঙ্গিতে তাঁকে বেরিয়ে আসতে বললেন। শ্রীমা ধীর মহিমাময় পদক্ষেপে আগে তার পেছনে রাজনীয় ভঙ্গিমায় শ্রীঅরবিন্দ প্রবেশ কবলেন। শ্রীঅবিন্দের চেয়াবের সামনে যে টেবিলটি থাকত সেদিন সেটা সরিয়ে রাখা হয়েছিল। শ্রীমা একটা ছোট টুলে শ্রীঅরবিন্দের ডানপাশে আসন গ্রহণ করলেন। অখন্ড সজীব নীরবতা দিব্য আনন্দে পবিপ্লাবিত। ৪৫ মিনিট কাল ধ্যানমগ্ন সকলে। অতঃপর একে একে সকলে এসে মাকে প্রণাম করল। মা ও শ্রীঅরবিন্দ সকলকে আশির্বাদ কবলেন। শিষ্যরা যখন মাথা নিচু করে মাকে প্রণাম করতে এগিয়ে এল শ্রীঅরবিন্দের ডানহাত যেন মায়ের মাধ্যমে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে উত্থিত হয়েছিল। প্রণাম ও আশীর্বাদ পর্ব শেষ হলে নীরব শান্ত পরিবেশে আবার আমরা সকলে অল্পক্ষণের জন্য ধ্যানমগ্ন হলাম। নীরবে ধ্যান ও আশীর্বাদ বিতরণের মধ্যে অনেকেরই নানা অনুভূতি হয়েছিল। যখন অনুষ্ঠান শেষ হল, তাদের মনে হল যেন তারা এক দিব্য স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। যা ঘটে গেল তার মহিমাময় সৌন্দর্য ও সুরসুধা সকলে অনুভব করল। পৃথিবীর এক কোণে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিষ্য পরম প্রভু ও শ্রীমায়ের আশীর্বাদ পেলেন শুধুমাত্র তাই নয়। এই ঘটনার তাৎপর্য আরও গভীরে নিহিত ছিল। উচ্চতর চেতনা সুনিশ্চিত নেমে এসেছিল এই ধরাধামে। এক শক্তিশালী দিব্য কর্মের সূচনা সেই নীরবতায় বটবৃক্ষের ন্যায় অঙ্কুরিত হল। যুগান্তকারী এই ঘটনার তাৎপর্য নিঃশব্দে দৈব প্রেরণায় সকলের নিকট সঞ্চারিত হয়েছিল। তার অপার্থিব মহিমা সৌন্দর্যের প্রতি পদক্ষেপে ও কর্মে। সুগভীর দিব্য অনুভূতি সকলের মণিকোঠায় অমূল্য হয়ে রয়ে গেল। শ্রীঅরবিন্দ ও মা প্রস্থান করলেন। অনুপ্রাণিত দত্তা সেই নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে বলে উঠলেন- 'ভগবান আজ পার্থিব জগতে নেমে এলেন।' কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে সিদ্ধি দিবস মা যাকে বিজয় দিবস বলেছেন, তার তাৎপর্য কি? কোন আধ্যাত্মিক ঘটনার, বিশেষ করে এই প্রকার বৈশিষ্ট্যময় ঘটনার, মানসিক বিশ্লেষণ যথাযথ হওয়া সম্ভব নয়। বরং শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথায় শোনা যাক এর বিশেষত্ব।

এক পত্রে তিনি এই লেখককে জানান, ১৯২৬ সালের ২৪ শে নভেম্বর হচ্ছে সেইদিন যেদিন প্রাণস্তরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল। এই আবির্ভাব বা অবতরণ হচ্ছে ঈশ্বরের অধিমানস সত্তার অবতরণ যা অতিমানসের অবতরণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। অন্য এক শিষ্যকে জানিয়েছিলেন, ২৪ শে নভেম্বর শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবী'তে নেমে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ অতিমানসের জ্যোতি নন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের অর্থ অধিমানস ঈশ্বর পুরুষের অবতরণ। তিনি অতিমানস শক্তি বা আনন্দের অবতরণ নন কিন্তু তাঁরই পুরোধা ও পথ নির্দেশক। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আনন্দময়। তিনি অধিমানস স্তরে বিবর্তনকে বয়ে নিয়ে চলেছেন আনন্দময় অতিমানসের সম্ভাবনায়। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বলেন যে, মন ও অতিমানসের মধ্যে চেতনার আরেক মধ্যবর্তী স্তর রয়েছে। প্রত্যেকের রয়েছে পৃথক পৃথক জ্যোতি, শক্তি ও জ্ঞান ভান্ডার। আর অধিমানস হচ্ছে এরই উচ্চতম পর্যায়। তিনি বলেছেন যে, অধিমানসের পরশ ও অবতরণ ব্যতীত অতিমানসের অবতরণ সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের অর্থ হচ্ছে অধিমানসের পরিপূর্ণ প্রকাশ বা আত্মীকরণ - শ্রীঅরবিন্দের দেহচেতনায় দিব্য চেতনার অবতরণ। পূর্ববর্তী সকল সাধনার এ ছিল পরম পরিসমাপ্তি। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ক্ষেত্রে এ ছিল এক চূড়ান্ত পর্যায় এবং তাঁর যোগের লক্ষ্য- অতিমানসের অবতরণের ক্ষেত্র প্রস্তুতির সহায়ক। বাহিরের জগতে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষণা করলেন যে, তাঁকে এখন একান্তে নির্জনবাসে গভীর সাধনায় মগ্ন থাকতে হবে। তখন থেকে মা গ্রহণ করলেন সাধকমন্ডলীর দায়িত্ব- তাদের আন্তর সাধনা ও আশ্রমের সকল কাজের। এই কারণে ২৪ শে নভেম্বরকে শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের প্রতিষ্টা দিবস হিসাবে গণ্য করা হয়। শ্রীঅরবিন্দের যোগ সাধনায় তাই সংসার ত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই। যা পরিত্যাগ করা আবশ্যক, যা বর্জনীয় তা হচ্ছে অহং এবং নিম্মপ্রকৃতির আক্ষেপণ- আবেগ, ইন্দ্রিয়জ সুখানুভূতি, বিভিন্ন প্রকাসে কামনা, বাসনা, পছন্দ, অপছন্দ, দেমাক, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু যা মানুষকে এই নিম্মপ্রকৃতিতে আবদ্ধ করে রেখেছে। এই সকল ত্যাগের মাধ্যমে আসবে মানব আত্মার জাগরণ, অন্তরস্থ চৈত্যপুরুষের হবে আবির্ভাব। আর এইভাবেই বহিঃপ্রকৃতিতে মন, প্রাণ এবং শরীরের শুদ্ধিকরণ ঘটিয়ে মানুষ ভগবানের সহিত মিলিত হবে। শ্রীঅরবিন্দের যোগ সাধনার প্রাথমিক অপরিহার্য পর্যায় ব্যক্তিগত জীবনে আত্মার উপলব্ধি, তা যতই কঠিন এবং কষ্টসাধ্য হোক না কেন। দ্বিতীয় পর্যায় হল সর্বব্যাপী অসীম অনন্ত দিব্য বিশ্ব আত্মার উপলব্ধি নিজের মধ্যে সর্বমখল্বিদং ব্রহ্ম- সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন। এর পরের পর্যায় চূড়ান্ত ও পরম অতিমানস চেতনার মাধ্যমে ব্যক্তিগত আত্মা এবং বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মার উর্দ্ধে আরোহন এবং সেখান থেকে অতিমানসের শক্তিকে নামিয়ে আনা মন, প্রাণ ও দেহের স্তরে, যাতে করে সমূহ এবং সম্পূর্ণ রূপান্তর সম্ভব হবে। আমাদের এ বিষয়ে বিশদ

উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কারণ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর রচনায় মুমুক্ষু সাধকের জন্য বিস্তারিতভাবে এর বিভিন্ন স্তর, মানসিক ও অন্যবিধ সংযম আলোচনা করেছেন। তিনি এই যোগের নাম দিয়েছেন পূর্ণযোগ। পূর্ণযোগে পূর্বতন যোগসাধনার বহুবিধ উপাদান যথা- কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান মার্গের শুধু যে সমন্বয় ঘটেছে তাই নয়, এর উর্ধ্বে পূর্ণযোগের বিচরণ ক্ষেত্র। এখানে একটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া আবশ্যক। শ্রীঅরবিন্দ বারংবার আমাদেরে সাবধান ও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর যোগে কোন শর্টকার্ট বা সংক্ষিপ্ত পথ নেই। প্রাথমিক স্তরগুলি (সাধনার) অতিক্রম না করে শ্রীঅরবিন্দের যোগের চূড়ান্ত পর্যায়ের অন্বেষণ শুধু মাত্র বোকামী বা বিপজ্জনকই হবে না, তা ব্যর্থ হতেও বাধ্য। মা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে পূর্ণযোগের পথে চলতে গেলে সংকল্প হবে ভগবানের উদ্দেশ্যে পূর্ণ আত্মসমর্পনের। এটিই এক মাত্র পথ, নানাপন্থা। অতঃপর ক্রমান্বয়ে অভ্যাস (অনুশীলন), পুষ্টি এবং পঞ্চ মানসিক গুণাবলীর যথা - আন্তরিকতা, বিশ্বাস, ভক্তি, সাহস ও সহিষ্ণুতাব ঘটবে পরিপূর্ণতা। এ পথ আদৌ সহজ নয়। এইবাব আমরা শ্রীঅরবিন্দের প্রকৃত সাধনার প্রসঙ্গে আসব শ্রীঅরবিন্দ নিজের মাধ্যমে অতিমানসের আলোক ও শক্তি পার্থিব চেতনায় নামিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মানবাত্মার গভীরতম ও উচ্চতম আধ্যাত্মিক অস্পৃহার মূর্ত প্রতীক স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা, বিবর্তনের পুরোধা হিসাবে এই ভাগবতী ক্রিয়াতে ত্বরান্বিত করা। যাতে বিবর্তনের গতিপথে পরবর্তী চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘটে অতিমানসের অভিপ্রকাশ। শ্রীঅরবিন্দ অতিমানসের আখ্যা দিয়েছেন সত্য চেতনা। তিনি লিখেছেন, অতি মানসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই সত্য চেতনা (ঋৎ- চিৎ)ঃ, যা নিজের অন্তর্নিহিত স্বভাব বৈগুন্যে, আলোকে সবকিছু জানতে পারে- জ্ঞানের অন্বেষন নয়। জ্ঞানকে অধিগত করাই এর ধর্ম। আবার বলেছেন, মন হচ্ছে অজ্ঞতার যন্ত্র বিশেষ, যা জানতে চায়, অতিমানস হচ্ছে জ্ঞাতা, যা জ্ঞানকে লাভ করেছে.. এই শক্তি জঙ্গম, গতিহীন স্থানুবৎ নয়। শুধুমাত্র জ্ঞান নয় জ্ঞানের আলোকে ইচ্ছার অভিপ্রকাশ- অতিমানসের এই শক্তি সরাসরি নেমে আসবে আলোক ও সত্যের জগতে, যাতে করে সব কিছুই সমতা ও ঐক্যের আলোক বন্ধনে হবে মিলিত, অজ্ঞতার ছদ্মবেশে বা আবরণ যাবে খসে। এখানে আমাদের বলে রাখা আবশ্যক যে, মন স্বয়ং অতিমানসকে বুঝতে পারে না। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ প্রাণী তার সহজাত বোধ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কি মানব মনের গতিবিধির হদিশ পায়? অতিমানস চেতনার রাজ্য এমন এক স্তরের সন্ধান দেয় যা মনের স্তরের সম্পূর্ণ পৃথক এবং উন্নততর অবস্থান। যেমন বিবর্তনের ধারায়, মন প্রাণের চাইতে উন্নত চেতনার বিকাশ। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, অতিমানস যাত্রাপথে মনকে হতে হবে নীরব। তারপর উচ্চতর চেতনায় নিজেকে ক্রমশ

খুলে ধরতে হবে। শিষ্যরা ক্রমশ যখন জানতে পারলেন যে শ্রীঅরবিন্দ অতিমানসের অবতরণ সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে সরিয়ে নিয়েছেন তখন তাদের নানাবিধ প্রশ্ন মনে এসে জড়ো হল। ১৯৩০ সাল থেকে পরবর্তী সময় তারা শ্রীঅরবিন্দকে সকল বিষয়ে পত্রাদি লেখার অনুমতি পেল (এই সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব)। অতি মানস প্রসঙ্গে নানাবিধ প্রশ্ন শিষ্যরা শ্রীঅরবিন্দকে করতে থাকলেন। কিছু প্রশ্ন তার মধ্যে ছিল নিছক কৌতুহল প্রসূত। শ্রীঅরবিন্দ এই সব পত্রলেখকদের নিরুৎসাহ করতেন কিন্তু কখনও ভর্ৎসনা করেননি। অবশ্য যখন কোন প্রশ্ন আন্তরিকতার সঙ্গে উত্থিত হয়েছে, শ্রীঅরবিন্দ তার উত্তর দিয়েছেন। শিষ্যের বোঝবার ক্ষমতানুসারে নানাভাবে, নানা বিষয়ে। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তাঁর যোগকে কেন নতুন বলা হচ্ছে আর এই যোগ কি পূর্বে কখনও অনুশীলন করা হয়নি?

তিনি উত্তরে শিষ্যদের বলেন, তাঁরা যেন পূর্ণযোগের নূতনত্ব বা অভিনবত্বের ওপর নয়, বরং এর অন্তর্নিহিত সত্যের ওপর জোর দেন। শিষ্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এই যোগ (পূর্ণযোগ) পূর্বতন যোগ পদ্ধতির তুলনায় নতুন কারণ (১) এই যোগে জীবন ও জগৎকে ত্যাগ করে স্বর্গ বা নির্বান অন্বেষম করতে হবে না। বরং জীবন ও জীবন যাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়ে, কোন গৌণ ও অধীনস্থ নয়। একটি সুনিশ্চিত মুখ্য উদ্দেশ্য চলতে হবে। যদি পূর্বতন যোগমার্গে অবতরণ (ভাগবতী) ঘটে থাকে তা এসেছে আনুষঙ্গিক ভাবে বা আরোহনের পরিণতি হিসাবে কারণ আরোহন হচ্ছে আসল বস্তু। পূর্ণযোগে আরোহন হচ্ছে প্রথম সোপান কিন্তু অবতরণের এটি হচ্ছে উপায়। আরোহন দ্বারা অধিগত নব চেতনার অবতরণ। এই সাধনার চূড়ান্ত পরিণতি। (২) কারণ ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঈশ্বর উপলব্ধি এই যোগের লক্ষ্য নয়। বরং পার্থিক চেতনায় মহাজাগতিক ক্ষেত্রে কিছু প্রাপ্তি, উপলব্ধি এর লক্ষ্য। কিন্তু পরা প্রকৃতিগত সিদ্ধি একে বলা চলে না। আমাদের অভীপ্সা হচ্ছে চেতনার শক্তি (অতিমানস) কে পৃথ্বি প্রকৃতিতে নামিয়ে আনা, যা আজ অবধি অসংগঠিত ও নিস্ক্রিয়, আধ্যাত্মিক জীবনে তাকে সংগঠিত ও সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে অভীষ্ট। (৩) কারণ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমন এক পদ্ধতির ঘোষণা এখানে করা হয়েছে, যাতে চেতনা ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। পূর্বতন (যোগের) পদ্ধতি ও ক্রিয়া অংশত গ্রহণ করা হয়ে থাকলেও তা এক্ষেত্রে সহায়ক মাত্র ও স্বতন্ত্র। সামগ্রিকভাবে আমার প্রদর্শিত যোগের সহিত পুরাতন যোগ পদ্ধতির কোন মিল নেই। যদি তাই থাকত তবে আমাকে ত্রিশ বছর ধরে অনুসন্ধান, পথ নির্মাণ ও সৃষ্টির সন্ধানে বৃথাই সময় নষ্ট করতে হত না বরং বাঁধা সড়ক ধরে ম্যাপ মিলিয়ে প্রকাশ্য আয়াসসাধ্য পথে অনেক সহজেই। গন্তব্যে পৌঁছতে পারতাম। আমাদের যোগ পূর্বতন যোগের পদাঙ্কনুযায়ী নয় বরং বলা চলে দুঃসাহসিক এক আধ্যাত্মিক অভিযান। আবার আমাদের কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

পূর্বতন মহাপুরুষগণ, এমনকি অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণ যেখানে অতিমানস অবতরণের কোন প্রয়াস নেননি, সেখানে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে উদ্যোগী হওয়া কি ধৃষ্ঠতা বা দুঃসাহসিকতা নয়? এই প্রশ্নের সুন্দর উত্তর শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন- আমি কোন ব্যক্তিগত গরিমা বৃদ্ধির জন্য অতিমানস শক্তিকে নামিয়ে আনতে সচেষ্ট নই। জাগতিক অর্থে মহত্ব বা তুচ্ছতায় আমার কিছু যায় আসে না। আমি পার্থিব চেতনার সত্য, আলোক, সমতা ও ঐক্যের এক আন্তর শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করছি। আমি উর্দ্ধাকাশে (চিদাকাশে) একে প্রত্যক্ষ করেছি এবং একে জেনেছি আমি অনুভব করেছি উর্দ্ধ থেকে আমার চেতনায় সতত দ্যুতিময় এক অবতরণ। আমার, প্রচেষ্টা, সাধনা হল সত্তার সকল অংশকে এই চেতনায় স্থাপন করা- মানব প্রকৃতির অর্ধ আলোকিত অর্ধ অন্ধকারময় গতানুগতিকতায় স্থাপন নয়। আমি বিশ্বাস করি সত্যের এই অবতরণ দিব্য চেতনার উন্মেষ ঘটাবে এবং পার্থিব প্রকৃতির বিবর্তন হবে শেষ অধ্যায়। যদি আমার পূর্বতন মহাপুরুষগণ যদি দ্রষ্টা হিসাবে এই সকল না দেখে থাকেন তবে আমার সত্যানুভূতি ও সত্যদৃষ্টি না থাকার কোন যুক্তি হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যা করেননি, সেখানে কিছু করতে দেখলে যদি লোকে আমাকে নির্বোধ বলে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ক, খ বা আর কেউ এখানে কোন সমস্যা নয়। সমস্যা আমার আর ঈশ্বরের মাঝে, প্রশ্ন আমার এই সাধনায় ঈশ্বরের সম্মতি আছে কি নেই? আমি কি আদিষ্ট হয়েছি এই অবতরণের পথ খুলে দিতে। অন্তত সম্ভাবনার দ্বার খুলে ধরতে? লোকে আমার নিন্দা করুক, আকাশ আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়ুক আমার ধৃষ্ঠতায় আমি আমার ও সংকল্পে দৃঢ় হয় জয়, নয় মৃত্যু! এই সংকল্পে আমি অতি মানস সাধনায় ব্রতী হয়েছি, কোন মহত্ত্ব নিজের বা অপরের জন্য চাইনি। কিন্তু অন্যবিধ প্রশ্নের উদয় হয়েছিল- তিনি কিভাবে স্থির নিশ্চিত হলেন যে অতিমানসের অবতরণ ঘটবেই? শ্রীঅরবিন্দ তার উত্তরে বলেন, যদি আমরা সম্ভাব্যতায় নিছক বিশ্বাস না রেখে প্রামান্য সম্ভাবনায় আস্থাশীল হই, যদি অতিমানসের অবতরণ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত হয়ে থাকি (অবশ্য অবতরণের কোন দিনক্ষণ সঠিক বলা সম্ভব নয়) তার কারণ হচ্ছে আমার বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে- কোন আকাশ কুসুম কল্পনা নয়। আমি জানি অতিমানস অবতরণ ঘটবেই এ আমার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি প্রসূত প্রত্যয়। আর সেই সময় আসন্ন, দূরবর্তী নয়। আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা শ্রীঅরবিন্দকে দূর করতে হয়। কিছু শিষ্যের মনে এই ধারণার উদয় হয় যে, অতিমানসের অবতরণের ফলে আশ্চর্যজনক সব পরিবর্তন ঘটতে থাকবে এবং স্বর্ণযুগের দ্বার খুলে যাবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন- এইসব ধারণা অমূলক বাজে, অতিমানস অবতরণের অর্থ হচ্ছে পার্থিব চেতনায় এই শক্তি সজীব ও সক্রিয় হবে। যেমনটি চিন্তাশীল মন এবং উর্দ্ধতন মন পার্থিব চেতনায় অবস্থান করছে। অন্য আরেকটি পত্রে তিনি লেখেন, সমগ্র মানব সমাজ একবারে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আমাদের চেষ্টা হবে উর্ধ্বতর চেতনাকে

পার্থিব চেতনা নামিয়া আনা এবং এই শক্তিকে নিয়ত উপলব্ধি করা, জড়ের মধ্যে যেমন প্রাণ ও মনের অবস্থান বিদ্যমান তেমনি করে অতিমানসের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা ও রূপায়িত করা। এই সকল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে শুধুমাত্র অরবিন্দের সাধনার ভাসা ভাসা আভাস মেলে। তিনি উপলব্ধির যে সকল স্তরের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, তার সম্পর্কে খুব বেশি নিজে কিছু বলেননি। আর যদি বা বলতেন, তাও অনেকক্ষেত্রে শিষ্যদের নিকট দুর্বোধ্য হত। কয়েকটি চিঠিতে অতিমানস যোগের পথে তাঁকে কি দুরূহ সাধনা করতে হয়েছে তিনি তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এক পত্রে তিনি লিখেছেন, আমার সমগ্র জীবন কঠোর বাস্তবের সাথে সংগ্রাম করে কেটেছে- ইংল্যান্ডে দুঃখ দুর্দশা ও অনাহার থেকে নিত্য অনুসঙ্গী বিপদ, কঠিন থেকে কঠিনতর সংকট, এই পন্ডিচেরীতেও বাহিরেও অন্তর্জগতে। সব কিছুরই সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে। শৈশব থেকে আমার জীবন সংগ্রাম সংকুল এবং অদ্যাবধি তাই চলেছে- আশ্রমের উপরতলার ঘরে বসে, অধ্যাত্মশক্তির মারফত ও অন্যান্য দৃশ্যত প্রক্রিয়ায় এই যে লড়াই আজও আমি চালিয়ে যাচ্ছি তা মূলত একই চরিত্রধর্মী ও অনুরূপ। অবশ্য যেহেতু আমরা ঢাক পিটিয়ে জগৎকে এইসব বস্তু (অভিজ্ঞতা) জানাই না। তাদের পক্ষে ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে, আমি রাজকীয় আরামে খ্যাতির মহিমায়, অলস স্বপ্ন বিলাসে বাস করছি, যেখানে সংসার ও সমাজের কোন রূঢ় বাস্তবের প্রবেশ নেই। ভ্রান্তি আর কত মর্মান্তিক হতে পারে। আরেকটি মর্মস্পর্শী চিঠিতে এক শিষ্যকে তিনি লিখেছেন। কেন তাঁর ও মায়ের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল এইসব বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখীন হওয়া ও তাদের জয় করা। তিনি লিখেছেন, মা এবং আমাকে সকল পথই পরখ করতে হয়েছে। অনুসরণ করতে হয়েছে সকল মত, উলঙঘন করতে হয়েছে বিপত্তির পাহাড়। আশ্রমের মধ্যে তোমরা বা বাহিরের কেউ যা করনি। এমনি গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়েছে, যুদ্ধ করতে হয়েছে আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। অগম্য জলাভূমি, মরু, অরণ্য এবং বিরুদ্ধ জনগোষ্ঠীকে জয় করতে হয়েছে। এই কাজ আমি নিশ্চিত, আমাদের পূর্বে কাউকে করতে হয়নি। আমাদের এই কাজে (সাধনায়), যেহেতু আমাদের পথ প্রদর্শন করতে হয়েছে, ভাগবত সত্তাকে নামিয়ে আনতে, তাকে দিব্য জীবনে রূপ দিতে এবং মানব সত্তার উর্দ্ধগতিকে সার্থক করতে আমাদের বহন করতে হয়েছে পূর্ণ গুরুভার মানুষের ন্যায়, সঞ্চয় করতে হয়েছে অভিজ্ঞতা- লীলা বা খেলাচ্ছলে নয়, বরং গভীর ঐকান্তিকতায় সকল বাধা বিপত্তি ও বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করে ধীর পদক্ষেপে এই পথে চলে আমাদের সাধনা ও শ্রম সফল হয়েছে। কিন্তু এমন কোন প্রয়োজন দেখি না যে এই সকল অভিজ্ঞতা আবার সকলের জন্য পুনরায় উপস্থিত হোক। যেহেতু আমাদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি পরিপূর্ণভাবে লাভ হয়েছে, আমরা দিতে পারি পথের নির্দেশ, সহজ এবং সরল সেই পথ- যদি অবশ্য অন্যরা তা গ্রহণ করতে চায়। ২৪ শে নভেম্বর, ১৯৩৮ ভোর রাত্রি দুটো, দর্শনের সময়

আসন্ন- আকস্মিক শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ঘরে এক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হলেন। তিনি বাথরুমে যাচ্ছিলেন, ঘরের মেঝেতে বিছানো বাঘছালে পা আটকে হঠাৎ পড়ে যান এবং ডান হাঁটু বাঘের মাথায় লেগে আঘাত পায়। তিনি নিজে নিজে উঠবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু না পেরে চুপচাপ মেঝেতে শুয়ে রইলেন- মায়ের আগমনের প্রতীক্ষায়। মা নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় এক প্রচন্ড কম্পন তাঁর কাছে ধরা দিল। তাঁর মনে হল শ্রীঅরবিন্দের কিছু একটা ঘটে থাকবে। তিনি তাড়াতাড়ি শ্রীঅরবিন্দের ঘরে গিয়ে দেখেন যে শ্রীঅরবিন্দ মাটিতে পড়ে রয়েছেন। মায়ের স্বজ্ঞা বা অনুভূতি এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞানে মা অনুমান করতে পেরেছিলেন যে পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে। তিনি বিপদ সঙ্কেতের ঘন্টা বাজিয়ে দিলেন। শ্রীঅরবিন্দের স্নানের জন্য এ বি. পুরানী নিচের তলায় জল গরম করছিলেন। ছুটে এসে দেখেন মা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। মা পুরানীকে দুর্ঘটনার কথা বলে ডাক্তার ডাকতে নির্দেশ দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও শিষ্য ডাক্তার মনিলাল গুজরাট থেকে দর্শনের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে পাওয়া গেল। তিনি এসে দেখে বললেন। আশঙ্কা হচ্ছে হাড় ভেঙ্গেছে। মা পুরানীকে আরও কাউকে ডাকতে বললেন। আমি অন্য ডাক্তারদের নিয়ে যখন উপস্থিত হলাম, দেখি ডাক্তার মনিলাল তখনও শ্রীঅরবিন্দের পা পরীক্ষা করতে ব্যস্ত। মা শ্রীঅরবিন্দের পাশে বসে আস্তে আস্তে হাওয়া করছেন। আমার নিজের বিশ্বাস হয়নি আমি কি দেখছি। শ্রীঅরবিন্দ অসহায়ভাবে শায়িত মায়ের মুখমন্ডল ঘিরে রয়েছে এক দিব্য বেদনার ছায়া। আমি তাড়াতাড়ি আত্মস্থ হয়ে অন্য ডাক্তারদের সাহায্য করতে শুরু করলাম। আমার চিকিৎসকের দৃষ্টি নিয়ে আমি শ্রীঅরবিন্দের অনিন্দ্য সুন্দর স্বাস্থ্যবান দেহলক্ষ্য করতে থাকলাম- তাঁর ডান পা ভাঁজ করা, কি ঘটে গেছে না জানার চেষ্টায় মুখে বিব্রত হাসি। নগ্ন সুগঠিত বক্ষ, শ্বেতশুভ্র ধুতি, স্বর্ণবর্ণ হাঁটুর উপর গোটানো। মনে হচ্ছিল বেদের আদিত্যবর্ণ পুরুষ আমার দৃষ্টির সম্মুখে বিরাজমান। ডাক্তাররা তাঁকে পরীক্ষাকালীন তাদের কথার জবাব ছাড়া তিনি খুব কমই কথা বলছিলেন। অবশেষে ডাক্তার মনিলাল রায় দিলেন যে উরুর হাড়ে Fracture হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ নীরবে শুনলেন, কোন উত্তর বা মন্তব্য করলেন না। ইতিমধ্যে দুঘন্টা কেটে গেছে, আশ্রমে এই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। দর্শনার্থী হাজার হাজার ভক্তের আশা ও আস্পৃহা বুঝি বিফল হতে চলল। উদ্বিগ্ন চিত্তে তারা আশ্রম প্রাঙ্গণে এসে ভীড় করতে থাকলেন আর শ্রীঅরবিন্দ যাতে দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন এই প্রার্থনা জানিয়ে স্থানত্যাগ করলেন। দর্শনার্থীদের মধ্যে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কন্যা মিস্ উইলসনও ছিলেন। মিস উইলসন এই উদ্দেশ্যে সরাসরি আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছিলেন। ভাগ্যের বিধান তিনি নম্র আনুগত্যে স্বীকার করে নেন। ব্যর্থ মনোরথ দর্শনার্থীদের জন্য করুণাময়ী মা সন্ধ্যায় দর্শন দিলেন। তাঁর হাসির আলোয় ভক্তদের মনে জমা দুঃখের কালিমা দূরীভূত হল। পন্ডিচেরীতে (তৎকালে) চিকিৎসার

বিশেষ সুবিধা না থাকায়, পাশের শহর, ব্রিটিশ ভারতের কাড্ডালোর থেকে ডাক্তার রাওকে দেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ডাক্তার রাও আশ্রমের পরিচিত। তিনি ছিলেন ঐ শহরের হাসপাতালের অধ্যক্ষ। এর মধ্যে আহত পা, প্রাথমিক চিকিৎসানুসারে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ বিছানায় চুপচাপ শুয়ে আছেন। পরে আমাদের তিনি জানান যে , ঐ সময় তাঁর ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। এর আগে যে সকল কষ্ট বা যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, তার ছিল সাধারণ প্রকৃতির এবং আমি তাদের আনন্দে পরিবর্তন করেছি। কিন্তু এবার ছিল খুবই তীব্র। আর এত আচমকা এবার ঘটনাটা ঘটে গেল যে, আমি একে আনন্দে পরিণত করতে ব্যর্থ হলাম। কিন্তু যন্ত্রণা সহ্যের মধ্যে আসতেই আমি একে আয়ত্বে আনতে পেরেছিলাম। ডাক্তার রাও এসে সব শুনলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন মাদ্রাজ থেকে অস্থি বিদ্যা বিশারদ চিকিৎসক ডাক্তার নরসীমা আয়ারকে পরামর্শের জন্য ডাকা হোক। শ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ডঃ রাও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে আনতে মাদ্রাজ গেলেন। সন্ধ্যা নাগাদ ডাঃ রাও আয়ারকে নিয়ে পৌঁছালেন। তাঁরা একজন এক্সরে বিশারদকেও আনাবার ব্যবস্থা করলেন। এক্সরে প্লেটে দেখা গেল শ্রীঅরবিন্দের ডান পায়ে হাঁটুর উপরে চিড় ধরেছে। দুটো ভাঙ্গা হাড়ের টুকরো একটার পর আরেকটা চেপে বসেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে আঘাতটা ছিল মারাত্মক এবং যদি হাড় ভেঙ্গে পেছনের দিকে বেরিয়ে আসত তবে আরও খারাপ হতে পারত। ডাক্তার আয়ার বেশি নড়াচড়া করতে বারণ করলেন। পায়ে প্লাস্টার করে, টেনে রাখতে উপদেশ দিলেন। তাঁর উপদেশখ মত পায়ে প্লাস্টার করে শরীর বরাবর 'ট্র্যাকশান' দেওয়া হল। শ্রীঅরবিন্দকে এই অবস্থায় বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। ডাঃ আয়ার ভবিষ্যতের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার জন্য আবার আসতে সম্মত হলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরীক্ষা নীরিক্ষা শেষ হলে মা তাঁকে চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা জটিল প্রশ্ন সম্ভাবনা রোগের গতিবিধি এবং চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। ডাঃ আয়ার মায়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানে মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। অন্যদিকে শ্রীঅরবিন্দ নির্বাক, সকল কথাই শুনে গেলেন। মায়ের উপর সকল ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। মা যা করবার করবেন। শ্রীঅরবিন্দের এই নিস্ক্রিয় ভূমিকায় আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছিল। যিনি আমাকে (নীরদবরণ) নিয়মিত রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা উপদেশ দিয়েছেন, নিজের চিকিৎসা ব্যাপারে কেমন নীরব হয়ে রইলেন। আত্ম সমর্পনের এই ঘটনা আমার কাছে এক বিরল ও জ্বলন্ত উদহরণ হয়ে রইল। মা আমাকে শ্রীঅরবিন্দের সদা সর্বদা দেখাশুনার জন্য এক সেবর দল গঠন করতে বলেন। শ্রীঅরবিন্দের একান্ত সেবর চম্পকলাল বহুদিনের পরিচিত ভক্ত পুরানী, আশ্রমের ডাক্তার বেচারলাল এবং ডিসপেনসারীর সহায়ক নবীন সাধক মূলশংকর এই

কয়জনকে নিয়ে দল তৈরি হল। আরও একজনের প্রয়োজন। মা শ্রীঅরবিন্দের ঘরের জানালা থেকে ডাঃ সত্যেন্দ্রকে তার দন্ত -চিকিৎসালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠলেন, সত্যেন্দ্রকে দলে নাও, ডাঃ মনিলালের গুজরাট ফেরা আপাতত বন্ধ রইল। তাঁর চিকিৎসা শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান এবং মধুর ব্যবহার খুবই কাজে এসেছিল। দলের সকলের উপস্থিতি সব সময় দরকার হত না। যখন শ্রীঅরবিন্দকে পাশ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হত তখনই সকলের সাহায্য দরকার হত। অন্য সময় আমাদের কাজের মধ্যে ভাগাভাগি ছিল, অবশ্য প্রয়োজন হলে উপস্থিত থাকতে আমরা সকলে সকল সময়ই প্রস্তুত থাকতাম। এইভাবে পরিস্থিতির চাপে শ্রীঅরবিন্দের নির্জন একান্ত বাসের প্রাকার অপসারিত হল, শুরু হল তাঁর জীবনের আরেক নতুন ধারা। আমার নিজের ক্ষেত্রে, তাঁকে সেবা করার সুযোগ এসেছিল অকল্পনীয় ভাবে। সত্য কথা বলতে গেলে আমার মনে গোপন বাসনা ছিল কাছের থেকে শ্রীঅরবিন্দকে দেখা। তাঁর কথা শুনতে পারা। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ এবং সম্ভব হলে তাঁকে সেবা করা। সে সুযোগ যে এভাবে এসে যাবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আর পরবর্তী বারো বছর তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে সেবা করার যে সুযোগ আমি পেয়েছিলাম তাও ছিল আমার স্বপ্নাতীত। এই সময়ের কথা আমি (নীরদবরণ) বিশদভাবে আমার শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বারো বছর গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। আমরা সেইসব ঘটনার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করব। ২৪ শে নভেম্বর (১৯৩৮) এর আকস্মিক দুর্ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের বিষয় আমরা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হব। শ্রীঅরবিন্দকে পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, বিরুদ্ধ শক্তিরা দর্শনের ন্যায় অন্যান্য সময়ে মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চেয়েছে। কিন্তু আমি তাদের সে চেষ্টা সফল হতে দিইনি। যখন আমার পায়ের উপর দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে গেল তখন আমি বিশেষভাবে মাকে রক্ষার ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলাম। নিজের কথা ভুলে ছিলাম। আমি ভাবতে পারিনি যে বিরূপ শক্তিরা আমাকে আঘাত করবে। আমার এই ভুল হয়েছিল। বিরুদ্ধ শক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, এই সকল বিরুদ্ধ শক্তির অস্তিত্ব আছে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এশিয়া মহাদেশে বেদ, জোরো আস্তার, মিশর ও কাবালা প্রদেশের মরমী সাধনায় এবং ইউরোপেও এই সকল শক্তির পরিচয় জ্ঞাত ছিল। যতদিন লোক সাধারণ বুদ্ধির স্তরে ও ধারণা ভাবনার মধ্যে থাকে ততদিন এই সকল শক্তির কোন ক্রিয়া অনুভব করা যায় না। কিন্তু যখনই কেউ অন্তরের দৃষ্টিতে দেখতে পায় তখন অন্যরকম ঘটে। অনুভব ও উপলব্ধি করা যায় যে, সবই চলেছে শক্তির খেলা- প্রকৃতির শক্তি, দৈহিক এবং মনস্তাত্বিক শক্তি আমাদের স্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে- এই সকল শক্তি সচেতন অথবা পেছন থেকে সচেতন কোন শক্তি প্রভাবে চালিত হচ্ছে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, নিম্ন প্রকৃতি হচ্ছে অজ্ঞ এবং ঈশ্বর-বিহীন। তবে নিজের থেকে এরা সত্য ও

আলোকের বিরুদ্ধবাদী নয়। বিরুদ্ধ শক্তিরা শুধুমাত্র ঈশ্বরবিহীন নয়, এরা হচ্ছে ভাগবত বিরোধী। এরা নিম্ন প্রকৃতিকে ব্যবহার করে একে বিপথগামী করে বিকৃত করে এর গতিবিধিকে এবং এইভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে। সম্পূর্ণ বা অংশত নিজের কবলে নিয়ে আসতে সচেষ্ট থাকে। এই সকল বিষয় গূঢ় জগতে ঘটে থাকে, যা সাধারণত বোঝা কষ্টসাধ্য। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এইসব বিরুদ্ধ শক্তি, তাদের প্রকৃতি, আচরণ ও গতিবিধি যাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলেছে বা যারা এদের কষ্টকর সংস্পর্শে এসেছে, তারা চিনতে ভুল করে না। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পার্থিব পরিস্থিতি এই সময়ে অশুভ শক্তিসমূহের অনুকূলে ছিল। ভূয়োদর্শী পর্যবেক্ষকগণ দেখতে পেয়েছিলেন এবং সাবধান বানীও করেছিলেন যে, ত্রিশ দশক থেকে পৃথিবী এক অভূতপূর্ব যুদ্ধের মুখোমুখি হতে চলেছে। মুসোলিনী ও হিটলারের অভ্যুদয়। গণতান্ত্রিক শক্তিবৃন্দের এই স্বৈরতন্ত্রকে বশীভূত করতে ব্যর্থতা, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, রাশিয়ার বিভ্রান্তিকর ভূমিকা এবং স্টালিনের নৃশংস শুদ্ধিকরণ, এইসব কিছুই আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল। বিশেষ করে ১৯৩৮ সাল ছিল রাজনৈতিক সংকটের শিখরে আসীন। আর তার চরম পরিণতি ঘটে গেল সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) মাসে হিটলার কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমনে। শেষমুহূর্তে তড়িঘড়ি করে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের দৌত্যে হিটলারের সঙ্গে একটা আপোস মীমাংসা হল মিউনিক চুক্তিতে ১৯৩৮ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর। যুদ্ধ কোন ক্রমে এড়ানো গেলেও কেউই নিশ্চিত ছিল না এই শান্তি কতদিন স্থায়ী হবে। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে, মিউনিক চুক্তির পরে। মা তাঁর ছেলে আঁদ্রেকে এক চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে যবনিকার অন্তরালে যে সকল শক্তি ক্রিয়াশীল তার উপর মা আলোকপাত করেছিলেন। তিনি লেখেন, বর্তমান ঘটনাবলী সম্পর্কে তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছিলে, এটা কি একটা বিপজ্জনক ধাপ্পা হল না, অথবা ধ্বংস ও সমূহ বিনষ্টির হাত থেকে কোন ক্রমে বেঁচে যাওয়া হল? এই দুটো ব্যাপারই যদি দেখা যায় তবে সত্যের কাছাকাছি আসা যাবে। হিটলার ঠিকই ধাপ্পা দিয়েছে। যদি মনে কর চিৎকার, চেঁচামেচি করে, ভয় দেখিয়ে যতটা পাওয়া যায় আলোচনার টেবিলে ততখানি আদায় করা তবে ধাপ্পা ছাড়া তাকে কি বলা যাবে? কৌশল, কূটনীতি সবই প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু মানুষী ইচ্ছার পেছনে এমন এক শক্তি ক্রিয়াশীল যার জনক মানুষ নিজে নয়। সেই শক্তি সচেতনভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে কাজ করে চলে। এই শক্তির ক্রিয়া খুবই জটিল এবং সাধারণত মনুষ্যবুদ্ধির ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু বিচার ও আলোচনার জন্য এই শক্তিকে দুটি বিরুদ্ধধর্মী প্রবণতায় ভাগ করা সম্ভব। একটি হচ্ছে পৃথিবীর উপর ভাগবতী কর্মের প্রক্রিয়া। অন্যটি যা এর বিরুদ্ধাচরণ করে। প্রথমটির অধীনে সচেতন আজ্ঞাবাহীর অস্তিত্ব রয়েছে। একথা সত্য যে, এ ব্যাপারে গুণগত উৎকর্ষ সংখ্যাধিক্যতাকে বহুগুনে ছাড়িয়ে যায়। অপরদিকে ঈশ্বর বিরুদ্ধ শক্তি অনেককেই প্রভাবিত ক রতে পারে। তাদের ইচ্ছাশক্তিকে দাসানুরূপে আদেশ করে

এবং ব্যক্তিকে তার অজ্ঞাতসারে বশংবদ পুতুলের ন্যায় ব্যবহারও করতে পারে। হিটলার এই বিরুদ্ধ শক্তির হাতে পুতুল, যার মাধ্যমে উৎপীড়ন, অভ্যুত্থান এবং যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে। এই বিরুদ্ধ শক্তি জানে এইভাবে তারা ভাগবতী শক্তির কর্মধারা ব্যাহত এবং পিছিয়ে দিতে সক্ষম। কোন শাসকবৃন্দ সচেতনভাবে যুদ্ধ না চাইলেও বিনষ্টির শেষ পর্যায়ে পরিস্থিতি চলে গিয়েছিল। যে কোন প্রকারেই হোক অন্তত কিছুদিনের জন্য যুদ্ধকে এড়ানো গেছে। বস্তুত এই বিরতি ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল কিন্তু এর ফলে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সমর সজ্জা প্রস্তুতিতে প্রয়োজনীয় সময় পেয়ে যায়। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করল। দানবিক শক্তি হিটলারের মাধ্যমে এইভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা করে। এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর আমূল পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক সমাবর্তনে শ্রীঅরবিন্দকে জাতীয় মানবতা পুরস্কারে সম্মানিত করেন। উপাচার্য ডাঃ সি আর রেড্ডি তাঁর ভাষণে শ্রীঅরবিন্দকে যুগন্ধর প্রতিভা ভূষিত করে বলেছিলেন, তিনি শুধু জাতীয় জীবনের বীর যোদ্ধা নন, তিনি হচ্ছেন দেশ ও কালের গন্ডি ছাড়িয়ে মানব মুক্তির প্রতীক তিনি সনাতন পুরুষ, আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁর চিরন্তন অবস্থান। তিনি কবি, নাট্যকার, দার্শনিক, সমালোচক, বেদ ও গীতার ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকার। ভারতের শ্বাশত সত্যের প্রতিভূ। তিনি এসবের উর্ধ্বেও, মহান 'ঋষি' তিনি, যিনি বিশ্বাত্মাকে নিজের মধ্যে জেনেছেন এবং তার আলোকের গভীরে প্রবেশ করে বিশ্ববাসীকে পথ দেখিয়েছেন। ডঃ রেড্ডি স্বয়ং এই সম্মান অর্পন করতে পন্ডিচেরী এসেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎলাভও তিনি করেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীঅরবিন্দ এক বাণী পাঠিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় জীবনের ভিত্তি হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এই হচ্ছে তার স্বভাব ও স্বধর্ম। তিনি আরও বলেন যে, কিছু প্রলুব্ধকর পন্থায় ভারতও অন্যান্য জাতির ন্যায় শিল্প, বাণিজ্যে উন্নতি করতে পারে। সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে শক্তি সঞ্চয় করে সামরিক শক্তিতে শক্তিমান হতে পারে, কূটনীতিক শক্তিমত্তার প্রভাবে সাফল্য অর্জন করে নিজের স্বার্থ ও অধিকার সংহত করতে পারে। এমনকি বিশ্বের একাংশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতেও পারে কিন্তু আপাত চাকচিক্যময় উন্নতিতে স্বধর্ম নষ্ট হবে এবং তার আত্মার বিনাশ ঘটবে। প্রাচীন ভারতবর্ষ ও তার আত্মার সমূহ বিনষ্টি ঘটবে। আর আমরা আরেকটি জাতিগোষ্ঠী তার জায়গায় পাব। পৃথিবী বা আমাদের কারোর পক্ষে কোন সত্যকারের লাভ তাতে হবে না। এ ঘটতে পারে না কিন্তু সেই বিপদ যে একেবারে নেই তা বলা যায় না। অবশ্য দেশের সামনে অনেক জটিল সমস্যা আজ উপস্থিত হয়েছে বা হবে। আমরা তা কাটিয়ে উঠতে পারব, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যেন নিজেদের প্রতারিত না করি এই সত্যকে অস্বীকার করে যে দীর্ঘকাল পরবশ্যতা ও তৎজনিত অবসাদ ও দুর্বলতা দূর করে অন্তর ও বাহির উভয়বিধ মুক্তি ও পরিবর্তন ও

উন্নতি সাধনের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রকৃত ভাগ্য নির্ধারিত হবে। এই বাক্য গুলি আমাদের ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে। দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, হয়েছে অনেকাংশে বাহ্যিক প্রগতি কিন্তু আন্তর প্রগতি, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রগতির প্রয়োজন রয়েছে অনেক বেশি করে। ১৯৪৯ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী শ্রীমায়ের ৭১ তম জন্মদিনে দুটি নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হল। একটি ছিল বম্বে থেকে প্রকাশিত সাংস্কৃতিক ও অর্ধ রাজনৈতিক পাক্ষিক মাদার ইন্ডিয়া পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের অন্তরঙ্গ শিষ্য প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক কে ডি সেঠনা বা অমল কিরন। তাঁর লেখা ছিল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ। সম্পাদকীয় রচনাগুলির পিছনে শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ প্রেরণা থাকত। এই পত্রিকায় স্তালিনবাদী রাশিয়ার আগ্রাসী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের সাবধান বাণী প্রকাশিত হয়েছিল। বিপদ সঙ্কেত ঘোষণা করা হয়েছিল কম্যুনিস্ট চীনের তিব্বত অধিকারে। ভারতের আসন্ন বিপদে যা সত্য হল, ১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণে। কিন্তু অতীতের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের সাবধান বানী ক'জনই বা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্য প্রধান প্রকাশনাটি হল আশ্রমের শারীর শিক্ষণ বিভাগ পরিচালিত ইংরাজী ফরাসি এবং হিন্দি ভাষায় একত্রে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক বুলেটিন অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন। শ্রীমায়ের অনুরোধক্রমে শ্রীঅরবিন্দ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় একটি বিশেষ বাণী পাঠান। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে তিনি (1) The perfection of the Body. (2) The Divine Body. (3) The Supermind and the life Divine (4) Supermind and Humanity (5) Supermind in the Evolution (6) Mind of Light (7) Supermind and Mind of light. এই সাতটি নিবন্ধ উপহার দেন। শেষেরটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫০ এর নভেম্বর সংখ্যায় এই সকল নিবন্ধ শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী সংকলন গ্রন্থের ১৬শ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই নিবন্ধগুলি শ্রীঅরবিন্দের গদ্যরচনার শেষ পর্যায়ের। এর নামকরণ থেকে পাঠক জানতে পারবেন যে, শুধুমাত্র দৈহিক সম্পূর্ণতাই এর আদর্শ বা লক্ষ্য নয়, একে ছাড়িয়ে অতিমানসের গতি প্রকৃতি ও অভিপ্রকাশ হচ্ছে আলোচ্য বিষয়। এই রচনাসমূহের পূর্বেকার রচনা থেকে অনেক বেশি সুস্পষ্টভাবে অতিমানস বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ ব্যাখা করেছেন ,দৈহিক সুষম বা পূর্ণতা বিষয়ে শ্রী অরবিন্দ জনৈক শিষ্যকে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এক পত্রে জানান যে, দেহের উপর আমি গুরুত্ব দিই কারণ এই দেহ হচ্ছে ধর্ম সাধনার যন্ত্রবিশেষ অথবা পূর্ণতর অর্থে ব্যক্তিত্ব অভিপ্রকাশের ক্রিয়াশীল কেন্দ্রবিশেষ। আধ্যাত্মিক জীবন এবং পৃথিবীতে জীবনের সকল কার্যকলাপের ভিত্তিভূমি হচ্ছে দেহ। আমার নিজের কাছে দেহ মন এবং প্রাণ সব মিলিয়ে দিব্য অখন্ডতারই অংশ বিশেষ। আধ্যাত্মিকতার রকমফের মাত্র। সুতরাং দেহকে হেয় বা পরিত্যাগ করা উচিত নয় এই অজুহাতে যে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা প্রয়োজনে দেহ

প্রতিবন্ধক। জড় প্রচ্ছন্নভাবে আত্মারই এক রূপ। এই রূপে তাকে চিনতে হবে। চেতনার স্তরে তাকে জাগ্রত করতে হবে এবং তার অন্তস্থ দিব্যসত্তাকে উপলব্ধি করাই হবে কাজ। আমার মতে দেহ, মন এবং প্রাণ। সমগ্র সত্তাকে আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত করতে হবে অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে দিব্য (জীবন) সন্ধানে যোগ্য যন্ত্র বা আধার রূপে গড়ে তুলতে হবে। এর মানে এই নয় যে, দেহকে বিশেষ কোন আলাদা মূল্য বা গুরুত্ব দেওয়া অথবা আগামী বিবর্তনের পথে দিব্য দেহই হবে লক্ষ্য। উপায় নয় এই গুরুতর ভুল যেন আমরা না করি। ১৯৫০ সালের ৯ই জুলাই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর প্রাক্তন ছাত্র বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবক্তা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মন্ডলের সদস্য কে এম মুন্সিকে এক সাক্ষাৎকার দেন। এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে মুন্সিজী লেখেন, প্রায় ৪০ বছর পর ১৯৫০ সালে আমি যখন শ্রীঅরবিন্দকে দেখি, দেখলাম আমার সামনে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত এক সত্তা, আনন্দময়, ঐশ্বরিক প্রশান্তিময় এক পরিবেশে আসীন ব্যক্তিত্ব। তিনি মৃদু স্পষ্ট ভাষায় যা বললেন আমার হৃদয় যেন আন্দোলিত হয়ে উঠল। আমি আমার আধ্যাত্মিক আকূতি তাঁকে নিবেদন করলাম। ঋষি উত্তরে বললেন, আমি তোমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলাম যে আমার সহায়তা তুমি পাবে। আর বলতে গেলে, আমি তোমাকে আমার মত সাহায্য করে চলেছি। আমি তোমার আত্মিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখব। তারপর আমাদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হল। আমি বলেছিলাম, আজ কালকার যুবকদের ভারতীয় জীবন বোধ, মতবাদ ও বিশ্বাস বিরোধী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। গুরু বললেন, তোমাদের এই বিশ্বাসহীনতাকে জয় করতে হবে। তুমি নিশ্চিত থাকতে পার আমাদের সংস্কৃতি নষ্ট হওয়ার নয়। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ সাময়িক। আমরা এবারে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেব যা শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধানার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে আছে, তা হল শ্রীঅরবিন্দ রচিত মহাকাব্য 'সাবিত্রী' মহাসমুদ্রের ন্যায় তার বিস্তার, বস্তুত অক্ষয় তার বক্তব্য। আমরা তারই অবতরনিকা এখানে তুলে ধরছি। সম্ভবত বরোদায় প্রথম শ্রীঅরবিন্দ মহাভারতের বিখ্যাত কাহিনী সাবিত্রী ও সত্যবানকে অবলম্বন করে এক দীর্ঘ কবিতা রচনার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সব চাইতে পুরানো পান্ডুলিপি যা আমরা পেয়েছি তা হচ্ছে ১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে রচিত। এর নামকরণ হয় এ টেলি এন্ড এ ভিসন। অন্যান্য জরুরি কাজের ভীড়ে শ্রীঅরবিন্দ যখনই সময় পেতেন তখনই এই কবিতা নিয়ে বসতেন। কবিতাটি প্রাথমিক পর্যায়ে টাইপ করা পঞ্চাশ পাতার বেশি ছিল না। আর অন্তিম পর্যায়ে মহাকাব্যটি ২৪০০০ পংক্তি হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীঅরবিন্দ যতক্ষণ না সন্তুষ্ট হয়েছেন ততক্ষণ চলেছে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বর্জন ও সংযোজন। এমনকি মাঝে মাঝে সমগ্র অংশবিশেষ ঢেলে সাজানো হয়েছে। তাঁর নিজের কথায় শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য ছিল পরিপূর্ণ পূর্ণতা। বারবার এই লেখক (নীরদবরণ) হতচকিত বিষয়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে। এই কার্যে শ্রীঅরবিন্দের নিরলস ধৈর্য এবং ঈশ্বর সুলভ পরিশ্রম

লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে আমাদের প্রাচীন মহিমময় মন্দিরের ন্যায় অথবা গথিক স্থাপত্য শৈলীর গির্জার ন্যায় সাবিত্রী কাব্যের সুবিপুল সৌধ গড়ে উঠেছে। শ্রীঅরবিন্দের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একাধিকবার অপ্রত্যাশিত এমন ঘটনা ঘটেছে, যেন স্ব-ইচ্ছায় উপস্থিত হয়েছে। এমন বলা যায়, তাঁর জীবন চক্রের উর্দ্ধগতিতে প্রত্যেক ক্রান্তিলগ্নে এমনটি ঘটতে দেখা গেছে। আমরা দেখেছি, তাঁর জীবনের উর্দ্ধগতি আই সি এস এর আকর্ষণীয় চাকুরী বর্জন করে বরোদা রাজ্য সরকারের তুচ্ছ চাকুরী গ্রহণে কেমন করে নিম্নগতি লাভ করেছে। পরবর্তীকালে বরোদা রাজ্য সরকারের চাকুরীতে উন্নতি ও বরোদা কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষপদ প্রাপ্তির ন্যায় উচ্চতা থেকে তিনি আবার নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতা পরিত্যাগ করেছেন সহজেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি অনেককাল অন্তরালে কাজ করেছেন। আবার যখন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে রাজনৈতিক গগনে উদিত হলেন। সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হল। তখনি কারাগারেব অন্ধকারে তাঁর দীপ্তি আবরিত হয়েছে। এই কারাগারেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁব জীবনের অন্যতম প্রধান আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কারাগারের বাইরে তিনি যখন এলেন, দেশবাসী তাঁকে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব পদে বরণ করতে উদ্যত, তখন তিনি রাজনীতি থেকে চিরতরে সরে আসেন পন্ডিচেরীর অজ্ঞাত আশ্রয়ে। আবার ১৯২৬ সালে যখন তাঁর সাধনার, বল যায়, সুনিশ্চিত বিজয় ঘটল। তিনি নিজেকে তাঁর অন্তরঙ্গ অনুচরদের হতাশ করে সম্পূর্ণ নির্জনতায় গুটিয়ে নিলেন। আর এখন যখন অন্তিম বিজয়ের পর্ব-দেহাধারে অতিমানসের অবতরণ। তখনি অযাচিতভাবে নেমে এল সংগোপনে মহত্তম অবলুপ্তি। মানবের অজ্ঞাতসারেই ঈশ্বর তাঁদের চালনা করে চলেছেন। শ্রীঅরবিন্দও অন্তরাল থেকে কাজ করতে মনস্থ করলেন। তাঁর মহত্তম সাফল্যগুলি এসেছিল নির্জনবাসের গোপন নীরবতায়। প্রত্যেক বারই তিনি নামিয়ে এসেছেন উর্দ্ধের আলো ঔজ্জ্বল্যের বিস্তৃততর বর্ণালী এবং জ্ঞানও শক্তির সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য। ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর, ভোর রাত ১.২৬ মিনিট শ্রীঅরবিন্দ এই মরদেহ ত্যাগ করলেন। আমরা এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত যে তিনি মৃত্যুর নিকট পরাজয় স্বীকার করেননি; কারণ তাঁর এবং তাঁর মত অন্যান্য মহান যোগীদের মৃত্যু ঘটে স্ব-ইচ্ছায়- ইচ্ছামৃত্যু। শ্রীমা আমাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন, আমাদের প্রভুর এই আত্মোৎসর্গ আমাদের জন্যই মৃত্যু তাঁকে বাধ্য করেনি। তবু তিনি যে কোন দেহত্যাগ করলেন তা বুঝতে সাধারণ বুদ্ধি ব্যর্থ। বস্তুত আমাদের সীমিত বুদ্ধি দ্বারা এই চরম আত্মত্যাগ বুঝে ওঠা সম্ভব নয় তাঁর দেহ লাল সোনালী বর্ণে দীপ্তি পেতে থাকল। শক্তি প্রশান্তি ও আনন্দ তাঁর ঘরে বিরাজ করছিল। বহুতর সংখ্যায় দর্শনার্থী বিমূঢ় বিস্ময়ে এই ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। তাঁর অবিকৃত দেহ পাঁচদিন রাখা হয়েছিল। ৯ই ডিসেম্বর, বিকাল পাঁচটায় তাঁর মরদেহ সেবা বৃক্ষের শীতল ছায়ায় আশ্রম প্রাঙ্গনে সমাধিস্থ করা হল। সমাধির দুই পার্শ্বে মার এই

বাণী ফরাসি ও ইংরাজী ভাষায় খোদাই করা আছে-

"জড়ের আবরণে শায়িত হে আমাদের প্রভু, আমাদের সীমাহীন কৃতজ্ঞতা তোমাকে জানাই যে তুমি আমাদের জন্য সব করে গেছ- সংগ্রাম করেছ, সহ্য করেছ, আশা হারাওনি - যে তুমি সকল ইচ্ছা, সকল প্রকাশ ও প্রস্তুতি এবং সংসিদ্ধি লাভ করেছ। তারই নিকট আমরা প্রণিপাত করি, প্রার্থনা করি যেন ক্ষণিকের তরেও আমরা না ভুলি যে আমাদের যা কিছু সব তোমারই দান।"

১৫ ই আগস্ট স্বাধীন ভারতের জন্মদিন। এদিনে ভারতে একটা যুগের শেষ হল, আরম্ভ হল নতুন যুগ। কিন্তু কেবল আমাদের জন্যেই নয়, এশিয়ার জন্যে, সমগ্র জগতের জন্যে এদিনের অর্থ রয়েছে। সে অর্থ হল নেশনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা নতুন নেশন শক্তির আবির্ভাব, অফুরন্ত যার ভবিষ্য- সম্ভাবনা, মানবজাতির রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ভবিতব্য গঠনে যার থাকবে বৃহৎ অবদান। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এ জিনিসটি নিশ্চয়ই প্রীতিকর যে, যে দিনটি আমার স্মরণীয় ছিল আমার নিজের জন্মদিন হিসাবে। আমার জীবন সাধনা যারা গ্রহণ করেছে তারাই যে দিনটির উৎসব করে এসেছে, ঠিক সেই দিনটি আজ অর্জন করেছে এক বিপুল অর্থ। অধ্যাত্মপন্থী হিসাবে এই যোগাযোগটি আমি কেবল একটা হঠাৎ যোগ বা আকস্মিক ঘটনা রূপে গ্রহণ করি না, তা হল যে কাজ নিয়ে আমার জীবন আমি শুরু করি, তাতে ভগবৎ শক্তির নির্দেশই আমার প্রতিপদ চালিয়ে নিয়েছি।

ফলত, যে সব জাগতিক আন্দোলনের পূর্ণসাফল্য আমি দেখে যেতে পারব আশা করেছি। একসময়ে যাদের মনে হত অসম্ভব স্বপ্ন বলে, আজ দেখছি তারা তাদের গন্তব্যের নিকট গিয়ে পৌঁছেছি। অন্তত তাদের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে সাফল্যের পথে উঠেছে গিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ যখন বিলাত থেকে ফিরলেন ১৮৯৩ সালে এবং বরোদা রাজ্যে চাকরি নিলেন, তখন তাঁর বয়স একুশ বৎসর। সাত বছর পরে যখন তিনি বরোদা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হলেন অর্থাৎ তাঁর বয়স যখন ২৮/২৯ বছর, তখন হঠাৎ তাঁর ইচ্ছা হল, তিনি বিয়ে করবেন। বিয়ের পদ্ধতিও অদ্ভুত, দেশের প্রথামত ঘটকালি করে নয়, সাহেবী ফ্যাশানে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে- কলকাতার একটি বিখ্যাত কাগজে। বিজ্ঞাপনের বিশেষত্ব হল, তিনি একটি হিন্দু পরিবারের মেয়ে বিয়ে করবেন হিন্দু আচার অনুসারে। হিন্দু মেয়ে উল্লেখ করার পেছনে বিশেষ কারণ আছে। প্রথমত কারণ হল, সেই সময়ে কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রবল প্রভাব। তিনি চেয়েছেন খাঁটি হিন্দু মেয়ে। হিন্দু নারী সম্বন্ধে তাঁর অতি উচ্চ ধারণা আমরা দেখতে পাই তাঁর বঙ্কিম সম্বন্ধে রচনাগুলিতে। সে গুলি লেখা হয় বিলাত থেকে সদ্য ফিরে এসে। তখন তাঁর প্রথম যৌবনে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের সুযোগ হয়েছে কিনা সন্দেহ। আর বঙ্কিমপ্রতিভার তো তিনি অসাধারণ ভক্ত, কাজেই

আমার ধারণা, তাঁর হিন্দুনারী প্রীতি অনেকাংশে বঙ্কিমের দান। বঙ্কিমের হিন্দু জীবন ও হিন্দু নারী চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, সমাজ সংস্কারকগণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত উত্তম চশমা পরে হিন্দুজীবনে কোন উৎকৃষ্ঠ অবদান দেখতে পাননি। দেখেছেন তার সস্তা জীবন প্রণালী, আর হিন্দু মেয়েদের মধ্যে তার নম্রতা, বশ্যতা বঙ্কিমের ছিল কবি দৃষ্টি। তিনি দেখেছেন হিন্দু জীবনের সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং সদাশয়তা। আর নারীর মধ্যে তার আবেগ প্রবণ অন্তর, তার অবিচল নিষ্ঠা, কোমলতা ও লাবন্য। এক কথায় তার নারী হৃদয়। প্রসঙ্গত বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ইঙ্গ বঙ্গীয়রা বাঙালী মেয়েদের প্রতি কটাক্ষ করে বলে, বাংলা বই পড়ে শুধু বাঙালি মেয়েরা। শ্লেষটি একটু সেকেলে হয়ে গেছে। ধন্য বাঙালি নারী। যাদের সুশিক্ষিত রুচি বাংলা সাহিত্যকে জিইয়ে রেখেছে। বাঙালি জাতি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ এই তাদের পুরস্কার ও অমর কীর্তি। শ্রীঅরবিন্দের বিজ্ঞাপন গিরিশচন্দ্র বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল এবং মৃণালিনীর পিতার ভূপালচন্দ্র বসুর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু সোদর প্রতিম। মৃণালিনী তখন কলকাতা ব্রাহ্ম স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। গিরিশবাবু তার অভিভাবক। তিনি ভাবলেন- মৃণালিনী শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে সব দিক দিয়ে ঠিক উপযুক্ত পাত্রী হবেন। শ্রীঅরবিন্দের খ্যাতি তখন কলকাতার উচ্চশিক্ষিত মহলে ছড়িয়ে গেছে স্বনামে এবং বংশগৌরবে। তাঁর পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ এবং মাতামহ রাজনারায়ন বসু দুজনেই অসাধারণ পুরুষ। এমন সুবর্ণ সুযোগ দুর্লভ। সুতরাং গিরিশ বোস তৎক্ষণাৎ পত্রবিনিময় আরম্ভ করলেন। শ্রীঅরবিন্দ পাত্রী দেখতে এলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় একটি মাত্র দৃষ্টিতে পাত্রীকে পছন্দ করলেন। ১৯০১ সালে একমাসের মধ্যে হিন্দুমতে বিয়ে সম্পন্ন হল। মেয়ের বয়স মাত্র পনের। গিরিশবাবু কন্যা সম্প্রদান করলেন। লর্ড সিংহ, স্যার জগদীশ বসু প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিয়েতে যোগদান করেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মাতৃবংশ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বলে কোন আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন না। বিয়ের পরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পত্নী সহ দেওঘরে মামার বাড়ী গেলেন এবং কিছুদিন বাস করার পর তাঁর ভগ্নি সরোজিনীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা তিনজনে নৈনিতাল হয়ে বরোদায় রওনা হলেন। মৃনালিনীর পিতা ভূপালচন্দ্র বসু সম্ভ্রান্ত বংশজাত। তৎকালীন বিলাত প্রত্যাগত শিক্ষিত যুবকদের অন্যতম। সরকারী কৃষিবিভাগের একজন উচ্চ কর্মচারী এবং অতি অমায়িক সদাশয় ব্যক্তি। শিলং-এ তাঁর কর্মস্থান। সুন্দর বাড়ি ফলফুল সুশোভিত বাগান দিয়ে ঘেরা। মৃনালিনী হলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা। তার বাল্য জীবন অতি মধুর। কনিষ্ঠা ভগিনী তাঁর যে ছবি এঁকেছেন তা এই রকম। স্নেহময়ী বড়দির কথা মনে পড়লে চোখের সামনে ভেসে উঠে অপূর্ব সুন্দর লাবন্য ভরা ও স্নেহমাখা একখানি মুখ। মাথাভরা কোঁকড়ানো কালো চুলের জন্য মুখখানির সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি গৌরবর্ণা ছিলেন। সেই গৌরবর্ণ থেকে যেন গোলাপী আভা বিচ্ছুরিত হত। হাত ও

পায়ের তলা সদ্যোজাত শিশুর মতো লাল টুকটুক করত। পায়ে যেন আলতা পরানো। মৃনালিনীর স্বামী সৌভাগ্য অতুলনীয়। শ্রীঅরবিন্দকে স্বামী রূপে পাওয়া দেবতার বিরাট আশীর্বাদ। কিন্তু তাঁর দাম্পত্য জীবন সাংসারিক দিক থেকে তেমনি একটি অভিশাপ। দাম্পত্য জীবন বলতে আমরা যা বুঝি এবং আমাদের মনে যে সুন্দর ছবি জাগে, তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, বরং তার বিপরীত ছবিই- যা অত্যন্ত দুঃখের ও বেদনার- বলব মহৎ দুঃখের- আমাদের চোখে ভেসে উঠে। কেবল বিয়ের অব্যবহিত পরে বরোদায় একটি বছর, কারও মতে তার বেশি - তাঁর দাম্পত্য জীবনের বসন্তকাল। একটি বছর পরে তিনি দেশে ফিরলেন। পরে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্বেও বরোদায় নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগবশত শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বিরত করলেন। হয়তো পরে একসময় তিনি গিয়ে থাকবেন এবং সেই সময়গুলো যেমন তাঁর পক্ষে তেমনি শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে অতি মধুর সম্পর্কে অতিবাহিত হয়েছে। বিশেষত শ্রীঅরবিন্দ মৃনালিনীকে তাঁর আদর্শনুযায়ী গড়ে তুলবার অবকাশ পেয়েছিলেন সেই সময়ে বরোদা থেকে মৃণালিনীকে লেখা দুতিন খানা চিঠির তারিখ দেখে আমরা বুঝতে পারি যে মৃণালিনীর একটানা স্বামী সঙ্গলাভ হয়নি। সুতরাং দাম্পত্য জীবন কথাটা নামেমাত্র সত্য। তবে এটাও যে বিধিনিয়ন্ত্রিত নয় তা কি করে বলি? শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত জীবনটাই যে অদ্ভুত। কোন ছকে তাকে ফেলা যায় না। দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে তিনি তাঁর শ্বশুরকে লিখছেন, আমার আশঙ্কা গৃহী হিসাবে আমি কখনোই বড় একটা কাজের হব না, পুত্র হিসাবে, সহোদর হিসাবে এবং স্বামী হিসাবে আমার কর্তব্যের কিছুটা অন্তত নিষ্ফল প্রয়াস আমি করেছি, কিন্তু আমার মধ্যে কিছু একটা রয়েছে যা খুবই প্রবল এবং আর সব কিছুকে তার অনুবর্তী করে রাখতে আমায় বাধ্য করে। এই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে মৃনালিনীকে বাংলাদেশে যে দু-তিন খানি চিঠি লেখেন, সেগুলো অতি মূল্যবান। ১৯০২ সালের চিঠিতে কিছু ঘরোয়া খবর পাওয়া যায়। মৃনালিনীকে বরোদায় ফিরে আসার বিষয়ে অসুবিধা জানিয়ে লিখছেন যে সেখানে তখন অত্যন্ত জলের অভাব। রাঁধুনি নেই, ঝি নেই। সরোজিনীর মুসলমান আয়ার প্রস্তাব চলবে না। এই কিছুদিন হল হিন্দু সমাজে ফিরে জাতে উঠেছি। আবার পতিত হতে চাই না। তোমায় এখানে আনবার কোন রকম সুবিধা করতে পারলেই একটা ঝি যোগাড় করবার চেষ্টা করব। এই সমস্ত কারণে তিনি প্রস্তাব করছেন মৃণালিনী যেন কিছুদিন দেওঘরে গিয়ে থাকেন এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলেন- অন্ততপক্ষে তাদের সঙ্গে যাদের আমি বিশেষ ভালবাসি। ১৯০৫ সালের বিখ্যাত চিঠিতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে লেখেন, তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত। সে বড় বিচিত্র ধরনের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়, সব বিষয়েই

ভিন্ন, অসাধারণ। হিন্দুধর্মের প্রনেতৃগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা অসামান্য চরিত্র চেষ্টা ও আশাকে বড় ভালবাসিতেন। পাগল হউক বা মহাপুরুষ হোক অসাধারণ লোককে বড় মানিতেন। কিন্তু এ সকলেতে স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দুর্দশা হয়, তাহার কি উপায় হইবে? ঋষিগণ এই উপায় ঠিক করিলেন। তাঁহার স্ত্রীজাতিকে বলিলেন, তোমরা অদ্য হইতে পতিঃ পরমো গুরুঃ এই মন্ত্রই স্ত্রীজাতির একমাত্র মন্ত্র বুঝিবে। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিনী। তিনি যে কার্য্যই স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে। উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে। তাঁহারই সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ করিবে। কার্য্য নির্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার। এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দু ধর্মের পথ ধরিবে না নতুন সভ্য ধর্মের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ, সে তোমার পূর্বজন্মার্জ্জিত কর্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল। সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচ জনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে। তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে। আমার সন্দেহ নাই তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে স্ত্রী স্বামীর শক্তি মানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের জীবন এই সঙ্কীর্ণ ও অতি হেয় আকার ধারণ করিয়াছি। তুমি এইসব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস, জগতে ভগবানের কাজ করিতে আসিয়াছি, সেই কাজ আরম্ভ করি। এই চিঠিতে তিনি তার তিনটি পাগলামির কথাও উল্লেখ করেন। প্রথম পাগলামি তাঁর স্বদেশ প্রেম,তাঁর ত্রিশকোটি ভাইবোন, তাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে, দুঃখে, কষ্টে মরিতেছি। অধিকাংশই জর্জরিত, সমস্ত দেশ তাঁর দ্বারে আশ্রিত। তাহাদেরও হিত করিতে হয়। মৃণালিনীকে এ বিষয়ে সহধর্মিনী হতে আহ্বান করেছেন। কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া যাহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা। তুমি মত দিলেই,ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বলছিলে, আমার কোন উন্নতি হল না। এই একটা উন্নতির পথ দেখাইয়া দিলাম সে পথে যাইবে কি? বেচারা মৃণালিনীর বয়স তখন বোধ হয় উনিশ। তখনই তিনি বলছেন, আমার কোন উন্নতি হল না। দ্বিতীয় পাগলামি, যে কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎদর্শন লাভ করা তিনি ১৯০৩ সালে যোগাভ্যাস শুরু করেছেন। আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিতে কোন বাধা নেই। তৃতীয় পাগলামি, স্বদেশ তাঁর কাছে জড়পদার্থ নয়, স্বদেশ স্বয়ং মা, তাঁকে ভক্তি করেন, পূজা করেন। এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করবার বল তাঁর গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, জ্ঞানের বল।

এই চিঠি তিনি শেষ করছেন এইভাবে.... তাঁর কাছে সর্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয়, আমি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সর্বদা সহায় হই, সাধনভূত হই। এটা করিবে? শ্রীঅরবিন্দ কোন কাজ উপলক্ষ্যে কলকাতায় এসেছেন ১৯০৫ সালের শেষে। তাঁর বিশেষ বন্ধু সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে আছেন, সেখান থেকে মৃণালিনীকে লিখেছেন, কোন ঠিকানায় জানা নেই। তবে নিশ্চয় কলকাতার বাইরে। আবার সেই কথা বলি- তুমি একজন সাধারণ সাংসারিক লোকের স্ত্রী হও নাই, তোমার বিশেষ ধৈর্য ও কঠোরতার দরকার। এমন সময়ও আসিতে পারে যখন একমাস কিংবা দেড়মাস নয়, ছমাস পর্যন্তও আমার কোন খবর পাইবে না। এখন থেকে একটু শক্ত হইতে শিখিতে হয়, তাহা না হইলে ভবিষ্যতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। আমি এখান থেকে শীঘ্র কাশী যাব, কাশী হইতে বরোদা গেলেই ছুটি নিয়ে আবার দেশে আসিব।...' এখন বরোদা থেকে তাঁর শেষ চিঠি। তারিখ ২রা মার্চ, ১৯০৬। তাঁর চিরতরে বরোদা ত্যাগ। তিনি লিখছেন... সোমবারে কলিকাতায় পৌঁছিব। কোথায় থাকিব জানি না। ন-মাসীব বাড়িতে থাকিবার যো নাই। একে আমি মাছমাংস ছাড়িয়া দিয়াছি, আর এই জীবনে বোধ হয় খাইব না, কিন্তু ন-মাসী তাহা শুনিবেন কেন? (পণ্ডিচেরীতে নাকি অন্তত মাছ খেয়েছেন) তারপর আমার একান্ত জায়গা না থাকিলে অসুবিধা হইবে। সকালে দেড়ঘন্টা আর সন্ধ্যাবেলা দেড়ঘন্টা একেলা বসিয়া কত কি করিতে হয়. ।(বোধহয় প্রাণায়ামের কথা বলছেন)

আসামে যেতে বলেছ, চেষ্টা করিব। (বোধহয় শিলং-এর কথা বলছেন)। কিন্তু একবার কলকাতায় পদার্পণ করিলে কেউ ছাড়ে না। হাজার কাজ হাতে আসে....।

শ্রীঅরবিন্দ নানা কাজে লিপ্ত হওয়ার দরুন, যেমন যোগাভ্যাস, গোপন বিপ্লব ইত্যাদি মৃণালিনীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হচ্ছে না যদিও বিপ্লবের কাজে তাঁকে প্রায়ই কলকাতায় যেতে হচ্ছে। কলকাতায় তাঁর নিজস্ব কোন বাসস্থানও নেই। চিঠিপত্রে তিনি মৃণালিনীকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি স্বামীর সহধর্মিনী, আবার তাঁকে স্বাধীনতাও দিচ্ছেন তাঁর পথ বেছে নেবার এবং মিষ্টি ভাষায় বোঝাচ্ছেন তিনি অসাধারণ লোকের স্ত্রী- তাঁকেও অসাধারণ হতে হবে।

আজকাল যুগধর্মের প্রভাবে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বদলে গেছে। স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করে। শ্রীঅরবিন্দও নিশ্চয় কোন পতি যে স্ত্রীর দেবতা এই ধারণা পোষণ করিতেন না। তিনি নিজের স্ত্রীর মতামত নিয়েছেন। তাঁর দোষত্রুটির জন্যে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। স্ত্রী যে শক্তি- শাস্ত্রের এই নির্দেশ তিনি অনুসরণ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে পুরুষ তার সুখসুবিধার জন্যে নারীকে ভোগের বস্তু করে রেখেছে। কাজেই তাঁর মত ও চিন্তা যত্নসহকারে অনুধাবন করতে হবে। ১৯০৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় চলে এলেন, ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হবে। মাইনে মাত্র দেড়শ

টাকা। বরোদায় মাইনে পেতেন বোধ হয় ছ'শ টাকা। কলকাতার মতো জায়গায় দেড়শ টাকায় তাঁকে সংসার চালাতে হত। মৃণালিনী হয়তো আশা করলেন এবার তাঁর স্বামীবিচ্ছেদ দূর হবে। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল। তাঁর পিতা ভূপালবাবু লিখছেন যে তিনি মৃণালিনীর বরোদায় থাকাকালীন দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। যখন শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় এলেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝড় উঠল তখন মৃণালিনীর কোন সুযোগই ছিল না তাঁর স্বামীর সঙ্গে শান্ত পারিবারিক জীবন উপভোগ করবার। তাঁর তৎকালীন জীবন কেটেছিল একটানা কষ্ট ও মানসিক উদ্বেগের মধ্যে। তিনি তা সহ্য করেছেন নীরবে ও শান্তভাবে। বেশির ভাগ সময় তিনি দেওঘরে শ্রীঅরবিন্দের মাতামহের পরিবারের সঙ্গে অথবা শিলং-এ তাঁর পিতামাতার সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর স্বামীর গ্রেপ্তারের সময় তিনি স্বামীর সঙ্গে ছিলেন এবং যে সাংঘাতিক মানসিক 'শক 'পেয়েছিলেন তার বেদনাদায়ক পরিণাম ফল দেখা দিয়েছিল তাঁর শেষ অসুখের সময় দশ বছর পরে। তিনি এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা তার সাক্ষী।

মৃণালিনী তাঁর স্বামীর রাজনৈতিক কাজে কতখানি সহযোগিতা করেছিলেন জানা নেই, কিন্তু এটা সত্যি যে তাঁর পথে মৃণালিনী কোন অন্তরায় হননি। মৃণালিনীর প্রতি শ্রীঅরবিন্দের ছিল একটি শান্ত আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসা এবং স্বামীর প্রতি মৃণালিনীর ছিল প্রশ্নাতীত আনুগত্য। শ্রীঅরবিন্দের কলকাতায় বাস মাত্র চার বছর, ১৯০৬-১৯১০ পর্যন্ত। তার মধ্যে একবার তাঁর জেল জীবন। এই তিন বছরে তাঁর জীবন কেটেছে একটি ঘূর্ণিবায়ুর মতন, ইংরেজিতে যাকে বলে হিকটিক। বাংলা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি হোতা, উদ্যক্তা এবং পুরোহিত। আবার জাতীয় দলের তথা সমস্ত ভারতবর্ষের নেতা। বন্দেমাতরম্ পত্রিকার কর্ণধার। ব্রিটিশ শক্তির আজন্ম -শত্রু। অন্যদিকে গোপন বিপ্লব ষড়যন্ত্রের তিনি অদ্বিতীয় নায়ক। ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ। উপরন্তু তিনি যোগী, যোগাভ্যাসে তাঁকে দৈনিক চার-পাঁচ ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়। এহেন বিরাট কর্মভার যাঁর স্কন্ধে, স্ত্রীর সাথে তাঁর অবসর বিনোদনের সময় কোথায়? আবার কলকাতায় তাঁর কোন স্থায়ী বাসস্থানও ছিল না। বেতনও তাঁর মাত্র দেড়শ টাকা। কাজেই মৃণালিনীকে প্রায় একাই কাটাতে হয় কলকাতায়, নয়তো দেওঘরে কিংবা শিলং-এ। আবার যখন শ্রীঅরবিন্দকে রাজনৈতিক কাজে বাইরে যেতে হয়, তখন মৃণালিনীর তত্ত্বাবধানের জন্যে কোন দলীয় যুবকের সাহায্য নিতে হয়। মৃণালিনী একবার তাঁকে জানাচ্ছেন, অমূক আর কাজ করবে না। সে বিয়ে করতে দেশে যাচ্ছে। এই হল পরিস্থিতি। আমাদের মনে রাখতে হবে সেই সময়ে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না। স্ত্রীলোকের গৃহবন্দী জীবন। একটানা দু-তিন মাস তিনি স্বামীসঙ্গ পেয়েছেন বড় জোর দু-তিনবার-বরোদায়। কলকাতায় আর দেওঘরে। সাংসারিক অসুবিধা ছাড়া ছিল দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা। কারণ শ্রীঅরবিন্দের অনিশ্চিত জীবনে তখন কি ঘটতে

পারে তার স্থিরতা ছিল না। শ্রীঅরবিন্দের কয়েকখানা চিঠিতে মৃণালিনীর মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন, তিনি ১৯০৭ সালে লিখছেন, মৃণালিনীর জীবননাট্যে তীব্র বিষাদের দৃশ্য। সময় ১৯০৮ সাল। শ্রীঅরবিন্দ মৃণালিনী ও সরোজিনী একসঙ্গে বাস করছেন গ্রে স্ট্রীটে। সেই শেষদিনের আকস্মিক ও লোমহর্ষক ঘটনাটি মৃণালিনীর ছোট বিবৃত ভাই করেছেন। মৃণালিনী তাঁকে মাঝে মাঝে ঘটনাটি বলতেন। একরাত্রে তিনি ও তাঁর স্বামী গভীর নিদ্রামগ্ন। এমন সময়ে দরজায় ঘা পড়িল। উপর্যুপরি আঘাত আসাতে তিনি ব্যস্তসন্ত্রস্তভাবে দরজা খুলিয়া দিলেন। মুহূর্তে পিস্তলধারী একজন সার্জেন্ট তাঁকে মিঃ অরবিন্দ কোথায় দেখাইয়া দিতে বলিলেন। তিনি তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। তৎসত্ত্বেও হতভম্বের মত অঙ্গুলিনির্দেশে শ্রীঅরবিন্দের শয্যা দেখাইয়া দিলেন। ঘর-বাহির তখন পুলিশে পুলিশে আচ্ছন্ন। একজন সার্জেন্ট তাঁকে পাশের ঘরে যাইতে বলিলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি পুত্তলিকাবৎ তাই করিলেন। তারপর চলিল পুলিশের উদ্দাম। বিছানাপত্র ইত্যাদি ওছনছ করিয়া ফেলিল। ইত্যবসরে মিঃ ঘোষকে পুলিশ তুলিয়া দিয়াছে। তিনি তখন একটা সাধারণ কম্বল বিছাইয়া শয্যা গ্রহণ করিতেন। শুনিলাম সার্জেন্ট বলিতেছে- তোমার ন্যায় একজন শিক্ষিত লোকের এইরূপ শয্যা ও নোংরা লোকের মত জীবনযাপন বড়ই লজ্জার কথা। মিঃ ঘোষ তৎপরতার সহিত তখনই উত্তর দিলেন, যাহা তোমাদের পক্ষে লজ্জা তাহা আমাদের কাছে গৌরবের হইতে পারে। আমাদের হিন্দুর ত্যাগীর জীবনে এই সবই প্রয়োজন। আদর্শও বটে। সাহেব কটমট করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। অবশেষে ঘরগুলি তন্নতন্ন সন্ধান করিয়া কিছুই পাইল না। আমার বাক্সটি ভাঙ্গিয়া আমাকে লিখিত মিঃ ঘোষের কয়েকখানি বাংলা ভাষার চিঠি হস্তগত করিল। তাহার পর যা ঘটিল তা আমার মতন কোমল নারীর প্রকৃতির পক্ষে সহ্যাতীত। সার্জেন্ট মিঃ ঘোষকে সঙ্গে যাইতে আদেশ করিল, প্রাতঃকৃত্য সমাপনেরও অনুমতি দিল না। তাহার পর পুলিশ যখন তাঁহার কোমরে দড়ি পরাইল, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে পুলিশের পাশ হইতে ছিনাইয়া লইবার সঙ্কল্প করিলাম। ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম কিন্তু তাঁর উপর আর যেন আস্থা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। ভগবানের অস্তিত্বই যদি থাকিবে, তবে এমন নির্দোষ পুরুষের উপর এমন বর্বর আচরণ হইবে কেন? .. আমার সকল প্রার্থনা তুচ্ছ করিয়া পুলিশদল মিঃ ঘোষকে ধরিয়া লইয়া ভ্যানে তুলিল। তাহার পর কি হইল তাহা আমার জ্ঞানের অগোচর। যখন জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম তখন দেখিলাম আমার মেসোশ্বশুর কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়িতে আমি নীত হইয়াছি। ভূপালবাবু এই প্রসঙ্গে পরে বলেন যে, মৃণালিনীকে এই ঘটনা এমন শক দিয়েছিল যে দশ বছর পরে তার শেষ অসুস্থতার সময় বিকারের ঘোরে প্রলাপের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের বিভীষিকাময় দৃশ্যটির কথা বলতেন। এখন আমরা মৃণালিনীর ছোট ভাই এর পুস্তিকা থেকে তাঁর পরবর্তী

জীবনকাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখছেন, ইহার পর মৃণালিনীর জীবনে নামিয়া আসিল অমাবস্যার এক নিরন্ধ্র অন্ধকার। একটা লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তি তাঁহার সমস্ত জীবনটাকে ছাইয়া ফেলিল। .. তাঁর মাতা তাঁর দুলালী কন্যাকে বুকে জড়াইয়া রাখিয়া তার সর্ববেদনা উপশম করিতে লাগিলেন। তাঁর জ্ঞানীগুণী দৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পিতাও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। এইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থার কথা মৃণালিনীদেবী গল্পচ্ছলে একদিন আমাকে শুনিয়েছিলেন। জ্যেঠতুতু ছোট ভাই হলেও আমি তাঁর পুত্রের বয়সিই ছিলাম। আমি তখন ভগবানকেও ডাকিতে পারিতেছিলাম না। কি করিয়া ডাকিব? আমার স্বামী ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও ভগবান বলিয়া চিনিতাম না। ভগবানের প্রকাশ আমি তাঁহার মধ্যেই প্রত্যক্ষ দেখিতাম। তিনি যখন কথা বলিতেন, তখন শুনিতাম কোন দূরাগত অশরীরী ধ্বনি যেন তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তিনি যখনই তাকাইতেন, তখন দেখিতাম কোন এক সুদূরের স্বপ্নময় চোখ দুটি জ্যোতি - উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলিয়া আমাকে অতিরিক্ত করিতেছে। এই অপার্থিব পুরুষকে যখন পুলিশ আমার জগৎ থেকে ছিনাইয়া লইয়া গেল, তখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, তাঁহার সৃঙ্গ-ছিন্ন আমার জীবনে মৃত্যুই একমাত্র পথ। কিন্তু তবুও আমার মৃত্যুবরণ হইল না। এই সময় সুধিরা আসিয়া আমাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। এরপরে আরম্ভ হল শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠানে মৃণালিনীর আনাগোনা। পরিচালিকা পরামর্শদাত্রী ছিলেন সঙ্গিনী সুধীরা বসু। সে যুগে বাংলা তথা ভারতের জনমানসে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ভারতের ত্রাতা- অবিসংবাদিত দেব-সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত। তাই সুধীরার সহিত যেদিন মৃণালিনী রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন, সেদিনের অভিজ্ঞতা সলজ্জ বিস্ময়ে তিনি বলিলেন, আমায় সে কি কুন্ঠার সম্মুখীন হইতে হইল। স্কুলে উপস্থিত হইবামাত্র শত শত বালিকা স্কুলগৃহ হইতে বাহির হইয়া আমায় প্রণাম নিবেদন করিতে লাগিল। চারিদিকে শুনিতে লাগিলাম যে মহাপুরুষ অরবিন্দের সহধর্মিনী আমাদের আর্শীর্বাদ করিতে আসিয়াছেন। পরে আমি নিস্ক্রান্ত হইয়া খানিকটা অভিমানভরে সুধীরাকে বলিলাম, তুমি জানিয়া শুনিয়া কেন আমাকে এখানে লইয়া আসিলে? সুধীরা হাসিয়া উত্তর দিলেন, তুমি যে বোন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, কোথায় তুমি আত্মগোপন করিয়া থাকিবে?

সুধীরা উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রী সারদামায়ের কাছে মৃণালিনীকে নিয়ে গেলেন। মায়ের কাছে পরিচয় করাইয়া দিয়া পথ ও মানসিক শান্তির জন্যে প্রার্থনা জানালেন। সারদামাতা সব কথা অভিনিবেশ সহকারে শুনে বললেন, চঞ্চল হইও না, মা, তোমার স্বামী শ্রীভগবানের পূর্ণ আশ্রিত পুরুষ। ঠাকুরের আশীর্বাদে তিনি সত্ত্বর নিষ্প্রাণ প্রমাণে মুক্ত হইয়া আসিবেন, তবে তিনি সংসার করিবেন না। ক্ষুদ্র আমিত্বের সংসার তাঁহার জন্য নয়। তারপর তিনি বলিলেন, সব সময়

ঠাকুরের বই পড়িবে, আর মাঝে মাঝে এখানে আসিবে। মাতা ঠাকুরানিকেআনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা দিতে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, দীক্ষার প্রয়োজন নাই। এরপরে ভূপাল বসু মৃণালিনীকে তাদের বাড়ি শিলং এ নিয়ে যান। সেখানে একটি বছর তাঁর একলা জীবন অতিবাহিত হয়। মাঝে মাঝে পিতার সঙ্গে স্বামীদর্শনে আসতেন আলিপুর জেলে। সেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সময় তাঁর মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা যেত না। ধীরস্থির হয়ে তাঁকে দেখে ফিরে যেতেন।

মৃণালিনী এই এক বছরের জীবনের একটি চিত্র পাই আমরা ইলাদেবীর একটি লেখায়। ইলাদেবী হলেন ডাঃ সত্যব্রত ও চিত্রার মা। তাঁদের বাড়ি ছিল শিলং-এ। ইলাদেবী তখন স্কুলের ছাত্রী। তাঁর ভাষ্য- তাঁকে দেখেছিলাম আমার শৈশবে সুকোমল মনের স্বচ্ছন্দ ভালবাসা নিয়ে। চরিত্রমাধুর্যে মিনুদি ছিলেন অতুলনীয়া। শিশুদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন অযাচিত স্নেহে, আর তাদের সঙ্গে খেলা করে। মিনুদির ছোট বোন আমাদের সমবয়সী। সেইজন্য তাঁর কাছে আমরা অনেক কথা জানতে পেতাম। প্রথম শুনি শ্রীঅরবিন্দের কারাবাসের সংবাদ। মিনুদির মনের বেদনার কথা ভেবে তখন থেকেই তাঁর প্রতি আমাদের এক নীরব শ্রদ্ধার ভাব জেগে রইল। শ্রীঅরবিন্দের জেলে যাওয়ার পর সবার মুখে একই আলোচনা। মহিলাদের মধ্যে আলোচনা চলে, বড় শান্ত ধীর মেয়ে মিনু, কখনো একটু অস্থিরতার প্রকাশ নেই তার মুখে। এই সময় থেকেই মিনুদিকে কোনরকম সাজসজ্জা করতে দেখিনি। পরনে চওড়া কালোপেড়ে শাড়ি, সুললিত সুগৌর তনু, ঘন কালো কোঁকড়াচুলে ঘেরা হাসি হাসি মুখ। তাঁর ঠাকুরমার সঙ্গে নিরামিষ আহার করতেন। নানারকম খাবার তৈরী করতেন উৎসাহ করে কিন্তু গুরুজনদের অনেক অনুরোধ সত্বেও সেসব স্পর্শ করতেন না। স্কুল থেকে ফিরবার সময়ে আমাদের দেখলেই মিনুদি এসে ধরে নিয়ে যেতেন মিষ্টি খাওয়াবার জন্যে।

ওঁদের বাগানবাড়ি ছিল দেখবার মতন। দেখেছি মিনুদি স্নানান্তে চুলটি মেলে দিয়ে খড়ম পরে ঘুরে ঘুরে ফুল তুলছেন। এই ফুল নিয়ে তিনি চলে যেতেন পূজার ঘরে। বড় সুন্দর করে সাজানো থাকত এই পূজার ঘরখানি। মাঝে দেওয়ালের ধার দিয়ে একটি লম্বা তক্তপোষ সাদা চাদরে সুন্দর করে ঢাকা। কালীমূর্তির বড় পট, শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদামায়ের ছবি সযত্নে রাখা, ধূপের গন্ধে পুষ্পপাত্রে সাজানো ফুলের বর্ণ-সুষমা ও সুগন্ধ। বিবেকানন্দের ছোট ছবিখানি একদিকে, আর শ্রীঅরবিন্দের ছবি ছোট তাকের উপর। মিনুদি অনেকক্ষণ এই ঘরে দরজা বন্ধ করে পূজা করতেন। তিনি বাইরে চলে এলে ঘরে গিয়ে দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের পায়ের কাছে সুন্দর করে নতুন করে ফুলের অর্ঘ্য সাজানো। ধূপ জ্বলছে পাশে। তিনি এখানে পূজা শেষ করে প্রণাম রেখে গেছেন জেনে অ-দৃষ্ট অজানিত মহামানবকে প্রণতি জানাতাম আমি।

'দুরদুরান্ত থেকে কত লোক আসত মিনুদিকে দেখতে, মা বলে তাঁর পায়ে প্রণাম জানাতে।

আগে জানতে পারলে তিনি সামনে আসতেন না। শ্রীঅরবিন্দের মুক্তির সংবাদ পেলাম স্কুলে। কি আনন্দ আমাদের। তখনই ছুটি হয়ে গেল। ছুটে গেলাম সবাই ওঁদের বাড়িতে। যখন শ্রীঅরবিন্দ পন্ডিচেরী চলে গেলেন প্রায়ই আমরা ভেবেছি মিনুদিও কেন যান না সেখানে। পরে জেনেছিলাম শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন, সুবিধা হলেই তিনি ব্যবস্থা করবেন। সম্ভবত এই প্রতীক্ষাই তাঁর জীবনের সাধনা ছিল...''

শ্রীঅরবিন্দের জীবনকাহিনী আলোচনার সময় অনেকের মনে জাগবে হয়তো তাঁর কথা যিনি একদিন তাঁর সহধর্মিনীর স্থান নিয়েছিলেন। যে মর্যাদা দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন, সেইটিই তাঁর বিশিষ্ট পরিচয়। এক বছর পরে ১৯০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিলাভ করলেন। মৃণালিনীর ছোট বোন লিখছেন, সেই খবর পেয়ে এক বছর পরে বড়দির ও সকলের প্রাণে শান্তি ফিরে এল। আমরা শিলং থেকে কলকাতায় এলাম। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মেসোমশায়ের বাড়িতে, বড়দিও তাঁর সঙ্গে রইলেন। একদিনের কথা মনে করে এখনো আনন্দে হৃদয় ভরে উঠে। শ্রীঅরবিন্দের মাসিমা আমায় বললেন, মৃণালিনী ও অরো ছাদে আছে, তাদের ডেকে আনো। আমি গিয়ে দেখলাম, তাঁরা দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছেন, বড়দির বেশ সহাস্য মুখ। আমায় দেখে তাঁরা নেমে এলেন। শ্রীঅরবিন্দ সেদিন আমাদের সঙ্গে বেশ আলাপ করলেন। তাঁর মুক্তি উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে মহা উৎসব হল। বড়দি আনন্দের সঙ্গে কাজকর্মে যোগ দেন। তাঁর জীবনে একটি বছর একরকম শান্তিতে কাটছিল কিন্তু তাঁর ভাগে সে সুখশান্তি স্থায়ী হল না। ১৯১০ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীঅরবিন্দ নিরুদ্দেশ হলেন। তখন বড়দি অন্য বাড়িতে। তাঁরা খবর জানলেন বহুদিন পরে যে শ্রীঅরবিন্দ নিরাপদে পন্ডিচেরীতে আছেন।'

মুক্তিলাভের পর ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ একটি বছর কলকাতায় কাটলেন। এই সময়ে তিনি ধর্ম ও কর্মযোগিন দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। মৃণালিনীর সঙ্গে তখন তাঁর কতখানি যোগাযোগ ছিল আমাদের জানা নেই। তবে মৃণালিনী একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর ছোট ভাই-এর কাছে। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একদিন নাকি তৎকালীন ধর্ম অফিসে যে সব কর্মী শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী ছিলেন, মহাভারতের চরিত্রসমূহের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেকের কতখানি ব্যক্তিগত সাদৃশ্য আছে তার বিশ্লেষণ হত। ঐ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে দ্বাপর যুগের শেষাংশে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ এবং মৃণালিনী উষাদেবীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তথ্যটা ইতিহাসভিত্তিক না হলেও গূঢ় বিজ্ঞান সম্মত কিনা আমরা জানি না। তবে মৃণালিনী এরকম একটি গল্প তৈরি করে বলবেন কি? এবং শ্রীঅরবিন্দ উষাহরণ নামে একটি বাংলা কাব্য লিখেছেন বলে কাহিনীটি নেহাৎ অমূলক নাও হতে পারে।

আর যদি সত্যি হয়, তাহলে বোঝা যায় যে তাঁদের সম্পর্ক শুধু এক যুগের নয়।

১৯১০-১৯১৮ সাল সুদীর্ঘ আট বৎসর কাল মৃণালিনীর কঠিন তপস্যার জীবন চলল। বাইরের দিক দিয়ে তাঁর বিবাহিত জীবনের অবসান হল বটে, কিন্তু অন্তরের বন্ধন হল আরও নিবিড়। শ্রীঅরবিন্দ নিকটে থাকাকালীন তাঁকে যা করতে বলেছিলেন কিন্তু যা তিনি করেননি বা করতে পারেননি, এই বিচ্ছেদের অন্তরাগ্নি তাঁকে সেদিকে নিয়োগ করল। প্রকৃত হিন্দু স্ত্রী তিনি, এখন স্বামীনির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ করলেন। শ্রীঅরবিন্দ ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে গভীর সাধনায় মগ্ন অতিমানস সত্যের সন্ধানে, আর মৃণালিনী অন্য প্রান্তে তাঁরই প্রদর্শিত সাধনায় নিবিষ্ট। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ ইষ্ট দেবতা।

তাঁর এই সময়ের জীবনলিপির তিনটি বৃত্তান্ত আমরা পেয়েছি একটি ভূপালবাবুর উক্তি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হল ছোট ভাই ও বোনের বিবৃতি। শেষের দুটি পরস্পর-পরিপূরক। ভূপালবাবুর উক্তি হল এই জীবনাংশের সারমর্ম। তিনি বলেছেন-

শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবার পর দুজনের আর দেখা হয়নি, তবে যারাই তাকে জানত তারাই দেখত, কী গভীর টান ছিল তার স্বামীর উপর কি আকুল আকাঙ্খা ছিল তার পন্ডিচেরীতে যাবার জন্যে। দেশান্তরের প্রথম তিনচার বছরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে আশা দিয়েছিলেন যে কোন একদিন তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসবেন। স্ত্রীর কাছে তাঁর চিঠি আসত কদাচিৎ, অবশেষে চিঠি লেখা একেবারেই বন্ধ হল। কিন্তু জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মৃণালিনী কখনও আশা ছাড়েননি।

১৯১০-১৮ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ বিচ্ছেদ সে কাটিয়েছিল মা-বাবার কাছে শিলং-এ রাঁচিতে। মাঝে মাঝে কলকাতায় এই বছরগুলো তার কেটেছে প্রায়ই ধ্যানে আর ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করে। মৃণালিনী প্রায়ই শ্রীশ্রীমার (সারদা মা) কাছে যেত, তিনি তাকে খুবই স্নেহ করতেন। ডাকতেন বউমা বলে কারণ শ্রীঅরবিন্দকে সারদাদেবী সন্তানের মত দেখতেন।

মৃণালিনী একবার রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিতে চেয়েছিল। তার বাবা প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য শ্রীঅরবিন্দকে চিঠি লিখলে তিনি উত্তরে তাকে অন্য কারো কাছে দীক্ষা না নিতে পরামর্শ দেন এবং তাকে এই আশ্বাস দেন যে তার প্রয়োজনীয় সব রকমের আধ্যাত্মিক সাহায্য তিনিই পাঠাবেন। তাই বাইরের কোন দীক্ষা না নিয়েও সে ছিল তৃপ্ত।

১৯১৮ সালে ১৭ই ডিসেম্বর ৩২ বৎসর বয়সে কলকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে মৃণালিনীর মৃত্যু হয়। তার মৃত্যু সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। বাস্তবিক পক্ষে নিয়তির বংশে যুগের একজন বিশিষ্টতম পরমশক্তিমান পুরুষের সঙ্গে তার স্বল্পপরিসর জীবনের কিছুটা অংশ

যুক্ত হওয়া ছাড়া তার জীবনে অসাধারণ কিছু ছিল না।

৩০ শে এপ্রিল মুজঃফরপুরে বোমা ফাটল। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লচাকী, দুই বিপ্লবী তরুণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে ভুলে মারল দুজন শেতাঙ্গ মহিলাকে। কলিকাতায় ম্যাজিস্ট্রেট থাকার সময় কিংসফোর্ড রাজনৈতিক আসামী তরুণ ছেলেদের ভয়ানক শাস্তি দিত। একটি ছেলেকে বেত দিয়ে মারবার হুকুম দিল। ছেলেটি বেত্রাঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল আর সাহেবটি সেই নিদারুণ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখল। সেজন্যে বিপ্লবীরা তাকে মারাবার ব্যবস্থা করে।

এই খবর টেলিগ্রামে শ্রীঅরবিন্দের কাছে এল, তিনি তখন বন্দেমাতরম অফিসে, তিনি অবশ্য এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বারীনের কাছে মানিকতলা বাগানে খবর পাঠালেন যেন সেখানকার বিপ্লবীরা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে ফেলে। তিনি চলে গেলেন নিজের বাড়িতে। ১লা মে পুলিশের জালে মানিকতলার বাগানবাড়িতে বিপ্লবীরা ধরা পড়ল। ২রা মে। শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছেন। ভোরবেলায় ইংরেজ ও দেশী পুলিশ তাঁর বাড়ি ঘেরাও করল, পুলিশ রিভলবার হাতে উঠে এল দোতলায় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করল। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অপূর্ব হাস্যরসের এই কারাকাহিনীতে এ সম্বন্ধে লিখছেন

"আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, জাগিয়া উঠিলাম। শুনিলাম.. একটি শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে... ক্রেগান (সাহেব) জিজ্ঞাসা করিলেন অরবিন্দ ঘোষ কে? ... আমি বললাম, আমিই অরবিন্দ ঘোষ। অমনি একজন পুলিশকে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন।

শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারের খবর বোমার আওয়াজের মতো দেশময় ছড়িয়ে পড়লো। সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ। কেউ বিশ্বাস করতে পারল না যে শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবীদের হত্যাকান্ডে জড়িত। ঘোরতর ধরপাকড় শুরু হল পুলিশ বিরাট জাল পেতে বাংলার বহু বিপ্লবীদের পাকড়াও করল। প্রফুল্ল চাকী নিজের গুলিতে নিজের প্রাণ নিয়ে গ্রেপ্তারের হাত এড়াল। ক্ষুদিরামে ফাঁসি হল। সরকারের আনন্দের সীমা নেই যে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে তারা গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। অরবিন্দই তো সব নষ্টের গোড়া। তাঁকে লালবাজার থানায়, পরে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হল। বিচার আরম্ভ হল ১৮ ই মে এবং পুরো এক বছর ধরে চলল। ৪২ জন আসামী, ৪০০০ দলিলপত্র, ৩০০-৪০০ অন্যান্য প্রমাণ, ২২২ জন সাক্ষী এরকম বিচার বোধহয় পৃথিবীতে এই প্রথম। মামলার খরচ চালাতে অর্থ সাহায্যের জন্য শ্রীঅরবিন্দের বোন সরোজিনী দেশের লোকের কাছে আবেদন জানালেন। ধনী গরিব যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাল। জানাল তাদের অকৃত্রিম

ভালবাসা।

জেলের অভিজ্ঞতা ঃ-

শ্রীঅরবিন্দের মতো বিদ্বান, মহৎ-চরিত্র ও উচ্চ বংশজাত সর্বজনমান্য নেতাকে যেভাবে জেলে রাখা হয় তাতে বোঝা যায় যে ইংরেজ জাতির কাছে দাস ছাড়া আমাদের আর কোন মূল্য ছিল না। শোন এই অমানুষিক ব্যবহারের ইতিহাসঃ
প্রথমে শ্রীঅরবিন্দকে রাখা হল একটি ছোট্ট সেল এ , ন' ফুট আর ছ'ফুট তার আয়তন। সেই একটি মাত্র কুঠুরিতে শোওয়া, খাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ করা। কারও সঙ্গে কথাবার্তা নিষিদ্ধ। মানুষ এই অবস্থায় একদিনে পাগল হয়ে যায়। পরে তাঁকে একটি বড় হলঘরে, অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে একত্রে রাখা হল। তিনি একটি কোণে পড়ে থাকতেন। কিন্তু এই সামান্য সুখ-সুবিধাটুকু বেশিদিন টিকল না। জেলে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই বিপ্লবীদের হাতে খুন হবার পর আবার প্রত্যেককে আলাদা আলাদা সেল এ পুরে দেওয়া হল। কেবল আদালতে বিচারের সময় ও দৈনিক বিহারের সময় তাঁরা একত্রে হতেন, কিন্তু কোন কথাবার্তা চলত না।

শ্রীঅরবিন্দ হলঘরে বা পরে একলা থাকবার সময় সর্বক্ষণ ধ্যানে ও গীতা উপনিষদ পাঠে মগ্ন থাকতেন। ছেলেদের হাসি, গোলমাল, খেলাধুলা কিছুই তাঁর সাধনার ক্ষতি করত না। শ্রীঅরবিন্দ উত্তরপাড়া ভাষণে আমরা তাঁর জেলে থাকার সময়ের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাই। তিনি বলেন- আমি যখন ধৃত হই.. কিছুক্ষণের জন্য আমার বিশ্বাস টলেছিল, কারণ ভগবানের ইচ্ছার প্রকৃত মর্ম কি তা তখন বুঝতে পারিনি... হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে ডেকে বললাম, আমার এ কি হল?... আমি দিনরাত তাঁর বাণী শোনবার অপেক্ষায় রইলাম তিনি আমায় কি বলবেন, আমায় কি করতে হবে তা জানবার জন্যে। তখন আমার স্মরণ হল, গ্রেপ্তার হবার একমাস বা আরও কিছু আগে আমার প্রতি একটি আহ্বান এসেছিল, সকল কর্ম ছেড়ে দিতে, নির্জন বাসে যেতে এবং নিজের অন্তরের মধ্যে সন্ধান করতে... আমি ছিলাম দুর্বল, সে আহ্বানে সাড়া দিতে সক্ষম হইনি। আমার কাজ ছিল আমার নিকট অতিশয় প্রিয়। .... তিনি আমায় পুনরায় বললেন, যে বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি আমার ছিল না, আমি তোমার হয়ে তা ছিন্ন করে দিয়েছি ....। তোমার জন্যে আমি অন্য কাজ ঠিক করে রেখেছি এবং তার জন্যে তোমায় আমি এখানে এনেছি... তোমাকে আমার কাজের জন্যে তৈরি করতে।' জেলের সামনে খোলা জায়গায় বেড়াবার সময় তাঁর এক নতুন এবং আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল। 'আমি জেলের দিকে তাকালাম... কিন্তু দেখলাম আমি আর জেলের উচ্চ দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নই, আমাকে ঘিরে

রয়েছে বাসুদেব। আমার সেল- এর সম্মুখবর্তী বৃক্ষের ছায়ায় আমি বেড়াতাম, কিন্তু আমি যা দেখলাম তা বৃক্ষ নয়, জানলাম তা বাসুদেব, দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ সেখানে দন্ডায়মান রয়েছেন এবং আমার উপর তাঁর ছায়া ধরে রয়েছেন। আমার 'সেল' এর দরজার গরাদের দিকে চাইলাম, আবার বাসুদেবকে দেখতে পেলাম। ন'রায়ন দাঁড়িয়ে থেকে আমার উপর পাহারা দিচ্ছেন। ... আমার পালঙ্কস্বরূপ যে মোটা কম্বল আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার উপর শুয়ে আমি উপলব্ধি করলাম শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন, সে বাহু আমার বন্ধুর, আমার প্রেমাস্পদের।' আদালতেও একই অভিজ্ঞতা চললঃ

" যখন মোকদর্মা ধরা হল... তখনও আমার সঙ্গে গেল সেই নিগূঢ় দৃষ্টি। ভগবান আমাকে বললেন, ... এখন দেখ ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে চেয়ে সরকার পক্ষের উকিলের দিকে চেয়ে। আমি দেখলাম , কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখতে পেলাম না , দেখলাম সেখানে বাসুদেবকে , দেখলাম বিচারাসনে উপরিষ্ট রয়েছেন নারায়ন। আমি সরকার পক্ষেব উকিলের দিকে তাকালাম, দেখলাম, সে তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রিয়, আমাব বন্ধু সেখানে বসে হাসছেন। তিনি বললেন, 'কেমন এখন আর তোমার ভয় আছে? আমি রয়েছি সকল মানুষেব মধ্যে, আমি তাদের সকল কর্ম, সকলকথা নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করি।

আদালতে বিচারের সময় সারাদিন তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। কোন প্রশ্নের জবাব দিতেন না। সাক্ষী কি বলছে, উকিল কি বলছে কিছুই তিনি শুনতেন না। শুনতেন কেবল অন্তরের বাণী, আমি তোমাকে কাজের জন্যে ডেকেছি, আর তুমি যে আদেশ চেয়েছ তা এই, আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি যাও, আমার কাজ কর।

অলৌকিক ঘটনা ঃ-

আরও অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা জেলে ঘটতে থাকে। দু'সপ্তাহ ধরে তিনি ধ্যানে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শুনতেন, তাঁকে দেখতেন। স্বামীজী সাধনার এক বিশেষ ক্ষেতে তাঁকে উপদেশ দিতেন। যতক্ষণ না শ্রী অববিন্দ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন, ততক্ষণ ধরে তাঁকে বোঝাতেন।

আর একটি অস্বাভাবিক ঘটনা হল, শূন্যে ওঠা যোগীদের পক্ষে এটা সাধারন অভিজ্ঞতা কারণ যোগাভ্যাসের ফলে শরীর হালকা হয়ে যায় , কাজেই শূন্যে ওঠা তেমন আশ্চর্য কিছু নয়। শ্রীঅরবিন্দ গভীর ধ্যানে মগ্ন, হঠাৎ মনে হল, এরকম সিদ্ধি কি সম্ভব? যেমনি ভাবা, তেমনি

সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর শূন্যে উঠতে থাকে, কোন চেষ্টা না করে। জেলের প্রহরী ব্যাপারটা দেখে ফেলে আর অবাক হয়ে সে তা রটিয়ে বেড়ায়। তার ফলে এক সময় ভারতবর্ষে একটা ধারণা প্রচর হয়ে যায় যে শ্রী অরবিন্দ শূন্যে অবস্থান করেন। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, দিনের পর দিন ভগবান তাঁর আশ্চর্য বিস্তৃতি সব আমায় দেখালেন। যা তিনি দেখালেন, কোন বিজ্ঞান তা ব্যাখ্য করতে পারে না।"

বিচারের রায়ের দিন ঃ-

বিচারক জজ বীচক্রফট কেম্বিজে শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ গ্রীক ও ল্যাটিনে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন, আর ইনি দ্বিতীয়। মামলায় ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ শ্রীঅরবিন্দের বন্ধু। তিনি তাঁর আইন ব্যবসা বন্ধ রেখে দিনরাত এই মামলা নিয়ে খাটতেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে ভেবেছিলেন, চিত্তরঞ্জনকে কিছু কিছু নির্দেশ দেবেন কিন্তু তাঁর অন্তরে এই বাণী ধ্বনিত হল, এই লোকটিই তোমাকে বাঁচাবে... ওসব কাগজপত্র রেখে দাও। তুমি নয়, আমিই তাকে শিখিয়ে দেব। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চিন্তে সমস্ত ভার ভগবানের হাতে তুলে দিলেন।

বিচারের শেষ দিন ৫ই মে, ১৯০৯ সাল। আদালতে সবাই স্তব্ধ, নীরব, ভয়ে ভয়ে, উৎকন্ঠায় প্রহর গুণছে। বুঝি বিচারক প্রাণদন্ডের রায় দেবেন। তখন চিত্তরঞ্জন উঠে ওজস্বিনী ভাষায় যে মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন, তার শাস্তি যেন জজ, জুরী ও সমস্ত বিচারশালাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেনঃ

'অরবিন্দের দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে, পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতি তাঁকে স্বদেশ প্রেমের কবি, জাতীয়তার নবী ও মানব-প্রেমিক বলে শ্রদ্ধা করবে। তাঁর বাণী শুধু ভারতেরই নয়, সাগর পারে দেশ-দেশান্তরে ধ্বনিত হবে। সুতরাং আমার নিবেদন এই যে, তাঁর মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তি শুধু এই আদালতের বিচারাধীন নন, তিনি দাঁড়িয়েছিলেন ইতিহাসের উচ্চ আদালতের সামনে।"
সেদিন কার বাণী উচ্চারিত হয়েছিল চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠে?
শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন। বিচারকের রায়ে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। কী উল্লাস, কী উত্তেজনা কলকাতা শহরে, সমস্ত দেশে, সকল শ্রেণীর লোকের হৃদয়ে।

মুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের চিত্তরঞ্জন নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। মহিলারা তাঁদের রাজকীয় সম্বর্ধনায় বিভূষিত করলেন, নানা অন্নব্যঞ্জনে তাঁদের আপ্যায়িত করলেন। দীর্ঘ এক বছর পরে তাঁদের কপালে এমন সুখ জুটল। চিত্তরঞ্জনের যশ দেশময় ছড়িয়ে পড়ল।

উত্তরপাড়া অভিভাষণ

মুক্তি পাবার কিছুদিন পরে ৩০ শে মে (১৯০৯) উত্তরপাড়ায় শ্রীঅরবিন্দ জগৎপ্রসিদ্ধ ওজস্বী ভাষণ দেন। তাঁর প্রতি কী সম্মান, সম্বর্ধনা, ভালবাসা। ঘোড়ার গাড়িতে তুলে তাঁকে দর্শকেরা টেনে নিয়ে যায়, সভামঞ্চ ভরে যায় রাশি রাশি ফুলের স্তূপে। প্রায় দশ হাজার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে শ্রীঅরবিন্দের জেল-জীবনের অলৌকিক কাহিনী, যা তোমরা একটু আগে পড়লে।

জেল থেকে শ্রীঅরবিন্দ যেন এক নতুন মানুষ হয়ে বেরিয়ে এলেন। একবছরব্যাপী গভীর সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন নিয়ে এল। শ্রীকৃষ্ণের বাণী, দেশের সেবা ও স্বাধীনতা লাভ ছাড়া এক বৃহত্তর ও মহত্তর লক্ষ্য তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। " আমি এই জাতিকে তুলছি.... তাদের জন্যে নয়, সমস্ত বিশ্বের জন্যে তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি যাতে তারা সমস্ত বিশ্বের সেবা করতে পারে। এই হল সেই বাণী।

জেল থেকে বের হয়ে শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন সর্বত্র ভীষণ পরিবর্তন। দেশ যেন অর্ধমৃত। বেশির ভাগ নেতা অরোভিল (উষানগরী) বা শ্রীঅরবিন্দ নগর, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে। শিক্ষার দিক দিয়ে যে উপাদান তৈরি হচ্ছে, বাস্তবক্ষেত্রে অরোভিলে হবে তার পরীক্ষা ও প্রয়োগ। এই শ্রীঅরবিন্দ নগরে নানা জাতির পঞ্চাশ হাজার মানুষ এসে পাশাপাশি বাস করবে ভাইয়ের মতন, এক দিব্যজননীর সন্তান হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। কোন হিংসা-দ্বেষ থাকবে না, নিজস্ব কোন সম্পত্তি থাকবে না, থাকবে প্রেম, আনন্দ ও ভগবানের সেবায় উৎসর্গিত জীবন। এরকম চেষ্টা পূর্বে আর কোথাও হয়নি।

অরোভিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মা কি বলছেন শোন ঃ

"অরোভিল হবে এমন একটি স্থান যেখানে সদিচ্ছাসম্পন্ন, একনিষ্ঠ, অভীপ্সাপরায়ণ সমস্ত মানুষ একত্রে স্বাধীনভাবে জগদ্বাসী হিসাবে বাস করবে।

"অরোভিলে বিরাজ করবে শান্তি, সামঞ্জস্য, মানুষের যুদ্ধলিপ্সা নিযুক্ত হবে একমাত্র তার দুঃখ, দৈন্য ও কষ্ট জয় করতে, তার অজ্ঞান ও দুর্বলতা অতিক্রম করতে। তার সঙ্কীর্ণতা ও অক্ষমতা জয় করতে.. .'

অরোভিলে মানুষে মানুষ যে সম্পর্ক, তা প্রতিষ্ঠিত হবে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব ও উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের ইচ্ছার ওপর, দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতার উপর নয়।"
এই সমস্ত বৃহৎ কাজ ছাড়া আরও অনেক কিছু আশ্রমে বেড়ে চলেছে শ্রীমায়ের দিব্যশক্তির চালনায়। কত লোক যাওয়া আসা করছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ, সাধারণ অসাধরণ সকলকে জাতিধর্ম

শ্রেণী নির্বিশেষে শ্রীমা তাঁর আশীর্বাদ, শক্তি, প্রেরণা বিতরণ করছেন। দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে শ্রীঅরবিন্দের বাণী, গঠিত হচ্ছে আশ্রম-শাখা কেন্দ্র। বিশ ত্রিশ বছর আগে বিদ্বান সমাজে যদিও বা শ্রীঅরবিন্দের নাম উচ্চারিত হত, মায়ের নাম আবদ্ধ ছিল তাঁদের শিষ্যদের মধ্যেই। আর আজ মা সামনে, তাঁর নাম সর্বত্র, কিন্তু তিনি সকলের কাছে তুলে ধরছেন শ্রীঅরবিন্দকে। মা বলেন, শ্রীঅরবিন্দকে প্রকাশ করাই তাঁর কাজ।

অচিরে জগতে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেবে। সকলে গ্রহণ করবে শ্রীঅরবিন্দকে জগদগুরুরূপে। শ্রীমা দিব্যজননীরূপে আমাদের মাঝে প্রকট হবেন। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও স্বপ্ন সফল হবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে কত বড় আত্মা নীরবে অন্তরালে নিজের কাজ সমাধা করে তেমনি নীরবে চলে গেলেন। কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। মুষ্টিমেয় লোক জানতে পারল। আমরা চিনি তাদের যারা আমাদের চোখের সামনে, কিন্তু যোগী মহাযোগীদের খবর কে রাখে? তাঁরা ভগবানের মতো নীরবে অলক্ষ্যে কাজ করে চলে যান, নাম, যশ, স্বীকৃতির কোন অপেক্ষা রাখেন না।

তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরী ভ্রমণ করলাম, দেখলাম, তৃপ্ত হলাম, ঋষি অরবিন্দ সম্পর্কে জানলাম, নানাহ তথ্য সংগ্রহ করলাম, লিখলাম, বাঙালী জাতির গর্ব, এই জাতীয় বীর সম্পর্কে লিখলাম সংগৃহীত নানা তথ্য থেকে, যাতে করে আগামী প্রজন্ম অতীতের এইসব জ্ঞানী পুরুষদের সম্পর্কে জানতে পারে, তারপর শুরু পথচলা।

কর্ণাটক আগমন

২৭-৬-২০১০ ইং রাত ১১.৩৫ মিনিটে চেপে বসলাম চেন্নাই (সেন্ট্রাল) রেলওয়ে স্টেশন থেকে ব্যাঙ্গালোরের যশোবন্তপুর স্টেশনের উদ্দেশ্যে। সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ এসে পৌঁছলাম স্টেশনে সেখান থেকে ট্যাক্সি করে এসে পৌঁছলাম ব্যাঙ্গালোর ৬২- কটনপেত মেইন রোডে, উঠলাম 'বসন্তরাজ প্যারাডাইস' নামক হোটেলে, সেখান থেকেই চেষ্টা করলাম ঘুরে ঘুরে যতটুকু সম্ভব ব্যাঙ্গালোর তথা কর্নাটক রাজ্য সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে। প্রথমদিন 'জামির' এর ট্যাক্সি নিয়ে দেখলাম, ইস্কন টেম্পল, বুল টেম্পল, টিপু -প্যালেস, লালবাগ (উদ্যান) বোটানিকাল গার্ডেন আর্টস এন্ড ক্রাফট এম্পোরিয়াম, ভিভেশ্বরাই টেকনোলোজিক্যাল মিউজিয়াম, ভেনকটপ্পা আর্ট গ্যালারী, কর্ণাটকের উচ্চ আদালত, বিধানসভা, পরের দিন ড্রাইভার হরিদাসকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথমে পৌঁছলাম শ্রীরঙ্গাপত্তনম রঙ্গনাথ স্বামী মন্দির, টিপুর দুর্গ, গম্বুজ, টিপুর গ্রীষ্মকালীন প্রসাদ মহীশুর সেন্ট ফিলোমিনা চার্চ, তারপর অপূর্ব চামুন্ডী পাহাড়, চামুন্ডী মন্দির, বুল মন্দিরক, আর্ট গ্যালারী, আলোকসজ্জায় সজ্জিত বৃন্দাবন গার্ডেন, পরদিন মাইশোর থেকে নানজুনডেশ্বরা মন্দির, বান্দীপুর ওয়াল্ড লাইফ সেঞ্চুরি, মধুমালাই ফরেস্ট, পকরা বাঁধ, কামরাজ সাগর, ওটি, বোটানিকাল গার্ডেন, লেইক ইত্যাদি। অগণিত মানুষ নীরব নিস্তব্ধ দেখেছি টিপুর সমাধির কাছে। পাশে শায়িত পিতা হায়দর আলী ও মাতা ফাতেমা বিবি। বন্ড পরিজনের সমাধি বাহিরে সমাহিত। পবিত্র স্থান, মনোরম, দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ। আরব সাগরের ৩২০ কিমি দীর্ঘ তটরেখা তথা নানা সমুদ্র সৈকত, ঐতিহাসিক দুর্গঘেরা, অতীত নগরীর আধুনিক রূপ, নিবির অরণ্যভূমি, জলপ্রপাত সব নিয়ে কর্ণাটক রাজ্যের এক বিশাল ব্যাপ্তি, সুশোভিত মন্দিররাজি, মাইসোর সোমনাথপুর এবং শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত। মাদিকোর দর্শন, হসপেটে তুঙ্গাভদ্রা বাঁধ সাজানো বাগান, ভিউ টাওয়ার, ডিয়'র পার্ক ইত্যাদি। চলুন হাম্পিতে। সেখানে আছে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কালজয়ী নানাহ নিদর্শন, দুর্গ, প্রসাদ, মন্দির ও অনেক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বাসস্ট্যান্ডের কাছেই রয়েছে বিরূপাক্ষ মন্দির। মন্দিরের মধ্যে রয়েছে রঙ্গমন্ডপের মিউজিক্যাল পিলার, পাথরের রথমন্দির, বিটঠালা মন্দিরের সামনেই রয়েছে কিংস ব্যালেন্স। এখানে পাথরের তৈরি দাঁড়িপাল্লায় রাজা বসে নিজের ওজনের সমান রত্ন, মুদ্রা যৌতুক দিতেন। প্রাসাদের মধ্যে রয়েছে রানীদের স্নানের জায়গা, মহানবমী উৎসবের স্থান মহানবমী ডিব্বা, হাজারো রামস্বামী মন্দির, লোটাস মহল, হাতির সুবিশাল আস্তাবল, হাম্পিতে প্রবেশের সময় বাঁদিকে রয়েছে বড়াভিলিঙ্গ শিবমন্দির। কাছেই রয়েছে বিশিষ্ট লক্ষী নরসিংহ মন্দির।

এছাড়া আছে বিরূপাক্ষ মন্দির। কৃষ্ণমন্দির, সায়ুভেকালু গণেশ মন্দির, কাডালেকালু গণেশ মন্দির, অচ্যুতানন্দ মন্দির, ১০৮ শিবলিঙ্গের কোটালিঙ্গ কমপ্লেক্স, মাতঙ্গ পর্বত, হেমকুট পর্বত, মাতঙ্গ পর্বতে রয়েছে সুগ্রীবের অভিষেকের স্মারক হিসেবে কোদণ্ডরামা মন্দির। অগস্ত্য তীর্থ সরোবর, দক্ষিণে কারুকার্যময় চারটি গুহা যার স্থানীয় নাম মীন বস্তি। এছাড়া ও শিবালয় মন্দির মালগ্রিটি শিবালয় মন্দির দরগা, টিপু ট্রেজারি, কামান, ভুতনাথ শিবমন্দির। বেঙ্গালুরুতে কুব্বন পার্ক মিউজিয়াম, কেঙ্গালুরু, প্রাসাদ লালবাগ দুর্গ, টিপু প্যালেস, বুল টেম্পল, উলসুর হ্রদ, ভেঙ্কটরমনস্বামী মন্দির, শ্রীনাভী গঙ্গাধারেশ্বর মন্দির, ইসকন মন্দির, আর্ট গ্যালারি, তারামন্ডল, শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা, নন্দীহিলস, টিপু সুলতানের গ্রীষ্মাবাস, টিপুর উপাসনা হল, কুম্পেজ অর্চার্ড, এবং টিপুস ড্রপ যেখানে ৬০০ মিটার উঁচু খাড়া পাহাড় থেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদিদের ফেলে দেওয়া হত। মাইশোরের প্রধান আকর্ষণ মাইশোর প্রসাদ, চামুন্ডী পাহাড়ে চামুন্ডেশ্বরী মন্দির, জগমোহন প্রসাদ, আর্ট গ্যালারি, কিলোমেনা গির্জা এবং বৃন্দাবন গার্ডেন। সোমনাথ পুরে চেন্নাকেশব মন্দির এবং শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত। তারপর মাদিকেরি বা মারকারা সেখানে আছে মান্দিকেরি দুর্গ, ওঙ্কারেশ্বর মন্দির, আরে জলপ্রপাত, কাবেরি নদীর উৎস থলকাবেরি, কাবেরি, কনিকা ও সুইজ্যোতি নদীর সঙ্গম ভাগমান্ডালা, ডুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্প, আসার পথে বিশাখাপত্তম ব্যাঙ্গালোরে থাকার সময় উর্ব্বশী সিনেমা হল যা লালবাগের বিপরীত দিকে দুপুরে বসে সিনেমা দেখা, সিনেমার নাম ছিল 'I hate love sky'.

কর্ণাটক ঃ-

কর্নাটক - ১৯২০০০ স্কোয়ার কিমি,

লোকসংখ্যা- ৫,২৭,৩৩,৯৫৮ (২০০১) জনগণনা।

রাজধানী - ব্যাঙ্গালোর (ব্যাঙ্গালুরু)

ভাষা - কানাড়া।

আকর্ষণীয়- বিধানসভা, লালবাগ উদ্যান, মাইসোর প্যালেস, বৃন্দাবন গার্ডেন, বান্দীপুর, নাগেরহোল, ন্যাশনাল পার্ক, ঐতিহাসিক হাম্পি ইত্যাদি।

জেলা - ২৯

গ্রাম - ২৯,১৯৩

বনাঞ্চল - ৩৬,৯৯১ স্কোয়ার কিমি,

লোকসভা আসন - ২৮

রাজ্যসভা আসন - ১২

বিধানসভা আসনসংখ্যা - ২২৪

ব্যাঙ্গালুর ঃ-

ব্যাঙ্গালুর - ২,২২৮ স্কোয়ার কিমি।

লোকসংখ্যা - ১৮,৭৭,৪১৬

পুরুষ - ৯, ৬১,৮৩৫

মহিলা - ৯, ১৬,০৮১

মাইসোর ঃ-

মাইসোর - ৬, ২৫৪ স্কোয়ার কিমি.

লোকসংখ্যা - ২৬,২৪,৯১১.

পুরুষ - ১৩,৩৫,৮৪১

মহিলা - ১২, ৮৯, ০৭০।

মান্দা ঃ-

মান্দা - ৪, ৯৫৮ স্কোয়ার কিমি.

লোকসংখ্যা - ১৭,৬১,৭১৮.

পুরুষ - ৮,৮৭,৩০৭

মহিলা - ৮, ৭৪, ৪১১।

'ব্যাঙ্গালোরে দর্শনীয় স্থান'

কুব্বন পার্ক, বিশ্বশ্বরা ইনডাস্ট্রিয়েল এবং টেকনোলোজিক্যাল মিউজিয়াম, লালবাগ, বিধানসভা, কর্ণাটক হাইকোর্ট, টিপুর দুর্গ, ভেঙ্কটপ্পা আর্ট গ্যালারী, বুল টেম্পল, নেহেরু প্লানেটরিয়াম ইস্কন মন্দির, রাজভবন, বেঙ্গালুরু রেডিও স্টেশন, গান্ধী ভবন, কুমারা পার্ক, উলসুর হ্রদ, বেঙ্গালুরু রেস কোর্স, গোভীপুরম গুহা মন্দির, সেন্ট মেরী বেলিসিকা চার্চ, হনুমান মন্দির, নন্দী হিলস, কোলার স্বর্ণখনি, শিবগঙ্গা, (পার্বত্য শহর), কেম্প গোওধা টাওয়ার, রবীন্দ্র কলাক্ষেত্র. এ.ডি.এ রঙ্গমন্দিরা (থিয়েটার), লর্ড শিবা ষ্টেচু (এয়ারপোর্ট রোড), আন্নাম্মা দেবী মন্দির, শঙ্কে ট্যাঙ্ক চৌডিয়া মেমোরিয়াল

হল, ব্যাঙ্গালুরু প্যালেস, চামারাবনী সাগর, দেবানাহলি, (টিপুর জন্মস্থান) হেসার গাথা (আর্টিফিসিয়াল লেইক), বেন্নারগাথথা ন্যাশনাল পার্ক, প্যালেস গ্রাউন্ড (এক্সিভিশন সেন্টার) রামানামহর্ষি আশ্রম, রগিগুদ্ধা অঞ্জনায় মন্দির র্ডে অঞ্জনায়, লর্ড শিবা, এবং লর্ড গণেশের মূর্তি, রঙ্গশঙ্করা (থিয়েটার), বনশংকরী মন্দির, আটমা দর্শন যোগা কেন্দ্র, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, ডঃ রাজকুমার সমাধি, দরগা হজরত তওয়াক্কল মস্তান, জুম্মা মসজিদ, টিপুর দুর্গ ভেঙ্কটরামনস্বামী মন্দির, কুভেমাপু কলাক্ষেত্র (থিয়েটার) শঙ্কর মঠ, শ্রী গাভী গঙ্গাধরেশ্বরা মন্দির, গথি সুব্রাম্মন্য, দেবনারায়ন দুর্গা, মুথইয়ালা মধুরা, শবনদুর্গা, কানভা হ্রদ, রামোহল্লি, মাগাদি, বসন্তপুর, ভবানী-শংকর মন্দির, সাহারাওয়ারর্দি মসজিদ, কর্নাটক ফক মিউজিয়াম, রামানা আশ্রম, মহালক্ষীপুরম হনুমান মন্দির। শ্রীধর্মরাজা মন্দির, দ্য ইষ্ট প্যারেড চার্চ, দ্য ত্রিনিটি চার্চ

মাইশোর

দর্শনীয় স্থান ঃ- মাইশোর চিড়িয়াখানা, চামরাজা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, মাইসোর প্যালেস, মাইসোর আর্টক এন্ড ক্র্যাফট এম্পোরিয়াম, রেল মিউজিয়াম, বৃন্দাবন গার্ডেন এবং কৃষ্ণসাগর ড্যাম, চামুন্ডী হিল, মহাবালা টেম্পল বরাহস্বামী টেম্পল। শ্রীলক্ষী নারায়নস্বামী টেম্পল। ত্রিনেশ্বরা টেম্প, প্রসন্নকৃষ্ণস্বামী টেম্পল, হাজার আলোর হ্রদ।

সোমনাথপুর

সেন্ট মার্কস ক্যাথড্রল ইনফ্যান্ট জেসাস, কেশব মন্দির, জগমোহন আর্ট গ্যালারি, মহাদেশ্বরা বেট্রা, ললিতা মহল প্যালেস, দোদ্দা আলাডামারা (৪০০ বছরের পুরানো গাছ)

মান্দা

দর্শনীয় স্থান - শ্রীরঙ্গপত্তনম, দরিয়া দৌলত বাগিচা, রঙ্গনাথিট্টু বার্ড সেঞ্চুরি, আদিচুনচেনাগিরি, বসারাই, মাদ্দুর, নরসিমা স্বামী মন্দির, সেলুকোট, শিবাসমুদ্রম, বরধরাজা মন্দির। এছাড়া ও যেতে নানাহ দর্শনীয় স্থান, হ্রদ, মন্দির দেখেছি, রামনগর, কোদাগু, হাসান, ম্যাঙ্গালুরুতে।

শ্রীরঙ্গপত্তনম

৯ এর দশক থেকে শ্রীরঙ্গপত্তনমের ইতিহাস শুরু, গঙ্গা শাসক যার নাম তিরুমাল্লাহ

শ্রীশ্রীরঙ্গপত্তনম মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ। পরবর্তীতে হোসলা রাজা বিষ্ণুবর্ধন ১১০৮-১১৫২ রাজত্বকাল। তিনি ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাজা,দেবরায়- দ্বিতীয়কে মাটির দুর্গ বানাতে অনুমতি দেন। বিজয়নগরের পতন ঘটে-১৫৬৫ খ্রীঃ ওদেয়ারর্স, শ্রীরঙ্গপত্তনম রাজত্ব করে ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০ বৎসর। হায়দর আলি, ফতে মহম্মদের পুত্র সে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত হয়। ১৭৫৫ সালে হায়দর ফৌজদার হিসেবে নিযুক্তি পায়। ১৭৬৬ সালের পর দক্ষিণ ভারতের শ্রীরঙ্গপত্তমের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় হায়দর আলি এবং তার পুত্র টিপু শ্রীরঙ্গপত্তনম হইতে ডোলড্রুম পর্যন্ত একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করে। যার সীমানা দক্ষিণ কৃষ্ণা নদী হইতে ট্রাবানকোর উত্তর হইতে পূর্বঘাট এবং আরাবিয়ান সমুদ্র পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
হায়দর এবং পুত্র টিপু তাদের সীমানা বর্ধিত করিয়াছিল এবং শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তৈরি করিয়াছিল। সুশাসক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে স্বভূমিকে রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। হায়দর এবং পুত্র দুটি যুদ্ধ জয়লাভ করে ফ্রান্সের সহায়তা নিয়ে। ৭ই ডিসেম্বর ১৭৮২ চিত্তোরের নিকট নরাসিংগারায়ানাপেট এ হায়দরের মৃত্যু হয় এবং শ্রীরঙ্গপত্তনমের কুম্বেতে হায়দরকে সমাধিস্থ করা হয়। নবাব হায়দর আলী খান বাহাদুর (১৭২১-১৭৮২) হায়দর আলীর মৃত্যুর পর (১৭৫০-১৭৯৯) টিপুর রাজত্বকাল শুরু। টিপু ছিলেন স্বচ্ছ চরিত্রের অধিকারী। তিনি আরাবিক, কানাডা, পার্সি, উর্দু ভাষা জানতেন। ১৭৯২ এর যুদ্ধে জোর করে টিপু সুলতানকে চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হয় যাতে তার রাজত্বের আনুমানিক অর্ধেক অংশ এবং যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য তিনকোটি টাকা দিতে। তার দুই পুত্রকে যুদ্ধ বন্দি হিসেবে ইংরেজরা নিয়ে নেয় এবং চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধে টিপু সুলতান ৪মে ১৭৯৯ মারা যান।
শ্রীরঙ্গপত্তনমের পতনের পর ইংরেজরা কৃষ্ণরাজা ওদেয়ার তৃতীয়কে (যার বয়স পাঁচ বৎসর ছিল) শাসক হিসেবে ঘোষণা দেন এবং রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনম থেকে মহীশূর স্থানান্তরিত করেন। পুরনো উৎকর্ষতা হারিয়ে ফেলে শ্রীরঙ্গপত্তনম মন্দির, মসজিদ, জীর্ণ হয়ে পড়ে। দুর্গ ধ্বংস হয়ে যায়।

গুম্বাজ- টিপু সুলতান তৈরি করেছিলেন, নির্মাণের সময় ১৭৮২হইতে ১৭৮৪। দরিয়া - দৌলত বাগ বা গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ টিপু সুলতান তৈরি করেছিলেন ১৭৮৪তে।
রঙ্গনাথস্বামী মন্দির মহীশূরে অবস্থিত। ব্যাঙ্গালোর গেইটের পাশে 'জুম্মা মসজিদ' ১৭৮৭ সালে টিপু সুলতান নির্মাণ করেছিলেন।

‘টিপু সুলতানের মৃত্যুর স্থান’

ব্রিটিশ বাহিনী জলমগ্ন দ্বারের কাছে হঠাৎ আক্রমণ করে ৪ঠা মে ১৭৯৯। টিপু তখন দ্বিতীয় হলের কাছে জলমগ্ন দ্বারের কাছে হঠাৎ ব্রিটিশ বাহিনী শহর অতিক্রম করে প্রবেশ করে দুদিক থেকে টিপু আক্রান্ত হয় এবং সন্ধ্যায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। ব্রিটিশ বাহিনী দেখতে পায় টিপুর দেহ অন্যান্য সৈনিকের সাথে পড়ে আছে। সেখানে একটি সাধারণ সৌধ নির্মিত হয়।

“মাইশোর”

‘মাইশোর’ শহরকে প্রাসাদ নগরী বলা হয় কর্ণাটকের দক্ষিণে সর্ববৃহৎ শহর। কথিত আছে ‘রাজা মহিষাসুর’ এখানে রাজত্ব করতেন এবং মাতা চামুন্ডে শ্বরীর সাথে যুদ্ধে তার সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটে।

মাইশোর গবগা রাজাদের রাজত্ব ছিল ১০ সেঞ্চুরি পর্যন্ত। যাতে চোলা, হোঁসলা এবং বিজয়নগর রাজারা রাজত্ব করেন ১৩৯৯ পর্যন্ত। ‘দশরা’ উৎসব বিখ্যাত। ৯ দিন যাবৎ এই উৎসব চলে। মাইশোর- ব্যাঙ্গালোর থেকে ১৪০ কিমি. দূরে অবস্থিত। এখানকার চন্দন কাঠ, সিল্ক বিখ্যাত। এখানকার মহারাজার প্রাসাদ খুব সুন্দর ও দর্শনীয় স্থান। এছাড়াও এখানে আছে জগনমোহন প্রাসাদ, সেন্ট ফিলোমিনাস চার্চ, মাতা চামুন্ডেশ্বরী মন্দির, মহিষাসুর ও নন্দী। মাইশোব চিড়িয়াখানা, এবং ১৯২১ এ কৃষ্ণরাজা ওদেয়ার চতুর্থ এর তৈরি ললিতমহল প্রাসাদ এবং মাইশোর থেকে ৮৫ কিমি. দূরে শিবসমুদ্রম। বার্ডসেঞ্চুরি, বৃন্দাবন গার্ডেন এবং কৃষ্ণসাগর বাধ, অতিশয় মনোরম। সোমনাথপুর শিবমন্দির মাইশোরের ৪২ কিমি. দূরে অবস্থিত এবং ১২৬৮ তে হোঁসলা জেনারেল সোমনাথ পান্ডামাইকা দ্বারা নির্মিত। কাবেরি সঙ্গমস্থলের গড়ে উঠে। নরসিমহা মন্দির, নিমেশ্বরা মন্দির, ওয়াটার গেইট, গঙ্গাধরেশ্বরা মন্দির, আবে ধুবিস্ চার্চ, বিলেক টম্ব (গম্বুজের কাছে) গোসাই ঘাট, ব্যাঙ্গালোর সাইড গেইট পোর্ট, মাইশোর সাইড গেইট পোর্ট। এছাড়া ওআছে নানজুনদেশ্বরা মন্দির, তিরুমাকাদ্দুলু নরসিপুর (৩২ কিমি দূরত্ব মাইশোর থেকে) পঞ্চালিঙ্গ দর্শন (তালাকাডে) বি,আর, হিলস ওয়াইল্ড লাইফ (এডভেঞ্চার রিসর্ট) বান্দীপুর ন্যাশনাল পার্ক (মাইশোর থেকে ৮০ কিমি দূরত্বে) মন্দিকেরী।

“হায়দর এবং টিপু”

১৬৯৭ এ ফতে মহম্মদ, নবাব সাদেতুল্লা খান, আরকুটের রাজার সামরিক বাহিনীর জমাদার ছিলেন। ১৭২১ এ বুদিকোটে ফতে মহম্মদের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে যার নাম

হায়দর আলী। ফতে মহম্মদ সিরাতে এক বন্দুক যুদ্ধে তাহিরখানের হাতে নিহত হন। ১৭৫৮ তে মারাঠারা মাইশোর জয় করে। হায়দরের শান্তিচুক্তির মাধ্যমে তা ফয়সালা হয়। এই শান্তিচুক্তি রাজা এবং মাইশোরের জনগণ দ্বারা প্রশংসিত হয়। ১৭৬১ সালে হায়দর মাইশোরের সিংহাসনে শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়। ২০ শে নভেম্বর ১৭৫০ দেবানহালিতে হায়দরের পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হায়দর বিখ্যাত সন্নাসী টিপুর নামে পুত্রের নামকরণ করেন টিপু সুলতান হিসাবে। প্রথম মহিশূর যুদ্ধ (১৭৬৭-১৭৬৯) হায়দর আলী খান বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ইংরেজদের সাথে মারাঠা-নিজাম বাহিনীর মিত্রতা ভেঙ্গে দেন, ফলত ইংরেজরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েএবং অবশেষে হায়দরের কথামতো শান্তিচুক্তিতে মিলিত হয়।

দ্বিতীয় মাইশোর যুদ্ধ (১৭৮০-১৭৮৪) হায়দর এবং টিপু, ৮০,০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে মাদ্রাজ অভিমুখে রওয়ানা হন ব্রিটিশদের আক্রমণ করার জন্য। গভর্ণর স্যার হেক্টর মুনরো কে আদেশ দেন যিনি কাঞ্জীবরমে ছিলেন সৈন্য সহ এবং কর্ণেল বেইলীর জন্য অপেক্ষায় ছিলেন গুন্টুর থেকে এবং যৌথ ভাবে মহীশুর বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য এই খবর পেয়ে হায়দর আলী টিপু সুলতানকে ১০,০০০ হাজার সেনা সমেত পাঠান যাতে বেইলী কাঞ্জীভরমে পৌছতে না পারে । টিপু সাফল্য লাভ করে । কর্ণেল বেইলী পরাজিত হন পোলিলুরের কাছে । সমস্ত ব্রিটিশ অফিসার এবং কর্ণেল বেইলী গ্রেপ্তার হন এবং তাদেরকে জেলে পাঠানো হয় । তাদেরকে শ্রীরঙ্গপত্তনম দুর্গে প্রেরণ করা হয় । সেখান থেকে টিপু তাঞ্জেরের দিকে রওয়ানা হয় এবং কর্ণেল ব্রেইথ ওয়েটকে পরাস্ত করেন ১৮ ই ফেব্রুয়ারী ১৭৮২ সালে । তাকে ও যুদ্ধবন্দী করে শ্রীরঙ্গপত্তনম দুর্গে পাঠানো হয় । ফ্রান্স বাহিনীর সহযোগীতায় টিপু মালাবরে ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় । তখনই হঠাৎ দুঃসংবাদ আসে টিপুর পিতা হায়দর আলী মারা গেছেন ,·হায়দর অআলী ৭ই ডিসেম্বর ১৭৮২ সালে নরসিংগরইয়ানা পেট যা চিতোরের কাছে সকালে মারা যান । সেই সময় হায়দর আলীর বয়স ছিল ৬০ বৎসর । হায়দর নভেম্বর ১৭৮২ হইতে কাবাংঙ্কলে কষ্ট পাচ্ছিলেন । প্রথমত ডাক্তাররা সাধারণ ফোঁড়া ভেবেছিলেন কিনু যখনই বুসঝন সত্যি রোগ তখন হিন্দু মুসলীম এবং ফ্রান্সের ডাক্তাররা যথেষ্ঠ চেষ্টা করেন হায়দর আলীকে সুস্থ করানোর জন্য কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা বিফলে যায় । মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যায় হায়দর আলী উনার সমস্ত পদাধিকারী অফিসারদের যেমন পুর্ণিয়া , মীর সাদিক , কৃষ্ণ রাও , শ্যামা এবং অন্যদের অনুরোধ করে বলেন আমি আর বেশী সময় নেই আপনারা টিপুর সাথে বিশ্বস্ত হয়ে কাজ করবেন । মুখ্য অফিসাররা টিপুর আগমন পর্যন্ত হায়দর আলীর মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখেছিল। ৯ই ডিসেম্বর ১৭৮২ হায়দর আলীর দেহ বৃহৎ কাঠের বাক্সে করে শ্রীরঙ্গপত্তনমে পাঠানো হয় সেখানে টিপুর পিতার মরদেহ গ্রহণ করে এবং প্রথা অনুযায়ী তার নির্মিত লাল বাগে (

গম্বুজ) কবরস্থ করেন । হায়দর আলীর পথ অনুসরণ করে টিপু ও নৌবাহিনী ও সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন ।

২৯ ডিসেম্বর ১৭৮২ টিপু সিংহাসনে বসেন " নবাব টিপু সুলতান বাহাদুর " উপাধি নিয়ে তার পিতা প্রাদেশিক বাহিনী , কামানবাড়ী ছাড়া ও নিয়মিত ৮৮,০০০ হাজার সেন্য রেখে গিয়েছিলেন। যা তৎকালীন সময়ে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বাহিনী ছিল।

ব্রিটিশ হায়দরের মৃত্যুতে কোন সুযোগ নিতে পারে নি কারণ মাইশোর শান্ত ছিল। ব্রিটিশ অক্ষেপায় ছিল মাইশোর আক্রমন করার জন্য । টিপুর প্রচেষ্ঠা ছিল সবাইকে একত্রিত করা , মারাঠা নিজামকে তিনি চিঠি ও পাঠিয়েছিলেন কিন্তু কোন ফল হয়নি । নিজাম তার সৈন্য দিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীকে সাহায্য করে । টিপুর দুর্দিন শুরু হয় , মে ১৭৯২ লর্ড কর্ণওয়ালিশ বৃহৎ সৈন্য বাহিনী গোলাবারুদ নিয়ে শ্রীরঙ্গপত্তনমের দিকে রওয়ানা হয় সাথে ছিল নিজাম এবং মারাঠা সৈন্যবাহিনী , বৃক্ষ সৈন্য , টাকা , যুদ্ধাস্ত্র , ইংল্যান্ড থেকে ও আসে। টিপু এখন পন্ডীচেরীতে ফ্রান্সের সৈন্যের অপেক্ষায় অনেক সময় নষ্ট করে যা তিনি সময়ে লাভ করেননি। টিপুর সৈন্য বাহিনী ও ব্রিটিশ বাহিনীকে তুচ্ছ মনে করে । টিপুর জেনারেলরা নিজেদের মধ্যে অন্তকোন্দলে ভুগছিল । কোন মিল ছিল না যার ফলে সত্যিকারের মানুষ অসহায় হয়ে যায় ভাগ্য যখন পরিপন্থী (TRue man is helpless when fate works against him) টিপু অসহায় হয়ে পড়ে এবং কর্ণওয়ালিসের কাছে দুত পাঠান শান্তির জন্য। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও কর্ণওয়ালিসের কাছে চিঠ পাঠান টিপুর সাথে শান্তি চুক্তির জন্য। ১৯ মার্চ ১৭৯২ টিপু সুলতান ব্রিটিশের সাথে চুক্তিপত্রে সই করেন ব্রিটিশ টিপুর অর্দ্ধেক রাজ্য , তিনকোটি ৩০ লক্ষ টাকা বা স্বর্ণমুদ্রা চার মাসের মধ্যে দিতে হবে তার দুই পত্র । আব্দুল খালিক (১০) , মুইজ উদ্- দিন (৮) ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেওয়া হয় লর্ড কর্ণওয়ালিশ রাজপুত্রদের সম্মানে ২১ বার গান স্যালুট দেন এবং দুই রাজপুত্রকে দুটি সোনার ঘড়ি প্রদান করেন , দুই বৎসরের মধ্যে টিপু চুক্তিমতো বকেয়া দেন । মার্চ ১৭৯৪ ক্যাপ্টেন ডেভেটন টিপুর দুই সন্তানকে নিয়ে আসেন । টিপু ছেলেদের গ্রহণ করেন এবং রাজপুত্রদের লক্ষ্য রাখার জন্য ভাল উপহার প্রদান করেন । টিপু বুঝতে পেরেছিলেন ব্রিটিশকে কে বিতাড়িত না করতে পারলে কখনো শান্তিতে বাস করা যাবে না , তিনি তার দুত ফ্রান্স , ইরান , পার্থিয়া , কাবুল এবং তুর্কীতে পাঠান , সামরিক সাহায্যের জন্য । নেপোলিয়ান , টিপুকে উদ্দম রেখে চলতে বলেন ।

" Not to lose Ceurage"

টিপুকে নেপোলিয়ন পরম মিত্র হিসেবে সম্বোধন করেন এবং জানান উনার অপরাজেয় বাহিনী টিপুকে সাহায্য করবে । চালাক ব্রিটিশ টিপুর প্রচেষ্টা জেনে ফেলে এবং কর্ণেল আর্থার

ওয়েলসেলী বিদেশী সাহায্য আসার আগে টিপুকে আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে । নেপোলিয়ান ভারতে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করে টিপুকে সহায্য করার জন্য এই চিঠি টিপুর হাতে পৌছার আগে ব্রিটিশের হাতে পড়ে যায় । বিপদ বুঝে ব্রিটিশ বাহিনী নেপোলিয়ানের বাহিনী যা মিশর এসে পৌছে ভারতে আসার জন্য , হঠাৎ ব্রিটিশ বাহিনী নেপোলিয়ানের বাহিনীকে ভয়ানক ভাবে আক্রমণ করে । নেপোলিলয়ানের বাহিনী এবং নেলসনের বাহিনীর মধ্যে ভয়াণক যুদ্ধ বাঁধে । এই যুদ্ধে নেপোলিয়ান বন্দী হয় তাকে এলবাতে প্রেরণ করা হয় । কর্ণেল আর্থার ওয়েলেসলী টিপু সুলতানকে এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করে চিঠি লেখেন এবং জেনারেল হারিসকে ২১,০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে কাল বিলম্বে না করে ভেলোর অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন , ইংরেজ বাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তনমের উদ্দেশ্যে ১৪ ই ফেব্রুয়ারী ১৭৯৯ রওয়ানা হয় , কর্ণেল আর্থার ওয়েলেসলী ১৬,০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে হায়দ্রাবাদের আম্বুরে পৌছান , বোম্বে থেকে ৬,৪০২ জন সৈন্য শ্রীরঙ্গপত্তনমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় । ১৪ই মার্চ ১৭৯৯ জেনারেল হারিচ ব্যাঙ্গালোর পৌছান এবং অপারেশন শুরু করেন । বোম্বে ইংরাজ সেনা বর্গ এর সিদপুরে পৌছে ২ রা মার্চ ১৭৯৯ ভিরার রাজা ব্রিটিশ বাহিনীকে স্বাগত জানায় ও সাহায্যে প্রতিশ্রুতি দেয় । টিপু সুলতান ওয়েলেসলীর সাথে বোঝাপড়ার সমস্ত চেষ্টা করেন কিন্তু কোন লাভ হয়নি । ব্রিটিশ সেনা চতুর্দিক থেকে শ্রীরঙ্গপত্তনম ঘেরাও করে । টিপু ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় তিনি দেওয়ান পুর্ণিয়াকে শ্রীরঙ্গপত্তনম দুর্গ লক্ষ্য রাখতে বলেন এবং এক মস্তবড় ভুল করেন ব্যাঙ্গালোর থেকে আগত বিশাল ব্রিটিশ বাহিনীকে প্রতিরোধেণ কোন ব্যবস্থাই করেননি ফলত বিনা বাধায় বিশাল ব্রিটিশ বাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তনম এসে পৌছে , ২রা এপ্রিল ১৭৯৯ হ্যারিল দু মাইল দুরত্বে এএস পৌছে । টিপু শ্রীরঙ্গপত্তনমে যুদ্ধে জন্য তৈরী হয় । ওয়েলেসলী টিপুর দোর্দ্দিন্ড প্রতাপ সাহস দেখে গোপনে টিপুর একজন দেওয়ান এবং মন্ত্রী মীর সাদিকের সাথে চুক্তি করেন টিপুর বিরুদ্ধে এবং মীরসাদিককে মাইশোরের রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত করবে বলে । টিপুর নিজের লোক বিশ্বাসঘাতকতা করে । ৩ রা মে ১৭৯৯ হ্যারিস শ্রীরঙ্গপত্তনম দুর্গ আক্রমণ করে । মীর সা দিক ব্রিটিশ বাহিনীকে দুর্গে প্রবেশ করতে সাহায্য করে । টিপুর হিন্দু ও মুসলমান গণকরা টিপুকে ৪ তারিখ পর্য্যন্ত সবুর করতে বলে কিন্তু টিপু যখন শুনতে পাই তার বিশ্বস্ত সৈয়দ গফ্ফর ব্রিটিশের হাতে খুন হয়েছে তখন বেলা ১ টা টিপু মাত্র খেতে বসেছিলেন , তিনি না খেয়ে হাত ধুয়ে সোজা উনার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেন , তখন তিনি দুর থেকে দেখতে পান ব্রিটিশ তাদের পতাকা উত্তোলন করে ফেলেছে । টিপু সাধারণ সৈন্যের মতো ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং আহত হন । পুনরায় ঘোড়ায় উঠেন তার বাম বুকে গুলী লাগে তিনি লুঠিয়া পড়েন , উনার ঘোড়াও গুলীর আঘাতে মারা যায় তার দেহ রক্ষী রাজা খান ও গুলীতে নিহত হন । রাজাখানা টিপুকে পরামর্শ দেন

ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে কিন্তু টিপু আত্মসমর্পণ থেকে মৃত্যুই শ্রেয় মনে করেন , ব্রিটিশ সৈন্যদের একজন টিপুর তরকারি যা খুব মুল্যবান তা হাতে নিতেই টিপু পাশের আর এক তরবারি নিয়ে সেই ব্রিটিশ সৈন্যের শিরচ্ছেদ করেন , অপমান সহ্য করতে না পেরে ব্রিটিশ টিপুর অনেক সৈন্যকে খুন করে এবং শহর জ্বালাইয়া দেয়।

ওয়েলসেলী , হ্যারিসকে আদেশ দেয় মীর সাদিককে হত্যা করার জন্য মীর সাদিক মুল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে শ্রীরঙ্গপত্তনম থেকে পালাইতেছিল তখন সুলতানের এক অফিসার তাকে গুলী করে হত্যা করে ।

ইতিহাস ঘুরে যায় , যদি এই যুদ্ধে টিপু পরাস্ত না হতেন তবে আমাদের দেশের এবং ফ্রান্সের ইইতহাস ভিন্ন হতো , পরবর্ত্তীতে ওয়াটারলুব যুদ্ধে ওয়েলেসলী নেপোলিয়ানকে পরাস্ত করেন । ৪ই মে ১৭৯৯ টিপু নিহত হন ৫ই মে ১৭৯৯ টিপুকে বাবা হায়দর আলী ও মা ফাতিমার পাশে কবরস্থ করা হয় । অগণিত মানুষ চোখের জলে শেষ শ্রদ্ধা জানান তাদের বীরকে , কর্ণেল আর্থার ওয়েলেসলী , ক্যাপ্টেন বেযার্বড , জেনারেল হ্যারিস এবং অন্যান্য ব্রিটিশ অফিসারবা তাকে শ্রদ্ধার সাথে শেষ বিদায় জানান । টিপু প্রথম এবং শেষ ভারতীয় রাজা যিনি ব্রিটিশ এক চ্যালেঞ্জ জানান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করে নিহত হন। দেওয়ান পুর্ণিয়া , টিপুর বড়পুত্র ফতে হায়তর এবং কামার উদ দিন যারা পলায়ন করেছিল এবং রাজধানীতে ছিল না , পরবর্ত্তীতে ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে ।

টিপু ছিলেন সাহসী , নির্ভীক , অসম্প্রদায়িক সর্ব ধর্মে শ্রদ্ধ , দয়াপরায়ণ প্রজাদের প্রতি সন্তানবৎসল সুশাসক। টিপুকে বলা হয় । টাইগার সুলতান বরি যোদ্ধা , প্রজাবৎসল , সংগঠক উন্নয়নকারী , নিমার্ণকারী , সন্নাসী প্রকৃতি প্রেমী , বন্ধুবৎসল । জ্ঞানী তিনি ছলচাতুরী বিশ্বাস করতেন না তিনি ছিলেন সাহসী , সত্যবাদী এবং ভয়হীন মানুষ।

দেখলাম জানলাম আমাদের ফেলে আসা ইতিহাস কুড়িয়ে কুড়িয়ে সংগ্রহ করলাম , লিখলাম। তারপর ১১ দিন অতিক্রান্ত করে একদিন দুপুর দুইটার সময় ' প্রশান্তি এক্সপ্রেস' রেল ধরে রওয়ানা হলাম ভুবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে । একদিন একরাত্র পরদিন সন্ধ্যা ৮ টার সময় এসে পৌছলাম ভুবনেশ্বরে আসার পথে কর্ণাটিক পার হয়ে অন্ধপ্রদেশের ভেতর দিয়ে ট্রেন ছুটতে থাকে , উপভোগ করি প্রকৃতির সুন্দর সাজানো পাহাড় বৃহৎ জলাশয় , কি মনোরম আমাদের দেশ , বর্ণনা করা ও যেন দুঃসাহস পৌছলাম ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার পুরী সমুদ্র জগন্নাথ মন্দির কোনারক মন্দির আগেই দেখা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের কাঁথি পার হয়ে উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে উড়িষ্যায় আছে বহু পুরনো সুদৃশ্য চন্দনেশ্বর মন্দির , কিন্তু সময়কাল পর রাত্তিরে " জগন্নাথ এক্সপ্রেস" ফরে রওয়ানা হয় । হাওড়ার

উদ্দেশ্যে পরদিন সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ এসে পৌছি হাওড়া ষ্টেশনে , সেখান থেকে একদিন বিশ্রাম নিয়ে পরদিন " মা দক্ষিণেশ্বরী মন্দিরে " পুজা দেওয়ার সংকল্প করে স্ত্রী পূর্ণিমা ও কন্যা পিয়াংক্ষীকে নিয়ে যাই " দক্ষিনেশ্বর মন্দিরে" সাথে পূজোর অর্ঘ্য নিয়ে পুজো দেওয়ার পর মনের কৌতুহল জাগে এই মন্দিরে পরম সাধক রামকৃষ্ণ দেব পূজো দিতেন , অনেক ঐতিহ্য অনেক ইতিহাস এই মন্দিরের সাথে জড়িত তা জানা হয়নি । ইতস্তত ঘোরাঘুরি করে শিবমন্দির পরিদর্শন করে মন্দিরের মুল ফটকের কাছে এক বৃদ্ধের কাছে গিয়ে জানতে পারি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমনি । কৌতুহল যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায় । রাত ৯ টা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করি কিছু ঘটনা ও জেনে সনই পুরনো সংগৃহীত তথ্য থেকে , মন অণুপ্রেরণা যোগায় কিছু লিখতে এ বারের ভ্রমন যে অপূর্ণ থেকে যায় । সন্তানের উচ্চশিক্ষার সাথে এবারের ভ্রমণ ও ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত । মায়ের মন্দিরে যাওয়াতো মায়ের আর্শীবাদ নেওয়া জন্য । যাতে আগামীর পথ মসৃন ও সুদৃঢ় হয় । এই উদগ্রীবতা আমাকে মায়ের মন্দির সম্বন্ধে লিখতে অনুপ্রেবণা যোগায়। সংগৃহীত তথ্য ও ভ্রমন অভিজ্ঞতা নিয়ে শুরু লিখা ।

" মাতা দক্ষিণেশ্বরী মন্দির "

দুই দিন কোলকাতা অতিবাহিত করে১৪/৭/১০ ইং দুপুরে নেতাজী সুভাষ আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর থেকে নিজ রাজ্য ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে বিমানে রওয়ানা দেই , কর্তব্যে যোগদানের পূর্ব্বে রাজ্যের ঐতিহ্যশালী জাগ্রত দেবী মন্দির " মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে " পুজো দিতে যাই। আমাদের রাজ্যে মায়ের মন্দির একান্ন শক্তিপীঠের এক শক্তিপীঠ । আমাদের রাজ্যে দক্ষিণ জেলায় উদয়পুর শহরের অদূরে ছোট্ট টিলার উপরে মাতাবাড়ীতে " মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির " অবস্থিত । ১৫০১ সালে রাজা ধন্যমাণিক্য এই মন্দির তৈরী করান ১৬৮১ তে মন্দিরকে সংস্কার করা হয় কারণ ব্রজাঘাতে মন্দিরের ক্ষতি হয়েছিল । এখানে সতীর ডান পা পড়েছিল । দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী ভৈরব ত্রিপুরেশ । কষ্ঠি পাথরে তৈরী মায়ের মূর্ত্তি খুবই জাগ্রত । রাজ্যের মানুষের বিশ্বাস দেওয়ালীতে উৎসব হয় । অগণিত মানুষের সমাগম হয় । মন্দিরের নীচে কল্যাণ সাগর । এই মন্দির আমাদের রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের ভুমি। এ ছাড়া অন্যান্য ৫০ টি শক্তিপীঠ হচ্ছে । হিংলাজ পাকিস্তানের বেলুচিস্থানে হিঙ্গোঁস নদীর তীরে অবস্থিত দেবী কোটরী। কিরীট - পশ্চিমবঙ্গের ইটনগরের গঙ্গাতীরে একটি প্রাচীন মন্দির দেবী বিমলা ।

বৃন্দাবন- বৃন্দাবনের কাছে ভুতেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি একান্ন পীঠের অন্যতম। " দেবী উমা" বলে পরিচিত । কুলহাপুর - মহারাষ্টের কোলহাপুর শহরের প্রাচীন অম্বাজীর মন্দির দেবী

মহিষ মর্দিনী ভৈরব ক্রোধীশ , সুনন্দা - বাংলাদেশের বরিশাল জেলার শিকারপুর গ্রামে সুনন্দা নদীর তীরে " দেবী সুনন্দা" মন্দির।

বগুড়া - অধুনা বাংলাদেশের বগুড়া জেলার ভবানীপুর গ্রামে মন্দিরটি অবস্থিত । " দেবী অপর্ণা" শ্রী পর্বত - লাডাকে " দেবী শ্রী সুন্দরী মন্দির অবস্থিত ।

বারাণসী - বারানসীতে মনিকর্ণিকা ঘাটের কাছে বিশালক্ষী মন্দিরাট অবস্থিত । " দেবী বিশালক্ষী" মন্দির নামে সুপরিচিত।

কীটতীর্থ- অন্ধপ্রদেশে গোদাবরী নদী পার হয়ে " দেবী বিশ্বমাতৃকা মন্দির"

গন্ডকী - নেপালের গন্ডকী নদীর তীরে " দেবী গন্ডকীর মন্দির"

শুচিন্দ্রম - " দেবী নারায়ণী " মন্দির কন্যাকুমারিকার কাছে . যেখানে তিন সাগরের মিলন স্থল (বঙ্গোপসাগর) ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর)

পঞ্চসাগর - ওড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জে " দেবী বারাহী" মন্দির অবস্থিত।

জ্বালামুখী - পাকিস্তানের পাটানকোঠ " দেবী অম্বিকার " মন্দির , এখানে মূর্ত্তিহীন অনির্বান নীল শিখা জ্বলছে দেবীর কল্পরুপ।

ভৈরব পর্বত - মধ্য প্রদেশের উজ্জয়নীর কাছে শিপ্রা নদীর তীরে কাল ভৈরব " দেবী অবন্তীর " মন্দির অবস্থিত ।

হট্টহাস - বর্ধমান জেলা (পশ্চিমবঙ্গ) হট্টহাস ষ্টেশনের কাছে " দেবী ফুল্লরার " মন্দির।

জনস্থান - মহারাষ্টের নাসিকের কাছে " ভদ্রকালী মন্দির " দেবী ভ্রামরী ।

অমরনাথ - অমরনাথ গুহায় এই মন্দির । " দেবী মহামায়া"

নন্দীপুর - সাইথিয়া (পশ্চিমবঙ্গ) রেলষ্টেশনের কাছে বটবৃক্ষতলে " দেবী নন্দিনীর " মন্দির ।

শ্রী শৈলম - শ্রী শৈলম (অন্ধপ্রদেশ কুনুল জেলা) পর্ব্বতে গভীর অরণ্যে " দেবী ভ্রমরাম্বা মন্দির"

নলহাটি - নলহাটি (পঃ বঙ্গ) ষ্টেশনের অনতিদূরে পাহাড়চুড়ায় " দেবী ললাটেশ্বরী মন্দির"

রত্নাবলী - " দেবী কুমারী " মন্দির তামিলনাড়ু ।

প্রভাস - " দেবী চন্দ্রভাগা " মন্দির রাজস্থানে আবু পাহাড়ে অবস্থিত।

জলনূর - " দেবী ত্রিপুর মালিনী " মন্দির পাঞ্জাবের জলনূরে অবস্থিত ।

রামগিরি - উত্তরপ্রদেশের রামগিরিতে " দেবী শিবানী " মন্দির অবস্থিত।

বৈদ্যনাথ - সাঁওতাল পরগনা জেলার দেওঘর বৈদ্যনাথ ধাম নামে পরিচিত । সতীদেবীর শক্তিমন্দিরটি একান্নপীঠের অন্যতম।

বক্রেশ্বর - পশ্চিমবঙ্গের বীরভুম জেলাতে দেবী মহিষ মর্দিনী মন্দির অবস্থিত।

কন্যাকাশ্রম- তামিলনাড়ুতে কুমারী মন্দিরের ভেতর ভদ্রকালী মন্দির।
বহুলা- পশ্চিমবঙ্গের কাটোয়া স্টেশনের পশ্চিমে কেতুব্রহ্ম গ্রামে দেবী বহুলার মন্দির।
ট্রেল- বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় সীতাকুন্ড স্টেশনের কাছে চন্দ্রশেখর পর্বতের উপরে ভবানী মন্দির।
উজ্জয়িনী- মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরের রুদ্র সাগরের কাছে হরসিদ্ধি দেবীর মন্দির।
মনিবৈদিক- রাজস্থান পুস্কর তীর্থের কাছে গায়ত্রী পর্বতে দেবী গায়ত্রী মন্দির।
মানস- চিনের মানস সরোবরের কাছে দেবী দাক্ষায়নী মন্দির।
যশোর- বাংলাদেশের যশোর শহরো দেবী যশোরেশ্বরী মন্দির।
প্রয়াগ- উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের ললিতাদেবীর মন্দির।
বিরাজক্ষেত্র - পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের ভেতর দেবী বিমলার মন্দির।
কাঞ্চী- দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু শিবগন্তীব বিখ্যাত কালী মন্দির।
কালমাধব- দেবী কালী মন্দির।
শোন- মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টকে শোন নদীব উৎসস্থলেব কাছে নর্মদা দেবাব মন্দিব।
কামাখ্যা- আসামের নীলাচল পাহাড়ে দেবী কামাখ্যা মন্দির।
নেপাল- নেপালে পশুপতিনাথে বাগমতী নদীর তীরে গুজেৎশ্বরী দেবীর মন্দির।
জয়ন্তী- মেঘালয়ে জয়ন্তীয়া পাহাড়ের বাউরডাঙ্গা গ্রামে দেবী জয়ন্তী মন্দির।
পাটনা- বিহারের পাটনা শহরে পটোনেশ্বরী দেবীর মন্দির।
কালীঘাট- কালীঘাট (কোলকাতায়) দেবী কালিকা মন্দির।
এখানে বলি জানার উদগ্রীবতা, মা দক্ষিণেশ্বরী মন্দির সম্পর্কে জানতে প্রেরণা দেয়। জানতে পারি রানী রাসমনি এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, ব্যাকুল উৎসাহে এই মহিয়সী নারী ও মন্দির সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে লিখতে শুরু করলাম।
রানী রাসমনি ও মাতা দক্ষিণেশ্বরী মন্দির সম্পর্কে ।
ত্রিস্রোতা - পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বোদা অঞ্চলে তিস্তা নদীর তীরে দেবী ভ্রামরীর মন্দির।
বিভাষ- পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরে দেবীর মন্দির।
কুরুক্ষেত্র- কুরুক্ষেত্রে গীতা মন্দির।
শ্রীলঙ্কা- দেবী ইন্দ্রানীর মন্দির।
যুগাদ্যা- পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার নদীর গ্রামে স্থাপিত দেবীর মন্দির।
বৈরাট- রাজস্থানের বৈরাটে দেবী অম্বিকা মন্দির।

বিশ্বমাতৃত্বের প্রতীক

রানী রাসমনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একটি চিরস্মরণীয় নাম। রানী রাসমনি একটি মঙ্গলময় নাম। রানী রাসমনি একটি জ্যোতির্ময় নাম। রানী রাসমনি- মাতৃত্বের পরিপূর্ণতায় একটি অমৃতময় নাম। রানী রাসমনি- তেজস্বিতা, আধ্যাত্মিকা, সততা ও হৃদয়বত্তার সমন্বয়ে একটি স্বয়ংসিদ্ধ নাম।

দেবদ্বিজে ঐকান্তিক ভক্তি, জনগণের প্রতি অগাধ প্রেম, চারিত্রিক বৈশিষ্ট, অজেয় ব্যক্তিত্ব, অক্ষয় মনুষ্যত্ব, আর ব্যাপকতর কর্মযজ্ঞের জন্য রানী রাসমনি আজ মানবসভ্যতার শীর্ষে আপন মহিমায় বিরাজিতা।

প্রজ্ঞা, বোধ, বুদ্ধি, যুক্তিসিদ্ধ মন, দার্শনিক জিজ্ঞাসা, ঈশ্বরবিশ্বাস, আধ্যাত্মিক ধারণা, আপসহীন স্বপ্রত্যয়- সর্বোপরি সনাতন হিন্দুচিন্তা ও মননভাবনায় নিজস্ব দৃষ্টিকোণের উৎকর্ষতায় রানী রাসমনির জীবনেতিহাস আজ প্রকৃতপক্ষে ভারতাত্মার ইতিহাস।

বঙ্গদেশের নবজাগরনের পথিকৃৎ স্বাধীনচেতা, বীরোত্তমা রাসমনির সংগ্রামী জীবন যেমন তৎকালীন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত, আশিষ্ট আচরণের বিরুদ্ধে ব্রজ্রকণ্ঠ প্রতিবাদে মুখর তেমন মনুষ্যত্ব সাধনার শক্তিকে জাগ্রত করে বিকলাঙ্গ জাতির কাছে তিনি চিরস্মরণীয়।

কাঙাল, ফকির, দীন-দরিদ্র প্রভৃতি ব্যথিত জনগণকে রক্ষার জন্য তাঁর অকাতরে দান সর্বজনবিদিত। এছাড়া জল কর রোধ, নীলকর উৎপীড়ন রোধ, গোরা সৈন্যদের অত্যাচার রোধ প্রভৃতি দুঃসাহসিক কাজগুলির মাধ্যমে তিনি ছিলেন দুর্লভ তেজস্বিতার প্রতীক।

আবার তাঁর একক অর্থদানের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল জনসাধারণের কল্যাণের জন্য বহু রাস্তাঘাট, বাজার, ফল প্রভৃতি যা আজকের সমবেত প্রচেষ্টার চাইতেও অনেক বেশি ফলদায়ক। কারণ, প্রতিটি কাজের মধ্যেই ছিল তার অন্তরে নিবিড় স্পর্শ মাতৃত্বের মহান স্পর্শ যা নাকি আজকের বড় বড় কর্মযজ্ঞের মধ্যেও দুর্লভ।

অসীম আত্মপ্রত্যয়, প্রদীপ্ত আত্মমর্যাদা, সদাজাগ্রত উদ্যম, করুণাকাতর হৃদয় আর দিব্যজীবনের বাস্তব উপলব্ধির মাধ্যমে রানী রাসমনির অবদান সমগ্র জাতির কাছে অভাবনীয় অপূর্ব, আবার এই মাতৃশক্তির বিগ্রহ স্বরূপিনী রাসমনির শ্বাশত মাতৃসাধনার ফলশ্রুতি- পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। রাসমনির সমগ্রজীবনের শেষ ও অমর কৃত্তি যেমন দক্ষিণেশ্বর মন্দির, তেমনি তাঁর শেষ ও অমর উপহার- শ্রীরামকৃষ্ণ।

ভারতের তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির- যার প্রতিষ্টাত্রী পুন্যশ্লোকা রানী রাসমনি প্রধান অধিষ্ঠাত্রী মা- কালিকা আর যুগধর্মবিধাতৃ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানকার ব্রহ্মাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। যিনি জগৎকে করলেন আলোকিত,চমকিত উদ্ভাসিত ও উজ্জীবিত। তাঁরও জাগরম এই দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণাশ্রয়ে। দক্ষিণেশ্বর মন্দির তাই আন্তর্জাগতিক মহাতীর্থ, মহাশক্তিপীঠ, মহাআকর্ষণের অমোঘ সম্পদ। আবার বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের কাছে দক্ষিণেশ্বরের মাটি বিস্ফোরক তুল্য। যার শাশ্বত শুভ শক্তিতে শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নয়- জগতের যেকোন অশুভ শক্তি দমিত হতে বাধ্য। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দেবালয় নির্মাণের জন্য রানী রাসমনির দক্ষিণেশ্বরে জমি ক্রয় এবং দেবালয় নির্মাণ শুরুর ঠিক একশো বছর বাদে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পরাধীনতার বন্ধন থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি- এও এক পরামশর্চ্য ঘটনা।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পরিবেশে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক জাগরণ নয়- ভারতের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ ও জাতীয়তাবোধের ও পুনর্জাগরণ ঘটেছিল। একটি দেবালয়কে অবলম্বন করে ভারতের এই নবজাগরণ যেমন পরম গৌরবের বস্তু আবার এই দেবালয় ভারতের অন্যান্য দেবালয়ের চাইতে স্বাতন্ত্র্যধর্মী বৈশিষ্ট্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যান্য দেবালয় যেমন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বা বিশেষ ধর্মের ধারক বা মাধ্যম, এই দেবালয় কিন্তু সর্বধর্ম সমন্বয়ের এবং যত মত তত পথ- এর পীঠস্থান, যা বিশ্বের আর কোন দেবালয়ে ঘটেনি। এখানে সকল মতের সকল পথের সাধনার সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভও ঘটেছে। আবার তদানীন্তন হিন্দু মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সাধক, উপাসক, ধর্মগুরুর সমাবেশও হয়েছে এই দেবালয়ে যা অন্যত্র বিরল। উপরন্তু, এই পবিত্র স্থানেই পতি কর্তৃক নিজ পত্নীকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করা এবং টাকা মাটি, মাটি টাকা জ্ঞানে এখানেই উভয় বস্তুকে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছে, যা আজকের অনেক ভোগবিলাসী মানুষের কাছে নিছক পাগলামি মনে করা।

এই দেবালয় প্রতিষ্ঠার অভিনব পটভূমিকা দিব্যানন্দময় পরিবেশ, মন্দিরগুলির বিন্যাস প্রণালী ও স্থাপত্যশিল্প-মনুষ্য জাতির সাংস্কৃতিক ভান্ডারে মহামূল্য নতুন সঞ্চয়। ভারতে আরো অনেক দেবালয় নানা স্থানে বহুদিন থেকেই বিদ্যমান কিন্তু এই একটি বিশেষ দেবালয়কে কেন্দ্র করে সমগ্র জাতির জীবনের বহুবিধ সমস্যার বাস্তব সমাধানের ঘটনা ও স্বাধীনতার বীজবপনের প্রস্তুতির ক্ষেত্র ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখা যায়নি।

রানী রাসমনির অমরকীর্তির এই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে লীলাময় রামকৃষ্ণের অভিনব লীলা এমনভাবে জড়িত যে, রানী রাসমনির কথা স্মরণ হলেই সর্বাগ্রে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কথা

যেমন মনে পড়ে আবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কথা স্মরণ হলেই মা কালী সহ শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই বার বার মনে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এখানে এই ত্রয়ী যেন একাত্মায় রূপান্তরিত। রানী রাসমনির দান, শ্রীরামকৃষ্ণের গান আর মা কালীন প্রাণ নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দির ঐশ্বর্যে, মাধুর্যে ও প্রাচুর্যে আজো ঐতিহ্যময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে- ভবিষ্যতেও থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে তাদের আকর্ষণ করবে শান্তি ও মুক্তির পথে যারা জীবন সংগ্রামে জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত ও বিভ্রান্ত। রানী রাসমনি প্রতিষ্ঠিত এটি সেই দেবালয়, যেটি যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বজনবিদিত প্রধান লীলাস্থল। যেখানে সমগ্র মনুষ্যসমাজ একদা লুটিয়ে পড়েছিল চরম সত্যের ও শান্তির প্রতীক এই পরমপুরুষের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের দুর্নিবার আকর্ষনে। লৌকিক জগতে সাধারণ হয়েও যিনি অসাধারণ সামান্য হয়েও যিনি অসামান্য, নিধন হয়েও যিনি ধনী, মূর্খ হয়েও যিনি পন্ডিত, বস্ত্রযুক্ত হয়েও যিনি বিবস্ত্র, জাগ্রত হয়েও যিনি সমাধিস্থ, গৃহী হয়েও যিনি সন্ন্যাসী, মানব হয়েও যিনি দেবতা, নিঃসন্তান হয়েও যিনি জগৎপিতা- সেই অলৌকিক জগতের মানুষটির কাছে এই দেবালয়েই সমবেত হলেন তৎকালীন সমাজের সকল শ্রেণীর অজস্র নরনারী। দেবদর্শন ছাড়াও মানুষকে দর্শন করার এমন নজির আর কোন দেবালয়ে নাই।

রাজা, জমিদার, মনীষী, মহাত্মা, চিন্তাশীল কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর, দার্শনিক, গায়ক, বাদক থেকে শুরু করে লম্পট, দস্যু, গুন্ডা, পতিতা, মেথর অবধি সমাজের সকল স্তরের মানুষের ভিড় হয়েছে এইজন অভিনব মানুষের কাছে এই দেবালয়েই। তাই আজ মানুষ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে দেবদেবী দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত ও স্মৃতিবিজড়িত ঘরটি দর্শন করার জন্য ভিড় করে। তাঁর সাধনস্থলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়ায়। পাষাণময়ী দেবী এখানে মানুষের মতো কথা কয়েছেন, আবার মানুষও এখানে দেবতার মতো পুজো পেয়েছেন। তাই বিশ্বের মূলীভূতা চৈতন্যময়ী পরমাশক্তির সন্ধান দেয় এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা ঃ

রানী রাসমনি মন্দির স্থাপনের জন্য বারানসী সমতুল্য গঙ্গার পশ্চিমদিকে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে জমি সংগ্রহের চেষ্টা করেন, কিন্তু ঐ অঞ্চলের দশআনি ছয় আনি খ্যাত জমিদারেরা রানি রাসমনির প্রচুর অর্থের বিনিময়েও কোন স্থান বিক্রয় করতে অনিচ্ছুক হন। কারণ, তাঁদের জমিদারির মধ্যে অপরের ব্যয়ে নির্মিত ঘাটে গঙ্গায় স্নান করা, নিজেদের আভিজাত্যের দরুণ তাঁরা পছন্দ করেননি। অগত্যা রানী বাধ্য হয়ে গঙ্গার পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির নির্মাণের জন্য স্থানটি কেনেন। কলকাতা থেকে ৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার পূর্বকূলে উত্তর চব্বিশ পরগণার মধ্যে

এই দক্ষিণেশ্বর গ্রাম। দক্ষিণেশ্বর নামটির সঙ্গে তখনকার জনগণের বিশেষ পরিচয় ছিল না এবং গ্রামটির অবস্থা এখনকার মতো জনবহুল ছিল না। মাঝে মাঝে জঙ্গল বাগান, পুস্করিনী, কবরস্থান প্রভৃতি ছিল এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান জুড়ে। এখানে তৎকালীন স্থাপিত একমাত্র সরকারী বারুদখানা ম্যাগাজিনের আর কিছু ইংরেজ ও স্থানীয় জমিদারদের ঘোড়ার গাড়ি যাতায়াত করত। হিন্দুদের সঙ্গে কিছু ইংরেজ ও মুসলমানের বসতিও ছিল। ইংরেজদের কোন গির্জা না থাকলেও মুসলমানদের মাজার দরগা প্রভৃতিও ছিল। বর্তমনে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছেই মোল্লাপাড়ায় একটি মসজিদও ছিল যেখানে পরবর্তী কালে ইসলামধর্ম সাধনের সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নামাজ পড়তে যেতেন। দু এক ঘর বিত্তশালী মানুষ ছাড়া অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত বা নিম্মমধ্যবিত্ত শ্রেণীর। বড়িশার প্রখ্যাত জমিদার সাধন চৌধুরী বংশের দুর্গাপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও ভবানী প্রসাদ রায়চৌধুরী বড়িশা থেকে এসে দক্ষিণেশ্বর যখন প্রথম বাস করা শুরু করেন, তখন তাঁরাই এখানকার বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে গ্রামটির উন্নতিসাধন করেন এবং বহু লোক এনে তাদের বসতি স্থাপন করান। এই বংশেরই যোগীন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করেন এবং ত্যাগী সন্তানরূপে স্বামী যোগানন্দ নামে পরিচিত হন।

নামটি দক্ষিণেশ্বর ঃ- তাই এখানে ভুবনেশ্বর তারকেশ্বর, বক্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানের মতো কোন শিবের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, বহুকাল পূর্বে এখানকার দেউলিপোতার জমিদার বানরাজা নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এখানে একটি শিবের সন্ধান পান এবং তিনি একটি নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন ও একটি মন্দির ও প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণবঙ্গে এই শিবটি প্রাপ্তির ফলে, তিনিই নাকি শিবের নামকরণ করেন দক্ষিণেশ্বরএবং সেই নামানুসারেই স্থানটির নাম হয় দক্ষিণেশ্বর। অবশ্য এটি কিংবদন্তী এর কোন প্রামাণিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। দক্ষিণেশ্বরের শিবতলা ঘাটের বুড়োশিব কেই অনেকে বানরাজার প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর শিব বলে মনে করেন। যাই হোক, দক্ষিণ শব্দের আভিধানিক অর্থ দক্ষিণ দিক ছাড়াও অনুকূল উদার অকপট প্রভৃত্যি হয়, আবার দক্ষিণ দিকের অধিপতিকে দক্ষিণের ঈশ্বর বা দক্ষিণেশ্বর বলা হয়। নামের উৎপত্তির বিশেষ সূত্র খুঁজে না পাওয়া গেলেও সদাশিব শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্তীকালে আগমনের ফলে দক্ষিণেশ্বর নামের সার্থকতা তাত্বিক বিচারে বোঝা যায়। দক্ষিণেশ্বরের আদি নাম ছিল শোনিতপুর বা সম্বলপুর দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির স্থাপনের পর অবশ্য এখানে আরো মঠ-মন্দির স্থাপিত হয়েছে, যেগুলির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মহামন্ডল, সারদা মঠ, যোগদা মঠ, হরগৌরী মন্দির, আদ্যাপীঠ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নিকটবর্তী আরিয়াদহের গদাধর পাটবাড়ি অবশ্য অনেক প্রাচীন, যেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন মাঝে মাঝে যেতেন। অধুনা

দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনের দিক থেকে পশ্চিমমুখী যে রাস্তা আছে, তার একটি হলো বালীপুল বা বিবেকানন্দ ব্রিজে ওঠার রাস্তা (পূর্বে এই ব্রিজের নাম ছিল উইলিংডন ব্রিজ) অপরটি গঙ্গার দিকে যাওয়ার রাস্তা, যার বর্তমান নাম রানী রাসমনি রোড। এই রানী রাসমনি রোড ধরে গঙ্গার দিকে কিছুটা অগ্রসর হলেই বিরাট ফটকযুক্ত বিশাল উদ্যানের মধ্যে যে দেবালয়টি দৃষ্টিগোচর হয়, সেইটিই প্রসিদ্ধ দক্ষিণেশ্বর মন্দির। এই বিশাল উদ্যানটি আগে সাহেবান বাগিচা নামে পরিচিত ছিল। জমির ইংরেজ মালিক ছিলেন জন হেস্টি। তিনি কুঠি বাড়িতে বাস করতেন। এখানে তাঁর একটি চটকল তৈরির ইচ্ছা ছিল। কলের জন্য যন্ত্রপাতি কেনার উদ্দেশ্যে তিনি বিলাতে রওনা হওয়ার পর পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। সেজন্য সেখানে আর চটকল তৈরি হয়নি। তাঁর এক্সিকিউটর কলকাতার তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের ইংরেজ এটর্নি জেমস হেস্টি সাহেবের কাছ থেকে এখানে দোতলা কুঠিবাড়িসমেত কিছু অংশ, মুসলমানদের কবরডাঙা, গাজী সাহেবের পীরের স্থান,পুষ্করিনী, আমবাগান ইত্যাদি রানী রাসমনি কিনে নেন। এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের একটি স্থান আবার কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি থাকায় শাস্ত্রানুযায়ী শক্তিমন্দির প্রতিষ্ঠার এটি উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয় এবং একইভাবেই খ্রিস্টান ও মুসলমানদের ব্যবহৃত স্থানের ওপরেই নির্মাণ হয় হিন্দুর শ্যাম- শ্যামা-শঙ্করের মন্দির, যা পরবর্তী কালে সর্বধর্মসমন্বয়ের সার্থক ভূমিকা রচনা করেছিল। রানী রাসমনির দলিল থেকে জানা যায় যে, এখানকার মোট সাড়ে চুয়ান্ন বিঘা স্থানটি ৪২ হাজার ৫০০ টাকায় রানী কিনেছিলেন কুটিবাড়িসমেত। এই কুঠিবাড়িটিই এই উদ্যানের আদি বাড়ি। যা সামান্য সংস্কারের পর এখনো প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। গাজী সাহেবের পীরের স্থানটিও আদি। বাকি ঘর বাড়ি মন্দির ঘাট পাঁচিল ইত্যাদি রানীর আমলে তৈরি।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর বিল অফ লেন এর মাধ্যমে জমিটি কেনা হলেও সেটি তখন রেজিস্ট্রি করা হয়নি কারণ তখন রেজিস্ট্রেশন আইন চালু ছিল না। পরে উক্ত আইন বলবৎ হলে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী রানী রাসমনি সম্পাদিক আরেকটি দেবোত্তর দলিলের মধ্যে ঐ বিল অফ সেল এর কথা উল্লেখ করে সেই দলিল ১৮৬১খ্রিষ্টাব্দের ২৭ আগষ্ট আলিপুরের রেজিস্ট্রি অফিসে যথারীতি রেজিস্ট্রি করা হয়। এই রেজিস্ট্রির তারিখ রানী রাসমনির দেহত্যাগের ৬ মাসের পরে।

রেজিস্টার ছিলেন তারকনাথ সেন। রানী রাসমনি যখন জমিটি কেনেন, তখন তার চৌহদ্দি ছিল পূর্বদিকে কাশীনাথ চৌধুরীদের জমি, পশ্চিমদিকে গঙ্গা উত্তরদিকে সরকারী বারুদখানা, আর দক্ষিণদিকে জেমস হেস্টির একটি কারখানা। জমি কেনার পর অবশ্য পূর্বদিকে লোকালয় গড়ে ওঠে বর্তমানে যার কতকাংশে রেলওয়ে কোয়ার্টার। দক্ষিণদিকের অংশে জেমস হেস্টির কারখানার স্থলে পরে যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি স্থাপিত হয়েছিল। এই বাগানবাড়িতে পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবাধ যাতায়াত ছিল এবং বহু লীলাবিষয়ক ঘটনাও

এখানে ঘটেছিল। বর্তমানে এই জায়গাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির রয়েছে। উত্তরদিকের বারুদখানার স্থলে বর্তমানে রয়েছে উইমকো দেশলাই কারখানা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একদা বারুদখানার ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাসমনি এস্টেটের একটি মকদ্দমা হওয়ায়, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিস্টার রূপে রাসমনির এস্টেটের পক্ষে আইনজীবী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বিতর্কিত অংশটি সরেজমিনে দেখার জন্য একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে জমি কেনার সঙ্গে যথেষ্ট ১৮৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে (১২৫৫ বঙ্গাব্দ) থেকেই এখানকার যাবতীয় নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং এই কাজে প্রথম দিকে রানী প্রধান সহায়ক ছিলেন জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাস।

পরে রানীর তৃতীয় জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের ওপরই প্রধানত এই কাজের সমুদয় দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ায়, রানী যেমন প্রত্যহ এ সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে খোঁজ নিতেন, মাঝে মাঝে আবার নিজেও দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কাজ পরিদর্শন করতেন। মন্দিরাদি নির্মাণের শুরুতে প্রথম দফায় গঙ্গার ধারে পোস্তা, ঘাট, উদ্যান প্রভৃতি তৈরীর কাজ আরম্ভ হলেও, গঙ্গার প্রবল বানের ফলে নির্মাণকালেই সেগুলি ভেঙে যায়। এই কাজের ভার কারা নিয়েছিএলন, তা জানা যায় না। এরপরেই রানী রাসমনি তৎকালীন খুব নামি বিলাতী ঠিকাদারী সংস্থা ম্যাকিনটস অ্যান্ড বারন কোম্পানিকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার চুক্তিতে পুনরায় পোস্তা ও ঘাট তৈরির কাজের ভার দেন। কোম্পানি বিশেষ দক্ষতা সহকারে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করায়। চুক্তির টাকা ছাড়াও রানী স্বেচ্ছায় তাদের পারিতোষিক স্বরূপ আরও কয়েক হাজার টাকা দেন এবং তাদের যোগ্যতা বিবেচনা করে সঙ্গে সঙ্গে দেবালয়ের নকশা প্রস্তুত করে এবং অপূর্ব কারুকার্যশোভিত মন্দিরগুলি নির্মাণ করে। একই সঙ্গে দেবালয়ের বাইরের দুটি নহবৎখানা, পুষ্করিনীগুলির ঘাট, চারিদিকের সুবিস্তৃত প্রাচীর প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট কাজগুলি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য করা দরকার যে, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এই ম্যাকিনটস অ্যান্ড বারন কোম্পানিটি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হওয়ায়, বর্তমানে তার নাম ম্যাকিনটস বারন লিমিটেড। একদা বহু এবং বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজের প্রাচীন অভিজ্ঞ এই ঠিকাদারী সংস্থার বর্তমান কার্যালয় ভি/১১, গিলন্ডার হাউস (দ্বিতল), নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা -৭০০০০১। দক্ষিণেশ্বর মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে এই লেখক এই দপ্তরে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, যাবতীয় নির্মাণ কাজ (পোস্তা বাঁধসমেত) এদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছিল এবং এজন্য মোট ৯ লক্ষ টাকা তখনকার দিনে খরচ হয়েছিল। ঐ দপ্তরে যা রেকর্ড আছে, তাতে উল্লেখ আছে - "The Company has the unique distiviction of constructing the Dakhineswar erosion"

গঙ্গার ধারে পোস্তা, বাঁধ প্রভৃতির কাজ শেষ হওয়ার পরেই এখানে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর গঙ্গার দিকে একই নকসা অনুযায়ী একই ধাঁচের ১২ টি শিবমন্দির ও চাঁদনি এবং এই মন্দিরগুলির পূর্বদিকে- উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত মাটির টালি বাঁধানো একটি বিরাট চতুষ্কোণে প্রাঙ্গন তৈরী কর হয়। যার আয়তন ৪৪০ ফুট লম্বা ও ২২০ ফুট চওড়া। মন্দিরের সমগ্র এলাকার তিন পাশে দালান বাড়ি তৈরি করা হয়। এই বাড়িগুলির মাঝখান দিয়ে মন্দিরে আসার জন্য তিনটি প্রবেশ পথও করা হয়। একই সঙ্গে কালীমন্দির ও বিষ্ণুমন্দিরের কাজও চলতে থাকে। মন্দির এলাকার বাইরে উত্তরে একটি নহবতখানা এবং দক্ষিণে অনুরূপ আরেকটি নহবৎখানা তৈরি হয় এবং সমগ্র এলাকাটি প্রাচীরদিয়ে ঘেরা হয়। সমুদয় নির্মাণ কাজ শেষ হতে প্রায় ৯ বছর সময় লেগেছিল। নির্মাণের পর দেবালয়ের সীমানা এইরকম দাঁড়ায়- পূর্বে একটি পুষ্করিনী (গাজীপুকুর), পশ্চিমে উদ্যান ও গঙ্গা, উত্তরে কুঠিবাড়ি ও নহবতখানার দক্ষিণে ফল-ফুলের বাগান ও আরেকটি নহবৎখানা। এখানে মা কালী, শিব ও রাধাকৃষ্ণের মন্দিরাদি স্থাপিত হলেও এটি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি নামেই প্রসিদ্ধ। মন্দির নির্মাণ শুরু ১৮৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং সমাপ্তি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। দক্ষিণেশ্বরে যখন মন্দিরাদি তৈরি হতে থাকে, সেই সময় রানীর বাড়িতেও মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেবদেবীর মূর্তি গুলিও নির্মিত হয়। মূর্তি নির্মাণের আরম্ভকাল থেকেই রানী কঠোর ব্রতপালন ও আচার নিষ্ঠার মাধ্যমে দিন কাটিয়েছিলেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিলেন। এই সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের কাছে নিজে মুখে যা বিস্তৃত করেছিলেন, স্বামী সারদানন্দজীর ভাষায় সেটির উদ্ধৃতি শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট অন্যান্য প্রশস্ত দিবসে মন্দির প্রতিষ্ঠা না করিয়া স্নানযাত্রার দিন বিষ্ণু পর্বাহে রানী শ্রী শ্রী জগদম্বার প্রতিষ্ঠা কেন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের কথা উত্থাপন করিয়া ঠাকুর কখনো কখনে আমাদিগকে বলিতেন- দেবমূর্তি নির্মাণারম্ভের দিবস হইতে রানী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ পূজাদি করিতেছিলেন, মন্দির ও দেবমূর্তি নির্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে সুস্থে শুভ দিবসের নির্ধারণ হইতেছিলে এবং মূর্তিটি ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দি করিয়া রাখা হইয়াছিল। এমন সময় যেকোন কারণেই হউক, ঐ মূর্তি ঘামিয়া উঠে এবং রানীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়- আমাকে আর কতদিন এইভাবে আবদ্ধ রাখিবি?

আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে, যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠাতা কর। ঐরূপ প্রত্যাদেশলাভ করিয়াই রানী দেবী প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া দিন দেখাইতে থাকেন এবং স্নানযাত্রার পূর্ণিমার আগে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া ঐ দিবসে ঐ কার্য সম্পন্ন করিতে

সঙ্কল্প করেন। রানীর সঙ্কল্পে কিন্তু প্রচণ্ড বাধা পড়ল। সকল কাজ ঠিকমতে শেষ হওয়ার পর, উপযুক্ত দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দেবীকে অন্নভোগ দেবার জন্য রানী যখন সচেষ্ট, ঠিক তখনই তিনি এক কঠিন বাধার সম্মুখীন হন। কারণ রানীর জাতিতে শূদ্র হওয়ায় সমাজিক প্রথানুযায়ী কোন ব্রাহ্মণই, এমনকি রানীর নিজের গুরু বা পুরোহিত ও এই মন্দির প্রতিষ্ঠা বা দেবীকে অন্নভোগ দিতে রাজি হলেন না। সেইজন্য রানী বিভিন্ন চতুষ্পাঠির পন্ডিতদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শাস্ত্রানুযায়ী বিধান জানাবার জন্য অনুরোধ করায়, সকলেই এই কাজকে অশাস্ত্রীয় বলে বিধান দেন। একমাত্র কলকাতার ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীর পন্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বিধান আসে যে, প্রতিষ্ঠার আগে যদি কোন ব্রাহ্মণকে ঐ মন্দির দান করা যায় এবং সেই ব্রাহ্মণ যদি ঐ মন্দিরে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তবে তা অশাস্ত্রীয় কাজ হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় রামকুমারের এই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় পরত, রাসমনি কৈবর্ত, রাসমনি শুদ্রানী, ইত্যাদি নানা ন্যাক্কারজনক অভিযোগের দ্বারা, সেইসব গোঁড় ব্রাহ্মণ, পন্ডিত, রামকুমারের বৈপ্লবিক বিধানকে কোনমতেই গ্রাহ্য করতে রাজি হলেন না। অগত্যা রাসমনি দেবী এই উদার মতাবলম্বী ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত রামকুমারকেই এই কাজ করার জন্য আহ্বান জানালে, বহির্জগতের সকল বাধা তুচ্ছ জ্ঞান করে, অন্তরের নির্দেশে সৎ সাহসের সঙ্গে রামকুমার এই কাজে ব্রতী হন এবং অপরিণত বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে (তৎকালীন গদাধর) নিয়ে ঝামাপুকুর থেকে এসে রাসমনি দেবীর ইচ্ছানুযায়ী ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১৮ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিনে (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে) মন্দির প্রতিষ্ঠার পুণ্যকাজ সমাধা করেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যেসব গোঁড়া ব্রাহ্মণ- পণ্ডিত রামকুমারের এই বিধানকে পূর্বে সমর্থন করেননি, পরে রামকুমারের সৎসাহসী মনোভাব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সততার পরিচয় পেয়ে সেদিন রামকুমার বিরোধী সব পণ্ডিতই নিরুপায় অবস্থায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন এবং কে কোন পূজাকাজের দায়িত্ব নেবেন তাই নিয়েই নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ বিসম্বাদ কোলাহলের পর কাজ সমাধা করে যথাযথ দানও গ্রহণ করেছিলেন।

যিনি সেদিন সকল শাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যা উপেক্ষা করে এবং সমুদয় পণ্ডিতবর্গের অনুদার মনোভাবের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রামী সৈনিকের মতো রুখে দাঁড়িয়ে রানী রাসমনিকে তাঁর ইপ্সিত পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছিলেন, সেই উচ্চকোটি মাতৃসাধক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্যক পরিচয় জ্ঞাপনের সুযোগ এখানে না থাকলেও তাঁর অন্যান্য সাধারণ

জীবনধারা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা বিশেষ প্রয়োজন। হুগলি জেলা কামারপুকুরের ভাক্তদম্পতি ক্ষুদিরাম-চন্দ্রমনির তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র। কিন্তু কামারপুকুর তাঁর জন্মস্থান নয়। কামারপুকুরে বসতি স্থাপনের আগে ক্ষুদিরাম যখন তাঁর আদি পিতৃভূমি দেরেপুর গ্রামে বাস করতেন, সেইসময় ১২১১ বঙ্গাব্দে (১৮০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনিই মাতাপিতার প্রথম সন্তান। কথিত আছে, দেরেপুর থাকাকালী একদা ক্ষুদিরাম তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে অযোধ্যাসহ নানাস্থান দর্শন করে ফিরে আসার পর। অযোধ্যা তীর্থের স্মরণে তাঁর প্রথম পুত্রের নাম রাখেন রামকুমার। রামকুমারের পর দেরেপুর গ্রামে ক্ষুদিরামের যে কন্যাটি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম কাত্যায়নী। এরপর জমিদারের অত্যাচারে দেরে গ্রাম ত্যাগ করে ক্ষুদিরাম কামারপুকুরে চলে আসার পর, তাঁর আরো তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। যথা- রামেশ্বর (পুত্র), গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণ (পুত্র) এবং সর্বমঙ্গলা (কন্যা। দেরেপুর গ্রাম ত্যাগ করে কামারপুকুরে আসার পর, ক্ষুদিরাম নিকটবর্তী গ্রামের এক চতুষ্পাঠীতে রামকুমারের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং রামকুমারও ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন যথারীতি শেষ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতঃপর রামকুমার যজন- যাজন প্রভৃতি কাজে কিছু রোজগার করতে থাকায় এবং বিবাহযোগ্য হওয়ায় ক্ষুদিরাম তাঁর বিবাহ দিতে আগ্রহী হন। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠা কন্যা কাত্যায়নী ও বিবাহযোগ্য হওয়ায় তিনি তাঁরও বিবাহের জন্য আগ্রহী হন। এই সময় রামকুমারের বয়স ছিল ষোল এবং কাত্যায়িনীর বয়স এগার, কিন্তু তখনকার প্রথানুযায়ী পুত্র-কন্যাদের এইটাই বিবাহের বয়সরূপে গণ্য করা হতো। বিবাহের পনের বোঝ এড়াবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম পুত্র-কন্যাদের জন্য পরিবর্ত বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কামারপুকুরের উত্তরে প্রায় ২ মাইল দূরে আনুড় গ্রামের কেনরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ক্ষুদিরাম তাঁর কন্যা কাত্যায়িনীর বিবাহ দেন এবং পরিবর্তে জামাতা কেনারামের ভগিনীর সঙ্গে পুত্র রামকুমারের বিবাহ দেন। রামকুমারের স্ত্রীর নাম অজ্ঞাত ।

রামকুমার আদর্শপরায়ন, নিষ্টাবান, বাকসিদ্ধ ও সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁদের পরিবারবর্গ প্রধানত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক হলেও রামকুমার আদ্যাশক্তির উপাসক ছিলেন এবং উপযুক্ত গুরুর কাছে দেবী মন্ত্রও গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি, পরবর্তীকালে তান্ত্রিক গুরুর সাহায্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণকেও দেবীমন্ত্রেও দীক্ষিত করেছিলেন। ইষ্টদেবীকে নিত্য পূজা করার সময় একদিন তিনি অনুভব করেন যে, দেবী নিজে অঙ্গুলিদ্বারা যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে জ্যোতিষ শাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য কোন মন্ত্র লিখে দিয়েছেন। এই ঘটনার পর থেকেই তিনি অনেকের ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন এবং সেগুলি সত্যই ফলে যেত। এজন্য ভবিষ্যদ্বক্তারূপেও তাঁর বিশেষ পরিচিতি ঘটে। এমনকি, নিজের বিবাহের পর স্ত্রীর ভাগ্য দর্শন করে রামকুমার ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হলেই মৃত্যু ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে বিবাহের বহুকাল পরে রামকুমারের স্ত্রী গর্ভবর্তী হন এবং একমাত্র পুত্র অক্ষয়কে

প্রসব করার পরই তাঁর মৃত্যু হয়। রামকুমার কিন্তু কখনো তাঁর এই একমাত্র মাতৃহীন শিশুকে কোলে করেননি । কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন ঃ মায়া বাড়িয়ে কাজ নেই, এ ছেলে বেশি দিন বাঁচবে না। রামকুমারের মৃত্যুর পরে অক্ষয়ের বিবাহ হলে , অক্ষয়ের ও অকাল মৃত্যু হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে । পিতা ক্ষুদিরামের মৃত্যুর পর থেকেই অভিভাবক রূপে রামকুমারই সংসারের ভার গ্রহণ করেন । এবং বালক গদাধর , তথা শ্রী রামকৃষ্ণের প্রথম জীবন জ্যাষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের ব্যক্তিত্বের দ্বারাই প্রভাবিত হয় । শ্রীরামকৃষ্ণের উপনয়ন , মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের বিবাহ , কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বমঙ্গলার বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক দায়িত্বপূর্ণ সমুদয় কাজই রামকুমার তাঁর পিতার অবর্তমানে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রী বিয়োগের পর , সংসারের নানা অসুবিধা ও আর্থিক অনটন এমন পর্যায় পৌঁছায় যে , রামকুমারকে সংসার প্রতিপালনের জন্য ঋণও করতে হয়। এ দিকে মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ের দেখাশোনার ভার চন্দ্রমনি দেবী গ্রহণ করলেও স্ত্রী বিয়োগজনিত মনোকষ্ঠে রামকুমারের স্বাভাবিক জীবনও যেন নানা ভাবে ভারাক্রান্ত হতে থাকে । বাড়িতে বাস করে তিনি সংসার পালনে সমমর্থ বোধ করায় , কলকাতায় গিয়ে কিছু রোজগারের জন্য আগ্রহী হন । অতঃপর ১২৫৬ বঙ্গাব্দে (১৮৪৯ - ৫০ খ্রীষ্টাব্দে) মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের ওপর সংসারের দায়িত্ব অর্পন করে , রামকুমার একাকী কলকাতায় এসে ঝামাপুকুরে একটি ' চতুস্পাঠী ' বা ' টোল' খোলেন । প্রথমাবস্থায় কয়েকজন মাত্র ছাত্রের শিক্ষাদানের দরুন তাঁর বিশেষ কোন আয় না থাকলেও ঝামাপুকুর পল্লীতে যজন যাজন , ব্যবস্থাদান প্রভৃতি কাজের দ্বারা তাঁর কিছু রোজগার হতে থাকে । পরবর্তী কালে ১২৫৯ বঙ্গাব্দে (১৮৫২ - ৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) এক শুভদিনে রামকুমার , কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাদাধর তথা শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর থেকে ঝামা পুকুরে নিজের কাছে নিয়ে আসেন । এই ঝামাপুকুরের চতুস্পাঠীর বিধান উপলক্ষেই রামকুমারের সঙ্গে রাসমণি দেবীর প্রথম যোগাযোগ হয় এবং রাসমনি দেবীর আহ্বানেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রতিষ্ঠাকার্যে অগ্রণী হন । মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বরে সে দিনের ঐতিহাসিক মহোৎসবের যতটুকু বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে । তা থেকে জানা যায় যে প্রতিষ্ঠার আগের দিন মন্দির প্রাঙ্গণে পত্রাগান , কালীকীর্তন ভাগবত পাঠ , রামায়ণ পাঠ প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছিল এবং রাত্রে সমগ্র দেবালয় অসংখ্যা আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছিল । পরের দিন অর্থাৎ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন দেবালয়ের বিশাল প্রাঙ্গণ ভোর থেকেই অংসখ্য ভক্ত সমাগমে পরিপূর্ণ হয়েছিল এবং সমগ্র দক্ষিণেশ্বর গ্রামটি উৎসবের আনন্দে মুখরিত হয়েছিল । একদিন সারাক্ষণ নবৃবতের সুমধুর ধ্বনি , শঙ্খ - ঘন্টা - কাঁসরের আরতি ধ্বনি , নামকীর্তন , মন্ত্রোচ্চারণ , হোমাদি ক্রিয়া প্রভৃতিতে দক্ষিণেশ্বর মন্দির জমজমাট ছিল । রাসমনি দেবীর আহ্বানে এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নবদ্বীপ ভট্টপল্লী , মূলাজোড় , নোয়াখালি , বিক্রমপুর , চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ ছাড়াও কাশী , পুরী পুনা

, মাদ্রাজ , কনৌজ , মিথিলা প্রভৃতির ব্রাহ্মণেরাও উপস্থিত ছিলেন , যার সংখ্যা লক্ষাধিক । রাণী ও এই সমবেত লক্ষাধিক ব্রাহ্মণের পদধূলি স্বহস্তে সংগ্রহ করে নিজের বাড়িতে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। রাণীর বাড়িতে তাঁর বংশধরদের কাছে এই পদধূলি বহুকাল যাবৎ রক্ষিত ছিল । প্রবাদ আছে যে , আরো অসুখ বিসুখ হলে তাকে যদি সামান্য পরিমাণে এই লক্ষাধিক ব্রাহ্মণের পদধুলি খাওয়ানো যায় । তাহলে সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হয় । এই প্রচলিত মতের লোকেরা রোগমুক্তির আশায় এই পদধুলি ক্রমশ রাণীর বাড়ি থেকে নিতে থাকায় , অবশেষে তা নিঃশেষ হয়ে যায় । যাই হোক , একদিন মহোৎসবে যোগদানকারী সমস্ত ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সমাদর করা হয় এবং ভোজনে , দানে ও দক্ষিণায় পরিতুষ্ঠ করা হয় ।

এঁদের মধ্যে যাঁরা অধ্যাপক বা পন্ডিত ছিলেন সেইসব বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে রানী এদিন রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায়কালে প্রত্যেককে এক একটি স্বর্ণমুদ্রা দান করে দ্বিজভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ব্রাহ্মণ পন্ডিত ছাড়াও আত্মীয়কুটুম্ব, প্রতিবেশি, যাঁরাই এই উৎসবের আনন্দের অংশীদার ছিলেন সকলকেই রানী সাধ্যমতো সমাদর করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক মহোৎসব উপলক্ষ্যে রানী রাসমনি অন্নদান, যজ্ঞ এবং ও আয়োজন করেছিলেন। রানীর বিভিন্ন তালুক ও জমিদারি থেকে এই মহোৎসবের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র আনা হয়। রানীর শালবাড়িয়া তালুক থেকে দুটি হাতির পিঠে অতি বিশুদ্ধ ঘৃতও আনা হয়। পুজানুষ্ঠান ছাড়াও এদিন দধি-পুষ্করিণী, পায়েস-সমুদ্র, ক্ষীর-হ্রদ, দুগ্ধ সাগর, তৈল-সরোবর, ঘৃত-কূপ, লুচি-পাহাড়, মিষ্টান্ন -স্তূপ, কদলিপসা রাশি, মৃন্ময়পাত্র-স্তূপ, প্রভৃতির মাধ্যমে রানী অন্নদান যজ্ঞ এর বিশাল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষ্যে একদিনেই রানীর কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজী তাঁর শ্রী শ্রীরাম কৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এ লিখেছেন- শুনা যায়, দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দে সেদিন ঐ স্থান দিবারাত্র সমভাবে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং রানী অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অতিথি অভ্যাগত সকলকে আপনার ন্যায় আনন্দিত হইয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এই বিরাট অনুষ্ঠানে পুরোহিতগণের মধ্যে গৌড়াদা, দ্রাবিড়-বৈদিকগণও যেমন ছিলেন, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণরাও ছিলেন রামকুমারই সেদিন দেবীকে অন্নভোগ দিয়েছিলেন বলে লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলা অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্বে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরাদি সমস্ত সম্পত্তি রানী রাসমনি তাঁর কুলগুরু রামসুন্দর চক্রবর্তীকে মন্ত্রের দ্বারা উৎসর্গ করায়। তবেই রানী দেবীকে অন্নভোগ দেবার অধিকার পান এবং গুরুর প্রতিনিধিরূপে দেবসেবার ব্যবস্থা করেন। এই বিরাট অনুষ্ঠানে বৈদিক ও অন্যান্য শ্রেণীর পুরোহিতেরা পুজা,

হোম, তন্ত্রপাঠ প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শাস্ত্রমতে বেদ ও তন্ত্র দুই প্রকারের দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, রাঢ়ী ও বৈদিক শ্রেণীর পূজার কাজও ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

যেসব বঙ্গীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পন্ডিত এই কাজে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নামের তালিকা-

১) রানীর গুরুদেব রামসুন্দর চক্রবর্তী (বাগবাজার) ২) রানীর পুরোহিত উমাচরণ ভট্টাচার্য (বরানগর) ৩) বৈকুণ্ঠনাথ ন্যায়যত্ন (বেলগাছিয়া) ৪) চন্ডীচরণ বিদ্যাভূষণ (পাইকপাড়া) ৫) কেশবচন্দ্র তর্কবাগীশ (গড় ভবানীপুর)

৬) ঠাকুরদাস বিদ্যালঙ্কার (শ্রীরামপুর) ৭) রামকুমার তর্কালঙ্কার (জগৎবল্লভপুর) ৮) পীতাম্বর চূড়ামনি (জগৎবল্লভপুর) ৯) যদুনাথ সার্বভৌম (জগৎবল্লভপুর) ১০) মধুসূদন তর্কালঙ্কার (গুসকরা) ১১) সীতারাম বিদ্যাভূষণ (পাঁতিহাল) ১২) বৈকুণ্ঠ ন্যায়রত্ন (গোন্ডল পাড়া) ১৩) কৃত্তিবাস তর্করত্ন (গোন্ডল পাড়া ১৪) রাইচরন ভট্টাচার্য (গোন্ডল পাড়া) ১৫) প্রেমচাঁদ বাচস্পতি (গোন্ডল পাড়া) ১৬) বিশ্বনাথ তর্ক পঞ্চানন (গোন্ডল পাড়া) ১৭) ঈশানচন্দ্র ন্যায়বাগীশ (গোন্ডল পাড়া) ১৮) ভোলানাথ সার্বভৌম (বলরামবাটী) ১৯) তপস্বীরাম বিদ্যাবাগীশ (বলরামবাটী) ২০) ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামনি (বলরামবাটী) ২১) মনসাচরণ বিদ্যালঙ্কার (বাসুবাটি)

২২) রামচন্দ্র চূড়ামনি (বাসুবাটি) ২৩) পরানচন্দ্র বিদ্যারত্ন (মধুবাটি)২৪) বৈকুন্ঠনাথ ন্যায়রত্ন (বালিচর) ২৫) সার্থকনাম শিরোমনি (নয়াচক)

২৬) বৈকুন্ঠনাথ ন্যায়রত্ন (সাচক) ২৭) ব্রজনাথ চক্রবর্তী (ওয়াদিপুর) ২৮) বানেশ্বর বিদ্যাভূষণ (ওয়াদিপুর) ২৯) চিন্তমনি বিদ্যাসাগর (ওয়াদিপুর) ৩০) বনমালী চূড়ামনি (ওয়াদিপুর) ৩১) নবকুমার শিরোমনি (ওয়াদিপুর) ৩২) কালীপদ বিদ্যার্নব (ওয়াদিপুর) ৩৩) লালচাঁদ বিদ্যানিধি (ওয়াদিপুর) ৩৪) ভুবনমোহন ভট্টাচার্য (রঘুনাথ পুর) ৩৫) গৌরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (সুলতানপুর) ৩৬) আনন্দগোপাল চূড়ামনি (খোসালপুর)৩৭) রামচন্দ্র চূড়ামনি (চানক মনিরামপুর) ৩৮) গঙ্গাধর ভট্টাচার্য (মির্জাপুর) ৩৯) মনোমোহন ভট্টাচার্য (মির্জাপুর) ৪০) নবকুমার চুড়ামনি (বাসুদেবপুর) ৪১) গুরুচরণ শিরোমনি (বাসুদেবপুর) ৪২) ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (বাসুদেবপুর) ৪৩) বদন বাচস্পতি (দেবীপুর) ৪৪) দ্বিজবর বিদ্যারত্ন (দেবীপুর) ৪৫) কার্তিকচন্দ্র ন্যায়রত্ন (অনন্তরামপুর) ৪৬) মাধব শিরোমণি (হাকিমপুর) ৪৭) কালীচরণ চূড়ামনি (ভাগবতীপুর) ৪৮) পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য (মাসুদপুর) ৪৯) বৃন্দাবন ভট্টাচার্য (কমলাপুর) ৫০) কৃত্তিবাস ভট্টাচার্য (পানপুর) ৫১) বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য (বাকিপুর) ৫২) গোলকচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (জগৎনগর) ৫৩) গণেশচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ (গোপালনগর) ৫৪) রামকমল ভট্টাচার্য (কেশবনগর) ৫৪) রামকমল ভট্টাচার্য (কেশবনগর) (৫৫) রামধন ভট্টাচার্য (বাজেপ্রতাপ) ৫৬) দেবীচরণ তর্কালঙ্কার (পোলবাওয়াই) ৫৭) শ্যামচরণ তত্বনিধি (উগারদহ) ৫৮) কাশীনাথ

ভাগবতভূষণ (শশবেড়িয়া) ৫৯) লম্বোধর সার্বভৌম (পূর্বহিজিলা) ৬০) রাঘব তর্কসিদ্ধান্ত (ডেঙ্করগাছা) ৬১) মুক্তারাম বাচস্পতি (সাদড়া) ৬২) রাঘবচন্দ্র তর্কালঙ্কার (মাদড়া) ৬৩) প্রতাপচন্দ্র হালদার (তেঘরি) ৬৪) ভাগবত বিদ্যালঙ্কার (তেঘরি) ৬৫) মদনমোহন তর্কালঙ্কার (মেলে) ৬৭) সারদা বিদ্যাবাগীশ (মেলে) ৬৮) মুক্তারাম ভট্টাচার্য (আদান) ৬৯) উমাচরণ ভট্টাচার্য (আদান) ৭০) গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (ইটারাই) ৭১) শতচন্দ্র চূড়ামনি (ধান্যহানা) ৭২) কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন (হরাল) ৭৩) সীতারাম ভট্টাচার্য (সেয়াগড়) ৭৪) ফকিরদাস ভট্টাচার্য (ভাদুড়া) ৭৫) ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য (দেওয়ানের ভেড়ি) ৭৬) রনরাম ভট্টাচার্য (ধামাইটিকার) ৭৭) নৃসিংহ বিদ্যারত্ন (কাশঁরা) ৭৮) পঞ্চানন বিদ্যালঙ্কার (কাশঁরা) ৭৯) মধুসূদন চূড়ামনি (পাঁচারুল) ৮০) দীননাথ বিদ্যালঙ্কার (পাঁচারুল) ৮১) মধুসূদন চূড়ামনি (বেলকুলি) ৮২) গোপাল শিরোমনি (খলসিনী) ৮৩) ক্ষেত্রনাথ বিদ্যালঙ্কার (ঝিখিরা) ৮৪) ঈশানচন্দ্র বিদ্যার্নব (কাঁকড়াফুলি) ৮৫) রামমোহন তর্কালঙ্কার (নাটাগড়, দিকড়া) প্রভৃতি।

মন্দির প্রতিষ্ঠার মহোৎসব সমাপ্ত হলেও বরাবরের জন্য রানী মা কালীর পূজকপদে সৎসাহসী ও শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমারকেই মনোনীত করায়, রামকুমার দক্ষিণেশ্বরেই থেকে যান এবং কনিষ্ঠা ভ্রাতা গদাধরও পরে তাঁর সঙ্গে করতে থাকেন। রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পূজার ভার দেও?া হয় ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কেঙ্গ তিনি ছিলেন কামারপুকুরের কাছে শিহড় গ্রামের অধিবাসী এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রানীর এস্টেটের কর্মচারী। এইভাবেই শুরুতেই মা কালী ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির দুটির পূজার ভার রাঢ়ীশ্রেণীর চট্টোপাধ্যায় পদাধিকারী দুই ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেন, আর দ্বাদশ শিব মন্দিরের পূজার ভার দেওয়া হয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের। এঁদের মধ্যে উমাচরণ ভট্টাচার্যও ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আজ অবধি উক্ত প্রথায় পূজার কাজ চলে আসছে অর্থাৎ মা কালী ও রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং শিব মন্দিরগুলিতে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ পূজকরূপে নিযুক্ত আছেন। কারণ দেহত্যাগের ঠিক আগের দিন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি রানী রাসমনি যে দানপত্র করেন, সেই দলিলে ভবিষ্যতের পুজার জন্য ও এইরূপ শ্রেণীগত ব্রাহ্মণ দ্বারা পুজার ব্যবস্থার নির্দেশ আছে- কোন বিশেষ বংশের দ্বারা পূজার কোন কথা নেই।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাদির বর্ণনা ঃ-

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাদি উদ্যান, ঘর প্রভৃতির তাৎপর্যসহ বিস্তারিত বিবরণ-

গাজিতলা- দক্ষিণেশ্বর রেলওয়ে স্টেশন থেকে পশ্চিমমুখী গঙ্গার দিকে রানী রাসমনি রোড। এই রাস্তা দিয়ে উদ্যানের প্রধান ফটক (বর্তমানে এ টি বিবেকানন্দ তোরণ নামে অভিহিত-লেখক) পেরিয়ে

কিছুটা অগ্রসর হলে কালী মন্দিরের পূর্বদিকের পুকুরটির নাম গাজিপুকুর' এবং এই গাজিপুকুরের উত্তর পূর্ব কোণে গাজিতলা। এটি জনৈক গাজীপীরের স্থান, যেখানে পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলামধর্ম সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। বর্তমানে এখানে এখ বিরাট অশ্বত্থ গাছসহ স্থানটি বাঁধানো আছে এবং একটি ছোট ফলকে পরমহংসদেবের সাধনার স্থল বলে লেখা আছে। হিন্দুরাও যেমন এখানে প্রণাম করেন, মুসলমানেরাও এটিকে বিশেষ মান্য করেন এবং মাঝে মাঝে এখানে বাতি জ্বালিয়েও যান। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত গাজিপুকুরের আয়তন ২৬০ ফুট লম্বা এবং ১২২ ফুট চওড়া। পশ্চিমদিকের ঘাটে বাসন মাজা হয়। গাজিতলাটি এই উদ্যানের আদি স্থান। কিন্তু হিন্দুদের মন্দির নির্মাণের জন্য, উদারহৃদয়া রানী রাসমনি এটি উচ্ছেদ করেননি বরং বিদেহী বাবা গাজীপীরের স্বপ্নাদেশে তিনি স্বয়ং এটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। গাজিপীরের স্থানটি দেবোত্তর এস্টেটের মধ্যে পড়ায় এটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার এস্টেট বহন করেন এবং এখানকার জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দও করা হয়।

কুটিবাড়িঃ- গাজিতলাকে বামদিকে রেখে, দেবালয়ের বাইরের উদ্যানের প্রধান রাস্তা বরাবর গঙ্গার দিকে অগ্রসর হলে দেবালয়ের উত্তরে এই দোতলা কুঠিবাড়ি। এটিও আদি বাড়ি এবং হেস্টি সাহেবের তৈরি। এটি রানী রাসমনি, তাঁর জামাতা, কন্যা, দৌহিত্র প্রভৃতির আবাস ছিল। জানবাজার থেকে এসে তাঁরা মাঝে মাঝে এখানে বাস করতেন। শেষ জীবনে রানী রাসমনি জানবাজারের বাড়ি চেয়ে অধিকাংশ দিন দক্ষিণেশ্বরে এই কুঠিবাড়িতে বাস করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন রানী রাসমনির ব্যবস্থাপনায় এই কুঠিবাড়ির একতলার পশ্চিমের ঘরে বাস করতেন। এখানে ঠাকুরের অবস্থান ১৮৫৫ থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি। এই সময়ের মধ্যে ঠাকুরের মতো চন্দ্রমনি দেবীও প্রথমাবস্থায় এখানে বাস করেছিলেন এবং পরেঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের একমাত্র পুত্র রামঅক্ষয় তথা অক্ষয় ও কিছুদিন এখানে বাস করেছিলেন। কিন্তু এই বাড়িতেই অক্ষয়ের মৃত্যু হওয়ায় পরবর্তীকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কুঠিবাড়ি ত্যাগ করেন এবং মন্দির প্রাঙ্গনের বর্তমান ঘরে (যেটি এখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর নামে চিহ্নিত) চলে আসেন। মাতা চন্দ্রমনিকে তখন কুঠিবাড়ির পাশে নহবত বাড়িতে রাখা হয়েছিল। সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর। এই কুঠিবাড়ির ছাদ থেকেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনাগত ভক্তদের উদ্দেশ্যে আহ্বান করতেন- ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস, শীঘ্র আয়। অতঃপর সত্যসত্যই একে একে সকল ভক্তদের সমাগম হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কথামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ঠাকুরকে জগন্মাতা বলিয়াছেন, তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি নিয়ে থাক জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না। অনেক শুদ্ধ কামনাবাসনাশূন্য ভক্ত আছে, তারা আসবে। ঠাকুরবাড়িতে আরতির সময় যখন কাঁসরঘন্টা বাজিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠিতে

গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, ওরে ভক্তেরা, তোরা কে কোথায় আছিস শীঘ্র আয়। এই বিষয়ে ঐ গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে- উঠানের দেউড়ি হইতে উত্তরমুখে বহির্গত হইয়া দেখা যায় সম্মুখে দ্বিতল কুঠি। ঠাকুর বাড়িতে আসিলে রানী রাসমনি তাঁহার জামাই মথুরবাবু প্রভৃতি এই কুঠিতে থাকিতেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব এই কুঠিবাড়ির নিচের পশ্চিমের ঘরে থাকিতেন। এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায় ও বেশ গঙ্গাদর্শন হয়। যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বর্তমানে কুঠিবাড়ির একতলায় একটি পুলিশ ক্যাম্প আছে।

নহবতখানাঃ

এখানে নহবতখানা দুটি-একটি দক্ষিণদিকের বাগানে, এখন এটি বন্ধ থাকে। অপরটি দেবালয়ের বাইরে উত্তরদিকে এবং কুঠিবাড়ির পশ্চিমদিকে। আগে দুটি নহবতখানা থেকেই নহবত বাজানো হত। তখন ভোর থেকে রাত্রি অবধি নিয়মিত ৬ বার নহবত বাজানোর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে একেবারেই বাজানো হয় না। কেবলমাত্র মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে, অর্থাৎ স্নানযাত্রার দিন সানাই বাজানো হয় বটে, তবে নহবত থেকে নয়- মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। এখন ভোগারতির সময় কেবলমাত্র ঢাকঢোল কাঁসি প্রভৃতি নিত্য বাজানো হয়। কুঠিবাড়ির পশ্চিমের এই নহবতখানায় ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমনি দেবী গঙ্গালাভের পূর্ব পর্যন্ত বাস করেছিলেন এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও এই নহবতখানার নিচের একটি সঙ্কীর্ণ ঘরে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। যে ঘরটিতে শ্রীশ্রীমা বাস করতেন, সেই ঘরটি অষ্টভুজ। এক দেওয়াল থেকে অপর দেওয়ালের সর্বাধিক দূরত্ব ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি। মেঝের মাপ ৫০ বর্গফুট। বারান্দার চওড়া ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। দক্ষিণ দুয়ারি একটি মাত্র দরজার মাপ ৪-২ ,২-২ এই ঘরে শ্রীশ্রীমা আনুমানিক ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ থেকে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ অবধি বাস করেছিলেন। যদিও এই সময়ের মধ্যে মাঝে মাঝে অন্যত্রও বাস করেছেন। এই সময়েই গোলাপ মা, যোগীন -মা, গৌরী মা প্রভৃতি স্ত্রীভক্তগণও মাঝে মাঝে এখানে এসে বাস করতেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুস্পুত্রী শ্রীমতী লক্ষীমনি দেবীও এখানে প্রায় ১৩ বছর শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে একত্রে বাস করেছেন। তাঁরা উভয়ে পিঞ্জরপ্রায় এই নহবত ঘরে একত্রে বাস করতেন বলে, ঠাকুর রহস্য করে তাঁদের শুক-সারি বলে ডাকতেন। একদা নহবতঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ফটো সাজিয়ে শ্রীশ্রী মা যখন গোপনে পূজার আয়োজন করেছিলেন সেসময় সহসা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে প্রবেশ করে ভাবস্থ হন এবং নিজের সেই ফটোর উপর দু একটি ফুল রেখে দেন। বর্তমানে এখানে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতিকৃতিতে নিত্যপূজা হয় এবং এটিকেই শ্রীশ্রীমায়ের ঘর নামে অভিহিত করা হয়। এই নহবতখানা প্রসঙ্গে কথামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে - পরমহংসদেবের ঘরের ঠিক উত্তরে একটি চতুষ্কোণ বারান্দা, তাহার উত্তরে

উদ্যানপথ। তাহার উত্তরে পুষ্পোদ্যান। তাহার পরেই নহবতখানা। নহবতের নিচের ঘরে তাঁহার স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানি ও পরে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন। নহবতের পরেই বকুলতলা ওবকুলতলার ঘাট। এখানে পাড়ার মেয়েরা স্নান করেন। এই ঘাটে পরমহংসদেবের বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরানীর গঙ্গালাভ হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আসার পূর্বে ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমনি দেবী এখানে নিচের তলাতেই প্রথমাবস্থাতেই বাস করতেন। পরে এটির ওপরের ঘরে আমৃত্যু বাস করেছিলেন (আনুমানিক ১৮৭০-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে)। রানী রাসমনির মন্দিরঃ নহবতখানার দক্ষিণে এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের বাইরে উত্তর দিকে মন্দিরপ্রতিষ্ঠাত্রী, পণ্যশ্লোকা রানী রাসমনি দেবীর শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত অপূর্ব মূর্তিসহ একটি সুন্দর ছোট মন্দির। এটি অবশ্য অনেক পরে স্থাপিত। বাংলা ১২৬২ সন (ইংরেজী ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) স্নানযাত্রার দিনে দেবালয় স্থাপিত হওয়ার, একশত বছর বাদে বাংলা ১৩৬১ সনের ১ আষাঢ় (ইংরেজী ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুন) স্নানযাত্রার দিনে মন্দির প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী, উপলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এস্টেট কর্তৃক এই মন্দির স্থাপন করা হয়। এখানেও রানি রাসমনি দেবীর মূর্তিকে নিত্য পূজা করা হয়। রানীমার জন্মদিনে এখানে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে।

শিবমন্দিরঃ- কুঠিবাড়ির বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে দেউড়ি দিয়ে দেবালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান ফটক। প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে গঙ্গার সন্নিকটে উত্তর দক্ষিণ বরাবর সরলরেখায় সারি সারি ১২ টি শিবের মন্দির। শিবলিঙ্গগুলি সবই কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত। মন্দিরগুলি সব পূর্বমুখী এবং ভিতরগুলি শ্বেত ও কৃষ্ণপ্রস্তরে মন্ডিত। প্রত্যেকটি মন্দিরই এক মাপের এবং দেখতেও একই রকম। সবগুলিই আটচালা শৈলীর এবং উঁচু ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরগুলির সারি দুভাগে বিভক্ত উত্তর দিকে ৬টি মন্দির, মাঝখানে চাঁদনি, আবার দক্ষিণ দিকে ৬ টি মন্দির। চাঁদনির উত্তর দিকের ৬ টি মন্দিরের শিবলিঙ্গগুলির নাম যথাক্রমে যোগেশ্বর, রত্নেশ্বর, জটিলেশ্বর, নকুলেশ্বর, নাগেশ্বর ও নির্জরেশ্বর আর চাঁদনির দক্ষিণ দিকের ৬ টি মন্দিরের শিবলিঙ্গগুলির নাম, যথাক্রমে - যজ্ঞেশ্বর, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নদেশ্বর,নন্দীশ্বর ও নরেশ্বর। সোপকরণ সামান্য নৈবেদ্য উপাচারে প্রতিটি শিবকে নিত্যপূজা করা হয়। এছাড়া শিবরাত্রিতে নীলপূজায় ও চড়কের দিনে এবং স্নানযাত্রায় দেবালয় প্রতিষ্ঠার দিনেও বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাধন অবস্থার প্রথম দিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন শিব মন্দিরে শিবমহিম্নঃস্তোত্র আবৃত্তি রতে করতে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং ভাবাধিক্যে মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব- চিৎকার করে বারবার এই কয়টি কথাই বলতে থাকেন

এবং কাঁদতে থাকেন। মন্দিরের কর্মচারীরা এটিকে পাগলামি মনে করে। জোর করে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে আনাই সাব্যস্ত করেন। কিন্তু গোলমালশুনে রানীমার জামাতা মথুরমোহন ঘটনাস্থলে আসায়, কর্মচারীরা আর কিছু করতে সাহস পায়নি। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে, সেখানে কর্মচারীদের সঙ্গে মথুর মোহনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি সরল বালকের মতো ভয়ে ভয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি বেসামাল হয়ে কিছু করে ফেলেছি কী? মথুরমোহন তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, না বাবা, তুমি স্তবপাঠ করেছিলে. পাছে কেউ না বুঝে তোমায় বিরক্ত করে, তাই আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।

চাঁদনি ঃ দু সারি শিবমন্দিরগুলি মাঝখানে চাঁদনি। চাঁদনির পরে পশ্চিমদিকে গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার সুবিস্তৃত সিঁড়ি ও পোস্তা। ঘাটের সুবৃহৎ এই চাঁদনিতেই প্রথমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বৈদান্তিক গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমন হয়েছিল। নৌকাযোগে যাঁরা আসেন. তাঁরা এখানে এসে প্রথমে চাঁদনিতে ওঠেন। কথামৃত গ্রন্থে তৎকালীন চাঁদনি সম্পর্কে বর্ণনায় আছে- কালীবাড়িটি কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে হইবে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নৌকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী দিয়া পূর্বাস্য হইয়া উঠিয়া কালীবাড়িতে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘাটে পরমহংসদেব স্নান করিতেন সোপানের পরেই চাঁদনি। সেখানে ঠাকুরবাড়ির চৌকিদারেরা থাকে। তাহাদের খাটিয়া. আমকাঠের সিন্দুক. দুই একটি লোটা সেই চাঁদনির মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাবুরা যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, কেহ কেহ সেই চাঁদনিতে বসিয়া খোলগল্প করিতে করিতে তেল মাখেন। সে সকল সাধু ফকির. বৈষ্ণব বৈষ্ণবী অতিথিশালার প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তাঁহারাও কেহ কেহ ভোগের ঘন্টা পর্যন্ত এই চাঁদনিতে অপেক্ষা করেন। কখনো কখনো দেখা যায়, গৈরিকবস্ত্রধারিনী ভৈরবী ত্রিশূল হস্তে এই স্থানে বসিয়া আছেন। তিনিও সময় হলে অতিথিশালায় যাইবেন। চাঁদনিটি দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মধ্যবর্তী। তন্মধ্যে ছয়টি মন্দির চাঁদনির উত্তরে, আর ছয়টি চাঁদনির ঠিক দক্ষিণে। নৌকাযাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দূর হইতে দেখিয়া বলিয়া থাকে ঐ রাসমনির ঠাকুরবাড়ি।

বিষ্ণুমন্দিরঃ প্রাঙ্গণের উত্তর পূর্ব দিকে বিষ্ণমন্দির বা রাধাকান্তের মন্দির। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। মন্দিরতল মর্মর প্রস্তরে বাঁধানো। উঠান থেকে কয়েক ধান উঠে উত্তর -দক্ষিণে বিস্তৃত চাল। তার পর সাতটি খিলানযুক্ত বারান্দা। মন্দিরের ভেতরে সোপানযুক্ত মর্মরবেদির ওপর রূপার সিংহাসন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তরে এবং শ্রীরাধার মূর্তিটি অষ্টধাতুর নির্মিত। মূর্তিগুলি পশ্চিমাস্য। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের উচ্চতা ১৬ ইঞ্চি, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের নাম শ্রীশ্রী জগমোহন কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার বিগ্রহের নাম শ্রীশ্রীজগমোহিনী রাধা। এই নামেই এঁদের এখানে নিত্য পূজা হয়। এখানে নিরামিষ

ভোগের ব্যবস্থা। স্নানযাত্রায় অর্থাৎ দেবালয় প্রভৃতি বিষ্ণু অর্চনার বিশেষ দিনগুলিতে এখানে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। এটি রাধাকান্তের মন্দির হলেও বিষ্ণুমন্দিরও বলা হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমাবস্থায় কিছুদিন এখানে পূজা করেছিলেন এবং সাধনাও করেছিলেন। পরে মধুরভাবের সাধনার সময়েও তিনি এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলেন। মন্দিরের অন্য একটি ঘরে যে কৃষ্ণমূর্তিটি দেখা যায়, সেটি আদি ও ভগ্ন মূর্তি। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দোৎসবে শয়ন দেবার সময় এই মূর্তিটির একটি পা তৎকালীন পুরোহিতের অসাবধানতায় ভেঙে যাওয়া সেটিকে পরিত্যাগ করে পুনরায় একটি কৃষ্ণমূর্তি স্থাপনের আগ্রহে রানী রাসমনির আমলেই দ্বিতীয় একটি একই ধররে কৃষ্ণমূর্তি তৈরি করা হয়। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ ভাঙা পা-টি ঠিকমতো জুড়ে দিয়ে আবার পূজার বিধান দেওয়ায় দ্বিতীয় বিকল্প মূর্তিটিকে প্রথমাবস্থায় পৃথক ঘরে রক্ষা করা হয়। পরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এস্টেটের ট্রাস্টিগণ কর্তৃক বিকল্প মূর্তিটিকে যথাস্থানে রাধাবিগ্রহের পাশে স্থাপন করা হয় এবং ভাঙা মূর্তিটিকে (যেটি শ্রীরামকৃষ্ণ জুড়ে দিয়েছিলেন) পাশের ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ, ১৯২৯খ্রীষ্টাব্দে দেবদেবীর অঙ্গরোগের সময় জোড়া দেওয়া কৃষ্ণমূর্তিটির পা আবার ভেঙে গিয়েছিল এবং সেটিকে কোনক্রমে সামরিক জোড়া দেওয়া হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য একদা এই বিষ্ণুমন্দিরের সিঁড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে বসেথাকার সময় ঠাকুরের ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর বন্ধু ফটোগ্রাফার অভিনাশচন্দ্র দাঁকে আনিয়ে ঠাকুরের ফটো তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাগ্যবান অবিনাশ সমাধিমগ্ন অবস্থায় ঠাকুরের সেই দুর্লভ সমাধিস্থ দেহ কিছু বাঁকা থাকায়, অবিনাশ তাঁকে ঠিকমতো বসাবার জন্য কাছে এসে তাঁর দেহ স্পর্শ করেন। কিন্তু ঠাকুরের দেহ ও চরণ দুটি ঠিকভাবে বসাতে গিয়ে তিনি দেহখানির অতীব কোমলতা অনুভব করেন। অবিনাশ ইতিপূর্বে সমাধি অবস্থার বিষয় সম্পর্কে কিছু না জানায়, ঠাকুরের দেহ স্পর্শ করে দেখেন যে, তা তুলোর মতো হালকা এবং বেশি নাড়াচাড়া করলে হয়তো তা শূন্যে উঠে যেতে পারে। এই ঘটনায় অবিনাশ ভীত ও বিচলিত হয়ে ঠাকুরকে নাড়াচড়া বন্ধ করেন এবং যথাস্থানে ক্যামেরার কাছে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি তাঁর ফটো গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশি তাড়াতাড়িতে ফটোর নেগেটিভ কাঁচটি তার হাত থেকে অসাবধানতাবশত পড়ে যাওয়ার ফলে সেটির ওপরের অংশের সামান্য একটু ভাগ ভেঙে যায়, অবশ্য মূল ছবিখানি অবিকৃত থাকে। পরে এই ফটো ঠাকুরকে দেখালে তিনি বলেছিলেন, এই ছবি একদিন ঘরে ঘরে পূজা পাবে। বলা বাহুল্য,ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থায় বসা, প্রচলিত যে ছবিটি এখন সর্বত্র পূজা হয়, তা ভবনাথের উদ্যোগে অবিনাশচন্দ্র দাঁয়ের সেই বিখ্যাত ছবি। এই ছবিটির সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরের স্মৃতি জড়িত থাকায়, এই বিশেষ ঘটনাটি

এখানে উল্লেখ করা হলো। কথামৃত গ্রন্থে বিষ্ণুমন্দির সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা আছে- চাঁদনি ও দ্বাদশ মন্দিরের পূর্ববর্তী ইষ্টক নির্মিত পাকা উঠান। উঠানের মাঝখানে সারি সারি দুইটি মন্দির। উত্তরদিকে রাধা কান্তের মন্দির। তাহার ঠিক দক্ষিণে মা কালীর মন্দির। রাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। পশ্চিমাস্য। সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরতল মর্মর প্রস্তরাবৃত। মন্দিরের সম্মুখস্ত দালানে ঝাড় টাঙানো আছে এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের আবরণী দ্বারা রক্ষিত। একটি দ্বারবান পাহারা দিতেছে। অপরাহ্নে পশ্চিমের রৌদ্রে পাছে ঠাকুরের কষ্ট হয়, তাই ক্যাম্বিসের পর্দার বন্দোবস্ত আছে। দালানের সারিসারি খিলানের কুকুর উহাদের দ্বারা আবৃত হয়। দালানের দক্ষিণ পূর্ব কোণে একটি গঙ্গাজলের জালা। মন্দিরের চৌকাঠের নিকট একটি পাত্রে শ্রীচরণামৃত। ভক্তেরা আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া ঐ চরণামৃত লইবেন। মন্দির মধ্যে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে পূজারীর কার্যের প্রথম ব্রতী হন- ১৮৫৭ -৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।

কালীমন্দিরঃ প্রাঙ্গণের পূর্বদিকের মাঝামাঝি এবং বিষ্ণুমন্দিরের দক্ষিণ দিকে দক্ষিণমুখী কালী মন্দিরের পাযাণময়ী মা কালীর মূর্তিটিও দক্ষিণমুখী। দেবীর বিশাল ও মনোহব মন্দিরটি নববত্নচূড়া বিশিষ্ট, অর্থাৎ মন্দিব শীর্ষে নীচুতলার চারটি চূড়া তার ওপরে মাঝঅংশ আরো চারটি চূড়া এবং সবার ওপরে একেবারে শীর্ষদেশে মূলচূড়া- সবসমেত নয়টি। প্রতিটি চূড়া এবং মন্দির গাত্রের শিল্পকাজগুলি স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। মন্দিরটি দেখে প্রস্থে প্রায় ৫০ ফুট, উচ্চতায় প্রায় ১০০ ফুট। গর্ভমন্দিরটি দৈর্ঘ্যে- প্রস্থে প্রায় ১৫ ফুট। গর্ভমন্দির মধ্যে কালো কষ্টিপাথরের তৈরি দক্ষিণাকালী মূর্তিটির উচ্চতা ৩৩ ইঞ্চি। কথিত হয়, মায়ের এই মুর্তি নির্মাণ করেছিলেন হাওয়া জেলার দাঁইহাট নিবাসী নবীন ভাস্কর। দেবীর নাম শ্রীশ্রী জগদীশ্বরী কালী, কিন্তু ভক্তগণের কাছে তিনি ভবতারিনী নামে পরিচিতা। ভবতারিনী নামকরণ সম্পর্কে কালীজীবন দেবশর্মা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেনঃ ভবতারিনী দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের শক্তি বিগ্রহের নাম। এই নামটি রানী রাসমনির গুরুদেবের দেওয়া। তিনি নবদ্বীপের পোড়ামাঠ বা পোড়া মাতলার সাধন ভজন করিতেন এবং নিকটবর্তী ভবতারিনী কালীমাতার মন্দিরে জল ধ্যান ও প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই মন্দির ও তন্মধ্যস্থ বিগ্রহ ১২৩২ বঙ্গাব্দে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র গিরিশ চন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই ভবতারিনীর নামানুসারেই গুরু দেব দক্ষিণেশ্বর কালীমাতার নামও ভবতারিনী রাখেন। এই মন্দিরের অভ্যন্তর ও বিগ্রহ সম্পর্কে কথামৃত গ্রন্থে অপূর্ব বর্ণনা আছে- দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালী প্রতিমা। মার নাম ভবতারিনী। শ্বেতকৃষ্ণ মর্মর প্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চবেদি। বেদির উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, দক্ষিণ দিকে মস্তক উত্ত দিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী চেলিপরিহিতা

নানাভবনালঙ্কৃত এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্তি। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর গুজরি পঞ্চম, পাঁজের চুটকি আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজের পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারী সাধ, তাই মথুরবাবু পরাইয়াছেন। মার হাতে সোনার বাউটি, তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে- বালা, নারিকেল, ফুল, পঁইচে বাউটি, মধ্যহাতে তাড়, তাবিজ ও বাজু, তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর তারাহার ও সুবর্ণনির্মিত মুন্ডমাল মাথার মুকুট, কানে কানবালা, কানপাশ, ফুলঝুমকো, চৌদানি ও মাছ। নাসিকায় নথ, নোলক দেওয়া। ত্রিনয়নীর বাম হস্তদ্বয় নৃমুন্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটি দেশে নরকর মালা, নিমফুল ও কোমরপাটা। মন্দির মধ্যে উত্তরপূর্ব কোণে বিচিত্র শয্যা- মা বিশ্রাম করেন। দেওয়ালের একপার্শ্বে চামর ঝুলিতেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ চামর লইয়া কতবার মাকে ব্যজন করিয়াছেন। বেদির উপর পদ্মাসনে রূপার গেলাসে জল। তলায় সারি সারি ঘটি, তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপর পশ্চিমে অষ্টধাতুনির্মিত সিংহ, পূর্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদির উঠিবার সোপানে রোপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনে পরি নারায়নশিলা, একপার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্মিত রামলালা নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ মূর্তি ও বানেশ্বর শিব। আরও অন্যান্য দেবতা আছেন। দেবীপ্রতিমা দক্ষিণাস্যা। ভবতারিনী ঠিক সম্মুখে, অর্থাৎ বেদির ঠিক দক্ষিণে ঘটস্থাপনা হইয়াছে। সিন্দুররঞ্জিত পূজান্তে নানাকুসুমবিভূষিত, পুষ্পমালাশোভিত, মঙ্গলঘট। দেওয়ালের একপার্শ্বে জলপূর্ণ তামার ঝারি বা মুখ ধুইবেন। উর্দ্ধে মন্দিরে চাঁদোয়া, বিগ্রহের পশ্চাৎদিকে সুন্দর বারানসী বস্ত্রখন্ড লম্বমান। বেদির চারিকাণে রোপ্যময় স্তম্ভ। তদুপরি বহুমূল্য চন্দ্রাতপ উহাতে প্রতিমার শোভাবর্ধন হইয়াছে। মন্দির দুহারা দালানটির কয়েকটি ফুকর সুদৃঢ় কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। একটি কপাটের কাছে চৌকিদার বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারের দ্বারে পঞ্চপাত্র শ্রীচরণামৃত। এই মন্দিরে এবং রাধাকান্তের ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মাতৃসাধনার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখানকার দেবী মূর্তিকে জীবন্তজ্ঞানে পূজা করতেন, প্রত্যক্ষ দর্শন করতেন ,মূর্তির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতেন, মূর্তিকে খাইয়ে দিতেন, মূর্তিকে গান শোনাতেন। এইসব অভিনব ঘটনাগুলি আজ সর্বজনবিদিত। এই খানেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে সকল হয়েছিলেন এবং বৈধিভক্তির নিয়মাদি উল্লঙঘন করে কেবলমাত্র অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতার সহায়ে নিজেই দেবীর সচল বিগ্রহ- এ পরিণত হয়েছিলেন।

ফলে আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে অশুভ ক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রাচ্যের তথা ভারতের শুভকারী সনাতন আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এইখানেই বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং পরবর্তী কালে সমগ্র জগৎকে আকৃষ্ঠ করেছিল, একথা বলাই বাহুল্য। এই কালী মন্দিরে নিত্যপূজা

এবং আমিষ ভোগের ব্যবস্থা আছে। কেবলমাত্র একজন সেবায়েতের পালায় বলিদান হয় না এবং নিরামিষ ভোগ দেওয়া হয়। এখানে বলিদানের প্রথা আছে, তবে কোন ভক্তের মানসিক পূজায় বলিদানের ব্যবস্থা নেই। প্রতি অমাবস্যা, দুর্গাপূজায় তিনদিন, বাসন্তীপূজার তিনদিন, জগদ্ধাত্রীপূজা মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন (স্নানযাত্রা) দীপান্বিত কালীপূজা, মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন (স্নানযাত্রা) দীপান্বিতা কালীপূজা, ফলহারিনী কালীপূজা এবং রটন্তী কালীপূজার দিনে এখানে বলিদান হয়। আবার দীপান্বিতা কালীপূজায় ছাগ বলিদানের সঙ্গে মেষ ও মহিষ বলিদান হয়। এই বলিদান সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসিক অবস্থা প্রসঙ্গে কথামৃত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- মহানিশা পূজা আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা দেখিতে আসিয়াছেন। মার কাছ গিয়া দর্শন করিতেছেন। এইবার বলি হইবে- লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বধ্য পশুর উৎসর্গ হইল। পশুকে বলিদানর জন্য লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ত্যাগ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুরের সে অবস্থা নয়, পশুবধ দেখিতে পারিবেন না। (ইদানীং কালে মন্দিরে সকলপ্রকার পশু বলিদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। - লেখক) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর, কার্তিক মাসে কালীপূজার দিন দক্ষিণেশ্বরে মা কালী মন্দিরে সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুস্পুত্র শিবরামের পৌত্র গুরুদাস মায়ের পূজায় ব্রতী হন। পূজার আগে গুরুদাস গঙ্গার ঘাটে মা কালীর ঘটের জল আনতে গিয়ে অকস্মাৎ গঙ্গার জলে সলিল সমাধি হন এবং সেজন্য সেই একদিনই মায়ের পূজায় বিঘ্ন ঘটে। এই মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নানা লীলাকাহিনী, সংক্ষিপ্ত আকরে অন্যত্র বিবৃত করা হয়েছে।

নাটমন্দিরঃ- কালী মন্দিরের সামনে, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে অনেকগুলি স্তম্ভ বিস্তৃত প্রশস্ত এক নাটমন্দির। নাটমন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৫০ ফুট ও প্রস্থে ৭৫ ফুট। ষোলটি বৃহৎ স্তম্ভের ওপর ছাদ। চারিদিক উন্মুক্ত নাটমন্দিরের ওপরে উত্তর মুখী মহাদেব, নন্দী ও ভৃঙ্গী মূর্তি স্থাপিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালী মন্দিরে প্রবেশের আগে এই মহাদেবকেই প্রথমে প্রণাম করতেন। নাটমন্দিরের দক্ষিণ দিকের প্রাঙ্গণে ইটের তৈরি বেদিতে বলিদান মঞ্চ। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভের পর, ভৈরবী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবতাররূপে প্রমান করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মথুরবাবু এখানে অন্নমেরু উৎসব করেছিলেন। একদা এখানে চন্ডীগান, যাত্রা গান, হরিকথা প্রভৃতির আসর বসত। বর্তমানেও ভক্তদের আগ্রহে প্রায় নিত্যই এখানে ভজন-কীর্তনাদি হয় এবং মাঝে মাঝে বিশেষ ধর্মানুষ্ঠানও হয়। নাটমন্দির প্রসঙ্গে কথামৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে- কালীমন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে সুন্দর সুবিস্তৃত নাটমন্দির। নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রী মহাদেব ও নন্দী ও ভৃঙ্গি। মারমন্দিরে প্রবেশ করিবার

পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাদেবকে হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিতেন। যেন তাঁহার আজ্ঞা লইয় মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন। নাট মন্দিরের উত্তর দক্ষিণে স্থাপিত দুই সারি অতি উচ্চ স্তম্ভ। তদুপরি ছাদ। স্তম্ভশ্রেণীর পূর্ব দিকে ও পশ্চিমদিকে নাটমন্দিরের দুই পক্ষ। পূজার সময় মহোৎসবকালে। বিশেষত কালীপূজারদিন, নাটমন্দিরের যাত্রা হয়। এই নাটমন্দিরেই সর্বসমক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীপূজা করিয়াছিলেন।

দালান বাড়িঃ মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিক ছাড়া বাকি তিনদিকেই অনেকগুলি ঘর এবং মন্দির প্রাঙ্গণে আসার জন্য তিনদিকেই প্রবেশ পথ। পূর্বদিকের সীমানায় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একতলা দালান বাড়িতে ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর, ভোগের ঘর, আহারের স্থান প্রভৃতি আছে। প্রাঙ্গণের পূর্ব দক্ষিণ সীমানায় একতলা ঘরগুলিতে মন্দিরের কর্মচারীদের থাকার স্থান এবং বাকি দক্ষিণ দিকের অংশে দপ্তর ও সেবায়েতগণের ব্যবহারের জন্য ঘর। প্রাঙ্গণের উত্তর সীমানায় দেউড়ির কাছে দুপাশে বারান্দাসংলগ্ন অনুরূপ কয়েকটি ঘর। দুপাশেই দেউড়ির ঘরে দারোয়ানেরা থাকে এবং দেউড়ির বাম দিকে অর্থাৎ পূর্ব প্রান্তে মন্দিরের পুরোহিত প্রভৃতি বাসের স্থান। দালানবাড়ির তৎকালীন বর্ণনায় কথামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে- চকমিলানো উঠানের পশ্চিমপার্শ্বে দ্বাদশ মন্দির আর তিন পার্শ্বে একতলা ঘর, পূর্বপার্শ্বের ঘরগুলির মধ্যে ভাঁড়ার, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যের ঘর, মায়ের ভোগ ঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর ও অতিথিশালা।

অতিথি, সাধু যদি অতিথিশালায় না খান, তাহা হইলে দপ্তরখানায় খাজাঞ্চির কাছে যাইতে হয়। খাজাঞ্চি ভান্ডারীকে হুকুম দিলে, সাধু ভাঁড়ার হইতে সিধা লন। নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান। বিষ্ণুঘরের রান্না নিরামিষ। কালীঘরের ভোগের ভিন্ন রন্ধনশালা। রন্ধনশালার সম্মুখে দাসীরা বড় বড় বটি লইয়া মাছ কুটিতেছে। অমাবস্যায় একটি ছাগ বলি হয়। ভোগ দুই প্রহর মধ্যে হইয়া যায়। ইতিমধ্যে অতিথিশালায় এক একখানা মালতাপা লইয়া সারি সারি কাঙাল, বৈষ্ণব, সাধু, অতিথি বসিয়া পড়ে। ব্রাহ্মণদের পৃথক স্থান করিয়া দেওয়া হয়। কর্মচারী ব্রাহ্মণদের পৃথক আসন হয়। জানবাজারের বাবুরা আসিলে কুঠিতে থাকেন। সেইখানে প্রসাদ পাঠানো হয়। উঠানের দক্ষিণে সারি সারি ঘরগুলিতে দপ্তরখানা ও কর্মচারীদের থাকিবার স্থান। এখানে খাজাঞ্চি, মুহুরি সর্বদা থাকেন, আর ভান্ডারী, দাস-দাসী, পূজারী, রাঁধুনি, ব্রাহ্মণ ঠাকুর ইত্যাদির ও দ্বারবানদের সর্বদা যাতায়াত। কোন কোন ঘর চাবি দেওয়া, তন্মধ্যে ঠাকুরবাড়ির আসবাব, শতরঞ্জ, শামিয়ানা ইত্যাদি থাকে। এই সারির কয়েকটি ঘর পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভাঁড়া ঘর করা হইত। তাহার দক্ষিণ দিকের ভূমিতে মহামহোৎসবের রান্না হইত।

উঠানের উত্তরে একতলা ঘরের শ্রেণী। তাহার ঠিক মাঝখানে দেউড়ি। চাঁদনির ন্যায় সেখানেও দ্বারবানেরা পাহাড়া দিতেছে। উভয়স্থানে প্রবেশ করিবার পূর্বে বাহিরে জুতা রাখিয়া যাইতে হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর ঃ মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণে শেষ শিবমন্দিরের ঠিক উত্তরে যে ঘরটি আছে, সেখানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শেষের দিকে প্রায় ১৪ বছর বাস করেছিলেন এবং বর্তমানে সেই ঘরটিই শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর বা ঠাকুরের ঘর নামে ভক্তদের কাছে পরিচিত। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুন ফলহারিনী কালী পূজার রাত্রে ঠাকুর এই ঘরে শ্রীশ্রী মা সারদাদেবীকে মাতৃজ্ঞানে ষোড়শী পূজা করেছিলেন। ত্যাগী সন্তানদের নিভৃতে শিক্ষাদান, কৃপাদান, জল ধ্যান ভজন কীর্তন সমাধি প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের নানা লীলামুখর স্মৃতিবিজড়িত এই বিশেষ ঘরটি ভক্তদের কাছে বিশেষ প্রিয়। এই ঘরেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত ২ খানি তক্তপোশ, চৌকি প্রভৃতি সযত্নে ও পবিত্রভাবে রক্ষিত আছে। দেওয়ালের গায়ে তৎকালীন কিছু ছবি এবং ইদানীং কালেরও অনেক ছবি টাঙানো আছে। তাছাড়া বুদ্ধদেব মূর্তি, যীশুখ্রীস্টের ছবি প্রভৃতিও পূর্বের মতোই এখনো বর্তমান। এমনকি যে গঙ্গাজলের জালা থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জল নিয়ে পান করতেন, সেটিও জলপূর্ণ অবস্থায় যথাস্থানে সংরক্ষিত আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমাবস্থায় রানি রাসমনি ও মথুরমোহন বিশ্বাসের ব্যবস্থাপনায় কুঠিবাড়িতে বাস করলেও সেই কুঠিবাড়িতেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের অকালমৃত্যু হওয়ায়, ঐ বাড়িটি ত্যাগ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু স্থান পরিবর্তনের কোন সুযোগ তিনি তখন পাননি। অবশেষে কিছু কাল পরে কুঠিবাড়িটি চুনকাম করার প্রয়োজন হওয়ায়, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে এই ঘরটিতে সাময়িকভাবে চলে আসেন এবং মাতা চন্দ্রমনিকে কুঠিবাড়ির পশ্চিমদিকে নহবত বাড়িতে রাখা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণের এই ঘরটি তখন বিষ্ণুমন্দিরের ভাঁড়ার ঘর রূপে ব্যবহৃত হতো। কুঠিবাড়ির চুনকাম শেষ হওয়ার পরেও শ্রীরামকৃষ্ণ এই ঘর বরাবর থাকার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় মথুরমোহন এই সময় মন্দিরের পূর্বদিকের সীমানায় উত্তর দক্ষিণ বরাবর একতলা দালান বাড়ির একটি ঘরে ভাঁড়ার স্থানান্তরিত করেন। এই ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের শেষভাগে প্রায় ১৪ বছর এই ঘরে বাস করেছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুই এই ঘর পরিবর্তনের প্রধান কারণ। ঠাকুরের জন্মতিথি, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি ঠাকুরের কল্পতরু উৎসবে এখানে বিশেষ পূজা, হোম ও অন্নভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি এখানকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল প্রয়াত রাজাগোপালাচারী। এই ঘরের পশ্চিমদিকে দরজার ধারে গঙ্গার দিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বারান্দা,

আর পূর্ব দিকে প্রাঙ্গণে আসার জন্য পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা আরেকটি বারান্দা। এই বারান্দার মধ্যবর্তী দেওয়ালটি বারান্দাটিকে দুভাগে বিভক্ত করেছে। দক্ষিণ ভাগে অর্থাৎ মন্দির প্রাঙ্গণের দিকের অংশে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ করতেন। বর্তমানে এই অংশে ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম বংশধর শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের ধর্মীয় পুস্তক ও দেবদেবীর ছবি বিক্রয়ের একটি দোকান আছে। এই ঘরের বাইরে উত্তরে আরেকটি চতুষ্কোণ বারান্দা ও তৎসংলগ্ন পূর্ব-পশ্চিমের বারান্দার উত্তর ভাগে ঠাকুর কেশবাদি ভক্তসঙ্গে সাধারণত আলাপ আলোচনা করতেন। এই প্রসঙ্গে কথামৃত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে- 'উঠানের ঠিক উত্তর পশ্চিম কোণে, অর্থাৎ দ্বাদশ মন্দিরের ঠিক উত্তরে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের ঘর। ঘরের ঠিক পশ্চিমদিকে অর্ধমন্ডলাকার একটি বারান্দা। সেই বারান্দায় শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন। এই বারান্দার পরেই পথ। তাহার পশ্চিমে পুষ্পোদ্যান, তৎপরে পোস্তা। তাহার পরেই পূতসলিলা সর্বতীর্থময়ী কলকলনাদিনী গঙ্গা। পরমহংসদেবের ঘরের পূর্বদিক বরাবর বারান্দা, বারান্দা এক ভাগ উঠানের দিকে, অর্থাৎ দক্ষিণমুখো। এ বারান্দায় পরমহংসদেবপ্রায় ভক্তসঙ্গে বসিতেন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা কহিতে বা সংকীর্তন করিতেন। এই পূর্ব বারান্দায় অপরার্ধ উত্তরমুখো। এ বারান্দায় ভক্তেরা তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন, তাঁহার সঙ্গে বসিয়া সঙ্কীর্তন করিতেন। আবার তিনি তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া কতবার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই বাবান্দায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন শিষ্যসমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কত আলাপ করিয়াছেন, আমোদ করিতে করিতে মুড়ি, নারিকেল, লুচি, মিষ্টান্নাদি একসঙ্গে বসিয়া খাইয়া গিয়াছেন। এই বারান্দায় নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছিলেন।

বকুলতলা ও ঝাউতলাঃ- নহবতখানার পরেই বকুলতলা ঘাট। এই ঘাটে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী স্নান করতেন। বকুলগাছটি নিশ্চিহ্ন, ঘাটটি বর্তমান। এই ঘাটেই প্রথম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী-গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী গোগেশ্বরী দেবীর আগমন হয়, যিনি ঠাকুরকে তন্ত্রমতে দীক্ষা দান করেছিলেন এবং পরে জনসমক্ষে ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে ঠাকুরকে অবতার রূপে প্রমাণ করেছিলেন। ঠাকুরের মাতা চন্দ্রমনি দেবীকে তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে এখানেই অন্তর্জলি করা হয়েছিল। বকুলতলার ঝাউতলা। পূর্বে এখানে মাত্র ৪টি ঝাউগাছ ছিল।

পঞ্চবটীঃ বকুলতলার কিছু উত্তরে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে পঞ্চবটী। এখানে অনেক বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে পঞ্চবটী। এখানে অনেক আগে একটি বটগাছ থাকায়, এটিকে আগে বটতলা বলা হতো। এরই পাশে দক্ষিণে পরবর্তী কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তত্বাবধানে বট, অশ্বথ, নিম (মতান্তরে অশোক) আমলকি ও বেলগাছ রোপণ করে, পঞ্চবটী করা হয়। অশ্বত্থ গাছটি

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন এবং বাকি ৪টি গাছ তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রাম লাগিয়েছিলেন। একদা বৃন্দাবন থেকে ফিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রাধা কুন্ড ও শ্যামকুন্ডের মৃত্তিকা বা রজঃ এখানে ছড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আজ থেকে এই স্থান শ্রীবৃন্দাবনতুল্য মহাতীর্থ হলো। একদা এই পঞ্চবটীর বেড়া ভেঙে যাওয়ায় ঠাকুর খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সে কথা দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ির বাগানের মালি ভর্তাভারীকে জানান। ঠিক সেই সময় গঙ্গায় তাঁদের সামনেই বান আসে এবং সেই বানের জলে অকস্মাৎ একবোঝা বাঁশের খুঁটি, বাকাবি প্রভৃতি বেড়া তৈরির সমস্ত উপকরণ ভেসে এসে পুনরায় জলের মধ্যে ডুবে যায়। ঠাকুর এই দৃশ্য দেখে তৎক্ষণাৎ ভর্তাভারীকে সেকথা জানালে, ঠাকুরের মনের ইচ্ছাপূরণের জন্য সে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। সে সেই মুহূর্তে নিজের জীবন বিপন্ন করেও লাফ দিয়ে গঙ্গায় বানের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ডুব দিয়ে সেই উপকরণ গুলি জল থেকে তুলে আনে। এরপর ভর্তাভারী মালী সেই উপকরণগুলির দ্বারা পঞ্চবটীর বেড়া পুনরায় তৈরি করে ঠাকুরকে চিন্তিত করে। এই পঞ্চবটীতেই ঠাকুর তাঁর দ্বাদশ বছর সাধনকালের অধিকাংশ সময়ই বিবিধ সাধনা করেছিলেন এবং এই পঞ্চবটীতেই একটি সাধন কুটিরে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী গুরু, শ্রীমৎ তোতাপুরীর সাহায্যে ঠাকুর বেদান্তমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। পঞ্চবটীতেই সাধনার জন্য ঠাকুর যে কুটিরটি নির্মাণ করেছিলেন, পরে সেখানে পাকা কুটির তৈরি হয় এবং এখানেও নিত্যপূজা হয়। বর্তমানে এই সাধন কুটিকে শান্তি কুটির বলা হয়। এখানকার বেদির উত্তর পশ্চিমাংশে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর তৈরি নরমুন্ড, সর্পমুন্ড, সারমেয়মুন্ড, বৃষমুন্ড ও শৃগালমুন্ড সমন্বিত পঞ্চমুন্ডির আসনে একদা ঠাকুর নানা সাধনায় সিদ্ধ হন এবং সিদ্ধিলাভের পর সেই মুন্ডাসন গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়। বেলতলাতেও অনুরূপ আসনে ঠাকুর একই সময়ে তন্ত্রের সাধনা করেছিলেন। পঞ্চবটী সম্পর্কে কথামৃত গ্রন্থের বর্ণনায় আছে- 'বকুলতলার আরও কিছু উত্তরে পঞ্চবটী। এই পঞ্চবটীর পাদমূলে বসিয়া পরমহংসদেবের অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর ইদানীং ভক্তসঙ্গে এখানে সর্বদা পাদচারণ করিতেন। গভীর রাত্রে সেখানে কখনো কখনো উঠিয়া যাইতেন। পঞ্চবটীর বৃক্ষগুলি বট, অশ্বত্থ, নিম,আমলকী ও বিল্বঠাকুর নিজের তত্বাবধানে রোপন করিয়াছিলেন। এই পঞ্চবটীর ঠিক পূর্বগায়ে একখানি কুটির নির্মাণ করাইয়া, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে আসিয়া অনেক ঈশ্বরচিন্তা, অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। এই কুটির এক্ষণে পাকা হইয়াছে। পঞ্চবটীর মধ্যে সাবেক একটি বটগাছ আছে। তৎসঙ্গে একটি অশ্বত্থ গাছ। দুটি মিলিয়া যেন এক হইয়াছে। বৃদ্ধ গাছটি বয়সধিক্যবশত বহু কোটার বিশিষ্ট ও নানা পক্ষীসমকুল ও অন্যান্য জীবেরও আবাস স্থান হইয়াছে। পাদমূলে

ইষ্টকনির্মিত, সোপানযুক্ত, মন্ডলাকারে বেদি সুশোভিত। এই বেদীর উত্তর পশ্চিমাংশে আসীন হইয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধনা করিয়াছিলেন, আর বৎসরের জন্য যেমন গাভী ব্যাকুল সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে কত ডাকিতেন। আজ সেই পবিত্র আসনোপরি বটবৃক্ষের সখীবৃক্ষ অশ্বত্থের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। অর্ধসংলগ্ন হইয়া আছে। বুঝি সে আসনে বসিবার এখনো কোন মহাপুরুষ জন্মেন নাই।

পঞ্চমুন্ডি বা বেলতলা ঃ পঞ্চবটীর আরো উত্তরে ঝাউতলা এবং ঝাউতলার পূর্ব কোণে বেলতলা। এই বেলতলা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সাধনস্থল। ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী এখানে নরমুন্ড, সর্পমুন্ড, সারমেয়মুন্ড, বৃষভমুন্ড ও শৃগালমুন্ড এই পঞ্চমুন্ডের কঙ্কালাসন স্থাপন করে ঠাকুরের দ্বারা ৬৪ তন্ত্রের সকল প্রকার সাধনা করিয়াছিলেন। পরে সাধনা শেষে ভৈরবী কর্তৃক মুন্ডগুলি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হয় এবং সাধনবেদিও ভেঙ্গে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই বেলতলাটিকে বাঁধিয়ে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে এবং এই স্থানটিকে পঞ্চমুন্ডি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এখানেও নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে এই সম্পর্কে কথামৃত গ্রন্থের বর্ণনায় আছে- পঞ্চবটীর আরো উত্তরে খানিকটা গিয়া লোহার তারের রেল আছে। সেই রেলের ওপর ঝাউতলা। সারি সারি চারিটি ঝাউগাছ। ঝাউতলা দিয়া পূর্ব দিকে খানিকটা গিয়া বেলতলা। এখানেও পরমহংসদেব অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন। ঝাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাচীর। তাহারই উত্তরে গভর্নমেন্টের বারুদঘর।

পুষ্করিনী, পুষ্পোদ্যান, ফটক, আস্তাবল, গোশালা প্রভৃতিঃ

কথামৃত গ্রন্থে এই সকল বিষয়ে তৎকালীন অবস্থার যে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তারই উদ্ধৃতি উঠানের দেউড়ি ও কুঠির মধ্যবর্তী যে পথ, সেই পথ ধরিয়া পূর্ব দিকে যাইতে যাইতে ডানদিকে একটি বাধাঘাট বিশিষ্ট সুন্দর পুষ্করিনী। মা কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্ব দিকে এই পুকুরের একটি বাসনমাজার ঘাট ও উল্লিখিত পথের অনতিদূরে আরেকটি ঘাট। পথপার্শ্বস্থিত ঐ ঘাটের নিকট একটি গাছ আছে, তাহাকে গাজিতলা বলে ঐ পথ ধরিয়া আরেকটি পূর্বমুখে যাইলে আবার একটি দেউড়ি বাগান হইতে বাহিরে আসিবার সদর ফটক। এই ফটক দিয়া কালি বাড়িতে ফিরিয়া আসিতেন। তখন এই দেউড়ির দারওয়ান চাবি খুলিয়া দিত। পরমহংসদেব দারোয়ানকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন ও লুচি মিষ্টন্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ তাহাকে দিতেন। 'পঞ্চবটীর পূর্বদিকে আরেকটি পুষ্করিনী নাম হাঁসপুকুর। ঐ পুষ্করিনীর উত্তর পূর্ব কোণে আস্তাবল ও গোশালার পূর্ব দিকে দ্বিতীয় ফটক। এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বরের গ্রামে যাওয়া যায়। যেসকল পূজারী বা অন্য কর্মচারী পরিবার আনিয়া

দক্ষিণেশ্বরে রাখিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা এই পথ দিয়া যাতায়াত করেন। উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উভয়ে বকুলতলা ও পঞ্চবটী পর্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়া পথ গিয়াছে। সেই পথের দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। আবার কুঠির দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী পূর্ব-পশ্চিমে যে পথ গিয়াছে, তাঁহারও দুই পার্শ্বে পুষ্পবৃক্ষ। গাজিতলা হইতে গোশালা পর্যন্ত কুঠি ও হাঁসপুকুরের পূর্ব দিকে যে ভূমিখন্ড, তাহার মধ্যেও নানাজাতীয় পুষ্প বৃক্ষ, ফলের বৃক্ষ ও একটি পুষ্করিনী আছে। অতি প্রত্যুষে পূর্বদিক রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে যখন মঙ্গলারতির সুমধুর শব্দ হইতে থাকে ও সানাইয়ের প্রভাতী রাগরাগিনী বাজিতে থাকে তখন হইতেই মা কালীর বাগানে পুষ্পচরণ আরম্ভ হয়। গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীর সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও সৌরভপূর্ণ গুলচি ফুলের গাছ। মল্লিকা, মাধবী ও গলচি ফুল শ্রীরামকৃষ্ণ বড় ভালবাসিতেন। মাধবীলতা শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আনিয়া তিনি পুঁতিয়া দিয়াছেন। হাঁসপুকুর ও কুঠির পূর্বদিকে যে ভূমিখন্ড তন্মধ্যে পুকুরের ধারে চম্পক বৃক্ষ। কিয়দ্দুরে ঝুমকা জবা, গোলাপ ও কাঞ্চনপুষ্প। বেড়ার উপরে অপরাজিতা নিকটে জুঁই, কোথাও বা শেফালিকা। দ্বাদশ মন্দিরের পশ্চিমগায়ে বরাবর শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোলাপ, জুঁই, বেল। ক্কচিৎ বা ধুস্তর পুষ্প। মহাদেবের পূজা হইবে। মাঝে মাঝে তুলসি, উচ্চ ইষ্টক নির্মিত মঞ্চের উপর রোপণ করা হইয়াছে। নহবতের দক্ষিণদিকে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ। বাঁধাঘাটের অনতিদূরে, পদ্মকরবী ও কোকিলাক্ষ। পরমহংসদেবের ঘরের পাশে দুই একটি কৃষ্ণচূড়ার বৃক্ষ ও আশেপাশে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, আবার পঞ্চমুখী জবা, চীনজাতীয় জবা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও এককালে পুষ্পচরণ করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ একটি বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিশ্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের খানিকটা ছাল উঠিয়া আসিল। তখন তাঁহার এইরূপ অনুভূতি হইল যে, যিনি সর্বভূতে আছেন, তাঁর না জানি কত কষ্ট হইল। অমনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আরেক দিন পুষ্পচরণ করিবার জন্য বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কে যেন দপ করিয়া দেখাইয়া দিল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া, এই বিরাট শিবমূর্তির উপর শোভা পাইতেছে যেন তাঁহারই অহনিশি পূজা হইতেছে। সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা হইল না। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কথামৃত গ্রন্থে বর্ণিত দৃশ্যের বর্তমানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। হাঁসপুকুরের উত্তর-পূর্বকোণে আগে যেসব গোশালা, অশ্বশালা প্রভৃতি ছিল, বর্তমানে তা কোন চিহ্নই নেই। উদ্যান প্রাঙ্গণের রাস্তার দুধার এবং গঙ্গার ঘাটের কাছে বহু দোকান ঘর ভাড়া দেওয়া আছে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাদি বর্ণনার শেষ পর্যায়ে কথামৃত গ্রন্থে মাস্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছেন- কালিবাড়ি

আনন্দ নিকেত হইয়াছে। রাধাকান্ত, ভবতারিনী ও মহাদেবের নিত্যপূজা, ভোগবাগাদি ও অতিথিসেবা। একদিকে ভাগরথীর বহুদূর পর্যন্ত পবিত্রদর্শন।
আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতন মানুষ অহর্নিশি ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন। প্রকৃতপক্ষে, বাংলার জীবনের প্রাণ কেন্দ্রস্বরূপ এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির আজ সর্বধর্ম সমন্বয়কারী আধ্যাত্মিক আদর্শের জীবন্ত মূর্তিরূপে বিদ্যমান।

বিশেষ তথ্যাদি ঃ-

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম এবং রানি রাসমনির স্বামী রায় রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু একই ইংরেজি বছরে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি এবং রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু-১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন। প্রায় ১৯ জুন বছর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন, যখন বিধবা রানির বয়স প্রায় ৬২ বছর। ১৮৫৫ থেকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ অবধি (রানির মৃত্যু পর্যন্ত) প্রায় ৬ বছর রানি রাসমনি শ্রীরামকৃষ্ণের পুত্র সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থল পরিদর্শনে যান, তখন সেখানে রানি রাসমনির কাছাড়ি বাড়িতে উঠেছিলেন। সেই বাড়িটি নবদ্বীপে আজও বিদ্যমান এবং রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে পরিণত। যদুনাথ চৌধুরীর বংশধরগণ এটির মালিক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তান ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) তথা তারকনাথ ঘোষালের জন্ম উত্তর চব্বিশপরগণা। জেলার বারাসত শহরে রানি রাসমনির কাছাড়ি বাড়িতে। তাঁর পিতা রামকানাই ঘোষাল রানি রাসমনির এস্টেটের মোক্তার হিসেবে বারাসতে রানির ঐ কাছাড়ি বাড়িতে বাস করতেন, যেখানে স্বামী শিবানন্দের জন্ম। বর্তমানে সেই বাড়িতে বেলুড় মঠের অধীনে শ্রীরামকৃষ্ণমঠ স্থাপিত হয়েছে। সীতানাথ দাসের বংশধরগণ এটির মালিক ছিলেন। রানি রাসমনির প্রচলিত ছবিটি কোন ফটো নয়- হাতে আঁকা। তিনি যখন অন্দরমহলে ঠাকুরঘরে প্রতিদিন পূজায় যেতেন, তখন সিঁথির জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিত (নাম অজ্ঞাত) যিনি ঠাকুরসেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং যাঁর অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার ছিল, তিনিই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পূজায় নিযুক্তা রাসমনি দেবীর আকৃতি নিজ হাতে এঁকেছিলেন। কারণ তিনি নিজে একজন দক্ষ চিত্রকর ছিলেন। তাঁর হাতে আঁকা সেই সুন্দর ও নিখুঁত ছবিটিই পরবর্তীকালে ব্লক তৈরি করে প্রচারিত হয়। অবশ্য সেই ছবিরঅনুকরণে পরে আরও ছবি তৈরি হয়েছে। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরসংলগ্ন (শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর ও নহবতখানার মধ্যস্থলে) রানি রাসমনির মূর্তি ছাড়াও কলকাতার কার্জন পার্কেও তাঁর মূর্তি আছে

এবং জন্মস্থান হালিশহর প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেও তাঁর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পনা আছে। রানি রাসমনির নামে কলকাতায় ও দক্ষিণেশ্বর যেমন রাস্তা আছে, অন্যান্য কয়েকটি স্থানে তেমন রাজার ও স্নানঘাট আছে, এমনকি তাঁর নামে কলকাতায় স্পোর্টিং ক্লাব ও বিদ্যালয়ও আছে। কাশীতেও তাঁর নামে রানি রাসমনি ছত্র নামক দেবালয় আছে। কিন্তু রাজচন্দ্র দাসের নামে কোন রাস্তা বা বাজার নেই। কেবলমাত্র কলকাতার বাবুঘাটে তঁর লেখা আছে। রানি রাসমনির তিন জামাতার মধ্যে দুই জামাতার নামে কলকাতায় রামচন্দ্র দাস রো নামে একটি রাস্তা আছে যেখানে একদা রামচন্দ্রের একটি আস্তাবল ছিল। কনিষ্ঠ জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের নামেও কলকাতার বেলেঘাটায় রানি রাসমনি গার্ডেন্স লেনের পাশেই একটি রাস্তার নাম - মথুরবাবু লেন। রানি রাসমনির দৌহিত্রগণের মধ্যে কেবলমাত্র কনিষ্ট জামাতা মথুরমোহন বিশ্বাসের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের নামে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছে একটি রাস্তা আছে এবং দ্বিতীয় জামাতা প্যারীমোহন চৌধুরীর পুত্র যদুনাথ চৌধুরীর নামে কলকাতার ভবানীপুরে একটি বাজার আছে নাম যদুবাবুর বাজার। রানি রাসমনির বংশধরগণের মধ্যে যেমন অনেকেই অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইনজীবী প্রভৃতি আছেন, তেমন অনেকে আবার সরকারি ও বেসরকারি অফিসে বড় বড় পদে নিযুক্ত আছেন। তাছাড়া, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি আছেন এবং কলকাতায় বহু বাড়ির মালিকানা ও তাঁদের আছে। রানি রাসমনির আমলে তাঁর কলকাতার জানবাজারের বাড়িতে আগে একটিমাত্র দুর্গাপূজা হতো। বর্তমানে সেই বাড়িতে পৃথকভাবে তিনটি দুর্গাপূজা হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমনির বংশধরগণ (দাসবংশীয়) ২০,২০এ ও ২০ বি, এস.এন ব্যানার্জী রোড, কলকাতা- ১ ৩ ঠিকানার অংশে দুর্গাপূজা করেন। দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী কুমারীর বংশধরগণ (চৌধুরীবংশীয়) ১৮/৩এ,এস, ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-১৩ ঠিকানার অংশে দুর্গাপূজা করেন এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বার পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের কন্যার তরফে তাঁর উত্তরাধিকারীগণ (হাজরাবংশীয়) ১৩, রানি রাসমনি রোড, কলকাতা-১৩ ঠিকানার অংশে দুর্গাপূজা করেন। রানি রাসমনির বাড়ি ছাড়াও তাঁর বংশধরগণ অপর দুই স্থানে, নিজ নিজ বাড়িতে দুর্গাপূজা করেন। তার মধ্যে একটি হলো- রাসমনি ভবন-১৬, রানি রাসমনি রোড, কলকাতা-১৩ (বিশ্বাসবংশীয়) এবং অপরটি হলো -১১৯ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯ (দাসবংশীয়)। রানি রাসমনির জানবাজারের বাড়ির কুলদেবতা রঘুনাথ জিউয়ের পূজা পূর্বে পালাক্রমে তাঁর বংশধরগণ সম্পাদন করতেন। কিন্তু ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস (১৩৯৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাস) থেকে সেই কুলদেবতাকে দক্ষিণেশ্বরে রাধাকান্ত মন্দিরে রেখে পূজার ব্যবস্থা হয়েছে। রানি রাসমনির কলকাতার জানবাজারের বাড়ি ছাড়াও তাঁর বংশধরগণ কলকাতার বিভিন্ন স্থানে

এবং হাওড়া, বজবজ, ব্যারাকপুর, আগরপাড়া, সিঁথি প্রভৃতি অঞ্চলে নিজ নিজ বাড়িতে বাস করেন। এমনকি বঙ্গদেশের বাইরেও বর্তমানে অনেকে বাস করেছেন। রানি রাসমনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরটি দেবোত্তর করে গেলেও নিজের বিশাল সম্পত্তি ভাগ করে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ৮জন দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু তৎকালীন রানির ২ জন কন্যা- শ্রীমতী পদ্মমনি ও শ্রীমতী জগদম্বা জীবিত থাকায়, সম্পত্তিতে তাঁদের জীবনস্বত্ব বর্তায়। পরবর্তীকালে তাঁদের মৃত্যুর পর দেখা যায় যে, মাত্র ৫ জন দৌহিত্র জীবিত আছেন। আইনানুসারে তাঁরা প্রত্যেকে সম্পত্তির পাঁচ ভাগের এক অংশের অধিকারী হন এবং বাকি ৩ জন দৌহিত্রের মৃত্যু হওয়ায় তাঁরা আইনানুসারে মাতামহীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। এই ৩ জন দৌহিত্র হলেন- ভূপালচন্দ্র বিশ্বাস, দ্বারিকানাথ বিশ্বাস ও ঠাকুরদাস বিশ্বাস। তবে শ্রীমতী পদ্মমনি ও শ্রীমতী জগদম্বা উভয়েই তাঁদের যৌথ সম্পত্তি থেকে নানা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি প্রদানের মাধ্যমে এই ৩ জনের উত্তরাধিকারীগণকে বঞ্চিত করেননি।

রাসমনি দেবীর শাশ্বতরূপ ঃ -

রাসমনি দেবীর জীবনতত্বটি বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে মানবী সত্তা ও দেবী সত্তার অতুল সম্পদরাজি। মানবী সভায় তিনি যেমন লোকমাতা রাসমনি, দেবী সভায় তিনি তেমন জগন্মাতা রাসমনি। এ বিষয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু নিবেদন করতে চাই, যেহেতু সেই মহিয়সী নারীর জীবনতত্বকে বিশদভাবে প্রকাশ করার যথাযথ শক্তি আমার নেই। প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত, মানুষের জীবনে যেমন উত্থান ও পতন থাকে, রাসমনি দেবীর জীবনে কোন পতন পরিলক্ষিত না হলেও কিছু ত্রুটির কথা জানা যায়। মানুষমাত্রই কিছু না কিছু দোষগুণের অধিকারী। রাসমনি দেবীও মানুষ তাই বৈষয়িক ব্যাপারে কখনো কখনো তিনি বিভ্রান্ত বা উদভ্রান্ত হয়ে মানবী সত্তায় কিছু কিছু কাজ করেছেন। যেগুলিকে তাঁর দোষ না বলে ত্রুটি রূপেই উল্লেখ করা চলে। তবে সে ত্রুটি সংশোধনের সৎসাহস তাঁব ছিল বলেই, শত শত গুণের মধ্যে সেগুলি নগণ্যরূপেই তাঁর জীবনী থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সেজন্য বিশেষভাবে সেগুলির আলোচনা নিরর্থক। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মসাধনাই তাঁর বিধি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছিল বলেই বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাঝে মাঝে অপ্রিয় কানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেটি তাঁর আসল পরিচিতি নয়। এই সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার প্রখ্যাত জমিদার, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রথম যোগাযোগ হয়েছিল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পাশেই যদুলাল মল্লিকের বাগানে। ঠাকুর সেখানে তাঁকে ঈশ্বরচিন্তাই মানুষের কর্তব্য কিনা- প্রশ্ন করায়, যতীন্দ্রমোহন

বলেন, 'আমরা সংসারী লোক, আমাদের কি আর মুক্তি আছে? রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন'। এই উত্তর শুনে ঠাকুর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে বলেন, তুমি কি লোক গা! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরক দর্শনই মনে করে রেখেছ? যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি এসব কিছু মনে হয় না? রাসমনি দেবীর জীবনেও ক্রটি সম্পর্কে ঠাকুরের এই অমূল্য অভিমতটি স্মরণ করেই তাঁর উজ্জ্বল জীবনতত্ত্ব আলোচনায় অগ্রসর হয় তাঁর সততা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য, তেজস্বিতা, ঈশ্বরে ভক্তি প্রভৃতি সদগুণাবলীর মূল্যায়নের মাধ্যমে। সাধনার আন্তরিকতার ফলেই সিদ্ধির সফলতা ঘটে। আগ্রহ, জ্ঞান, প্রেম এই তিনটি সমন্বয়সিদ্ধ সাধনার দ্বারাই সমস্ত ক্রটিকে আত্মসাৎ করে যে রাসমনি দেবী আমাদের সামনে উপস্থিত, সেইটাই তাঁর আসল পরিচয় আসল সত্তা এবং একযোগে মানবী ও দেবী সত্তা। মহৎ অভীপ্সা, মহান আদর্শ ও গৌরবমন্ডিত নেতৃত্বে রাসমনি দেবী মানবীসত্তার চিরন্তন অধিকারকে সমর্থন করে গেছেন। ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ প্রিয়তায় নতজানু ক্রীতদাসী না হয়ে, খাঁটি বাঙালির স্বকীয় জীবনোপলব্ধির স্বউপার্জিত ঐশ্বর্যকে সম্বল করে ভারতীয় আর্যসভ্যতার প্রাচীন মৌল সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি অকুতোভয়ে। মানবী সত্তায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সাধনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ সংগ্রামজাত আঘাতে হিন্দু চৈতন্যকে জাগ্রত করেছিলেন তিনি। কারণ, তিনি নিজে ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরমপন্থী। ব্যক্তিত্বের জীবন্ত অধিকারের জন্যই তাঁর মানবী সত্তা ছিল নিরবচ্ছিন্ন সফলতায় পূর্ণ। এমন সর্বাঙ্গীন সিদ্ধিলাভ সকলের ভাগ্যে সবসময় ঘটে না। কিন্তু তাঁর জীবনে সবসময়ই ঘটত।

অবশ্য যুগেরও একটি নিজস্ব সত্তা থাকে এবং সেই যুগের সেই বৈশিষ্ট্যই সাধারণত মানুষের জীবন কর্মকে প্রভাবান্বিত করে আধার অনুযায়ী। রাসমনি দেবীর যুগ ছিল মধ্যবিত্ত ধনীর যুগ। তিনি যে যুগে জন্মেছিলেন, সেই যুগের অন্যান্য মানসীদের কর্মমাহাত্ম্যও তাঁর মনে দাগ কাটতে সাহায্য করেছিল। কারণ প্রধানত গৃহবাসিনী হলেও দৌহিত্রগণের দ্বারা নিত্য সংবাদপত্র পাঠ শুনে, তাঁর মধ্যে তৎকালীন যুগসাধনার মৌলিক চিত্রটি স্থান পেয়েছিল। তাই প্রাচীনা হয়েও তিনি ছিলেন আধুনিকা একাধারে লৌকিক ও লোকোত্তর গুণের অধিকারিনী। তাই তৎকালীন মূল ভাবধারার স্বরূপটি বুঝতে পেরে, তিনি নিজেকে সেই মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করার ফলে সেকালের ভারত চৈতন্যরূপ বিশেষভাবের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিলেন। প্রচুর অর্থসম্পদের অধিকারিনী ছিলেন তিনি। কিন্তু উদ্বৃত অর্থের সদ্ব্যবহারও করে গেছেন তিনি দান-ধ্যানে, বিভিন্ন সদনুষ্ঠানের মাধ্যমে -'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।' তাই ধনী হয়েও তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে কাঙালিনী সংসারী হয়েও তিনি ছিলেন তপস্বিনী, রানী হয়েও তিনি ছিলেন রাজ্যহীনা,

বিষয়ানুরাগিনী না হয়েও আবার তিনি ছিলেন বিষয় বিচক্ষণা। সেজন্য বিষয়ী এবং বিবিক্ত বা অসম্পৃক্তভাব এই দুটি আপাত বিরোধের সমন্বয় ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংসারবর্জিত নির্গুণ শূন্যতার জীবনও তাঁর ছিল না, তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত সংসারী। একটি হাত ঈশ্বরের পদে রেখে অপর হাত দিয়ে সংসার ধর্ম পালন করেছেন অনাসক্তভাবে। পরবর্তী কালে পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত হওয়ার পর অবশ্য তিনি স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তির মতোই জীবনযাপন করে গেছেন। দীন দরিদ্র এক দুঃখী পরিবারে রাসমনি দেবীর জন্ম। তাই দুঃখীর দুঃখ ব্যথা বোঝার শক্তি ও সেই ব্যথা বহন করারও শক্তি ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক রসমন্ডিত অন্তরের মধ্যে। সুখ-দুঃখের আলোছায়ায় সূক্ষলীলা তাঁর জীবনে বৈচিত্র্য এনেছিল। আবার, গ্রাম্য পরিবেশ ও শহুরে পরিবেশ দুটিরই অভিজ্ঞতায় তাঁর মানবী সত্তায় কোন ভেজাল ছিল না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে তিনি কেবল সত্যের সঙ্গেই মিত্রতা করেছেন, ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছেন মিথ্যার অপবিত্র বেড়াজালকে। তাই প্রকৃত সত্যময়, আনন্দময় ও সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে উঠেছিল তাঁর ভোগবিলাস বিমুখী জীবন। অর্থের দ্বারা সবকিছু করা সম্ভব নয়। অর্থের সঙ্গে শ্রেণীগত সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত মনীষা ও উদারতারও প্রয়োজন হয়। দেশের ও দশের হিতের জন্য নানা কাজের সঙ্গে তিনি জড়িয়েছিলেন এবং এজন্য বহু অর্থব্যয়ও তিনি করেছিলেন। কর্মের বাহুল্যদ্বারা কেউ বড় হতে পারে না। তাঁর চাইতেও অপরের জীবন হয়তো ছিল আরো কর্মবহুল। কিন্তু কর্মের অন্তর্নিহিত হৃদয়বত্তায় মানবী সত্তার প্রাবল্যে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। নিজের ও পরের কল্যাণের জন্য কাজ করাকেই ধর্ম বলা হয়। তিনি ছিলেন এই ধর্মেরই অধিকারিনী। অবক্ষয়িত সভ্যতার গর্ভ থেকে মুক্তির যুগান্তকারী বাণী বহন করে, তিনি দরিদ্র, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত মানুষের পাশে এসে তাদের আত্মিকশক্তিকে জাগ্রত করেছেন, কারণ, তাঁর চরিত্র ধর্ম ও সমাজনীতি সমানভাবে মিশে গিয়েছিল। তাঁর বিশ্বপ্রসারী হৃদয়ের ব্যাকুলতায় জগতের মনুষ্যত্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আবির্ভূত হয়েছিলেন কাঙালের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি পরবর্তী কালে সকলকে আহ্বান জানালেন চৈতন্যশক্তি উদ্বোধনে- 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' জগতের সমস্ত বেদনাকে অন্তরে বহন করে,নিজের হৃদয় নিয়ে নিজের সেই মানসিক কলেবরকে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে স্থাপনা করে, নিশ্চিন্তরূপে এই জগৎ থেকে বিদায় নিতে পেরেছিলেন, অমৃতের পুত্রী রাসমনি দেবী। এই খানেই তাঁর দেবী সত্তার বিকাশ। আদিকাল থেকেই মানবসংস্কৃতির রচনার কেন্দ্রে ছিলেন নারী কল্যাণময়ী জীবধাত্রীরূপে। রাসমনি দেবীর জীবনেও সেই নারীত্বের মঙ্গলদায়িনী শক্তির কাজের ফলে তিনি হয়েছিলেন পৌরুষশক্তি সমন্বিতা নারী। তাই নামজাদা তৎকালীন

পুরুষগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ধীবরসমাজকে সরকারের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করেছিল রাসমনি দেবীর নারীত্বের অপার্থিব স্নেহ। আবার নীলকর সাহেবদের দুর্দান্ত প্রতাপ ও অমানুষিক অত্যাচারের কলঙ্কিত অধ্যায়কে ম্লান করে উৎপীড়িতদের রক্ষা কর্ত্রীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন মাতৃভাবে মাতোয়ারা এই নারী। নিজের প্রজাদের রক্ষাকল্পে অপর জমিদারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এই নারী জমিদার তাঁর স্বভাবসুলভ তেজস্বিতায়। বাদ্যযোগে শোভাযাত্রায় ধর্মীয় সংস্কারে বিদেশীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিপদশঙ্কুল পথে অগ্রসর হয়েছিলেন এই বীরাঙ্গনা নারী। আবার মাতৃত্বের বেদনায়, স্নেহের টানে, বন্যায় দুর্গতদের সকলপ্রকার আশ্রয় ও আহার্যের প্রাণ প্রদ নারীপূর্ণ সেবাই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন কলকাতার অভিজাত ধনী পরিবারের গৃহবধূ, লোকমাতা এই নারী।

অপরদিকে সততার নিদর্শনরূপে নরঘাতক দস্যুদের সঙ্গে চুক্তিরক্ষা করে, সাধনলব্ধ দিব্যশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন স্বচ্ছন্দবিহারিনী এই নারী। এমনকি, স্বামীর বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো অভিজাত বংশের সংস্কৃতিগর্বি পুরুষপ্রধানকে নির্ভীক প্রত্যাখ্যান ও কৌশলগত আচরণে স্বীয় কার্যোদ্ধার সমাধা করেছিলেন অশিক্ষিত, অসংস্কৃত গ্রামবাংলার এই অনামী এক ক্ষুদ্র নারী। অপরদিকে নিজ গৃহদেবতাকে উন্মত্ত গোড়া সৈন্যদের অপবিত্র স্পর্শ থেকে রক্ষারজন্য বৈষ্ণবী হয়েও উন্মুক্ত অসিহস্তে দিব্য প্রেমের উন্মাদনায় রণরঙ্গিনীরূপে মহাশক্তি ধারণ করেছিলেন এবং জগন্মাতা নারী। আবার, কুলীনদের বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন এই নারীদরদিনী নারী।

এইভাবেই নারী জাগরণে ও নারীর অবরোধ মোচনে উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ নারীদের আসনে তাঁর স্থান স্বীয় মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সর্বোপরি তিনি ছিলেন অমর দাম্পত্যপ্রেমে স্বামীসোহাগিনী নারী। তাই প্রয়াত স্বামীর অপূর্ণ বাসনকে রূপায়িত করতে কোন কার্পন্য করেননি তিনি। কোন আন্তরিকতার অভাব ছিল না তাঁর মধ্যে। তাই একযোগে দেবী সত্ত ও মানবী সত্তা তাঁর মধ্যে এমন অভিন্নরূপে বিরাজিত ছিল যে, কখনো দৈত্যদননী রণচন্ডী, আবার কখনো বরাভয়দায়িনী মঙ্গল চন্ডীরূপে আমরা তাঁকে পেয়েছি শ্রেষ্ঠ নারীরূপে। নিজের ঐশ্বর্য্যের গোপন রেখে, বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের গার্গি, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির মতোই তিনি ছিলেন অদ্ভূত নারীচরিত্রের বৃহৎ আধার- যা নারীজাতির পক্ষে আদর্শস্বরূপ। রাসমনির দেবীর জীবনে দুটি প্রবল শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়- একটি। শ্রদ্ধাসহিষ্ণুতা শক্তি, আরেকটি স্নেহসহিষ্ণুতা শক্তি। ব্রাহ্মণদের কাছে রাসমনি দেবী ছিলেন শূদ্রানী, জাতপাতের বিচারে তিনি ছিলেন সমাজে উপেক্ষিতা। তবুও সেই কথা কথিত ব্রাহ্মণত্বের অভিমানি পণ্ডিতদের প্রতিশোধ

যজ্ঞে তিনি মেতে উঠেননি। কল্লোলহীন শান্ত স্রোতস্বিনীর মতো, সেই ব্রাহ্মণকুলকে নির্বিচারে অহেতুকি ভক্তিবারি স্রোতে প্লাবিত করে, তিনি তাঁদের মনের মলিনতা অপনোদনে সহায়তা করেছিলেন, আর তৎকালীন সমগ্র ব্রাহ্মণকুলকে তাঁদের সনাতন মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের হিতার্থেই শূদ্রানী নারীর এই অসীম ভক্তিপ্রবণতা, সেদিন ব্রাহ্মনদেরও অন্তচক্ষু উন্মীলিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণদের কাছে রাসমনি দেবী সেদিন আত্মসমর্পন করেননি বরং ব্রাহ্মণগণই রাসমনি দেবীর সর্বদ্বন্দ্বাতীত ধর্মবোধের প্রাধান্য স্বীকার করে নিজেদের গৌরবান্বিত করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের প্রতি একটিই ছিল রাসমনি দেবীর শ্রদ্ধাসহিষ্ণুতাশক্তির বিকাশ। তাই দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠায় প্রথম দিকে ব্রাহ্মণরা (একমাত্র রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া) তাঁকে ত্যাগ করলেও তিনি তাঁদের বর্জন করেননি।

আবার, পূজক শ্রীরামকৃষ্ণ রাসমনি দেবীর অমার্জনীয় আধ্যাত্মিক অপরাধেব জন্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মধ্যেই তাঁকে স্বয়ং শারীরিক দন্ড দিলেও, স্নেহসহিষ্ণুতাশক্তির মাধ্যমে তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন। কারণ সেদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বেতনভোগী পূজকরূপে দেখেননি, নিজের মাতৃত্ববলে তাঁকে একজন ভাবুক সন্তানরূপে গণ্য করেছিলেন। সাধুর প্রতি ভক্তিই সাধুতার লক্ষণ। এই শ্রদ্ধাসহিষ্ণুতা ও স্নেহসহিষ্ণুতা দুইটি ভক্তি যোগের লক্ষণ ও শক্তি। জ্ঞানী ভক্ত রাসমনি দেবী ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ সাধনে যুক্ত থাকায় তাঁব মধ্যে এই সহিষ্ণুতাব সৃষ্টি। রাসমনি দেবীর বৈচিত্র্যময় জীবন কাহিনীর মধ্যে এটি একটি বিশেষ অধ্যায় এবং তাঁর প্রকৃত বৈষ্ণবজনোচিত ভক্তিমার্গে এটি একটি অপ্রতিহত ব্রহ্ম শক্তি। আনন্দপ্রিয়তা এবং সঙ্গীতপ্রিয়তা রাসমনি দেবীর উন্নত জীবনধারনের পক্ষে ছিল বিরাট সম্পদ। জপ, তপ, পূজা, নিষ্ঠার মধ্যেই তাঁর ছিল আনন্দ। এ আনন্দ অনির্বচনীয়- এ আনন্দ প্রকৃত পক্ষে আনন্দযোগ। তাই প্রতি কাজেই ছিল তাঁর আনন্দ -তিনিও নিজে ছিলেন আনন্দময়ী। শ্রুতি বলেন, সেই আনন্দস্বরূপই জীবজগতের অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তাই জগতে সকলই আনন্দময়। জীব আনন্দ স্বরূপ থেকেই এসেছে এবং আনন্দরূপেই জগৎলীলা ও আনন্দলীলা । এই আনন্দলীলার বোধশক্তি রাসমনি দেবীর মধ্যে বিদ্যমান থাকায় আনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, দুঃখমিশ্রিত, দ্বন্দ্বঘটিত সৃষ্টির মাঝেও তিনি ভাগবত প্রেমের নির্মল আনন্দের রাসলাভের অধিকারিনী হয়েছিলেন। তাই যেখানেই তাঁর অবস্থিতি ঘটত- সেই স্থানটি সেই পরিবেশটিও দিব্যানন্দের অমৃতধামে পরিণত হতো। জানবাজারের শ্বশুরালয়টিও তাঁর আনন্দের প্রবাহ থেকে বঞ্চিত হয়নি বরং দিনে দিনে বৃহৎ আনন্দনিকেতন পরিণত হয়েছিল। সঙ্গীতপ্রিয়তা ও রাসমনি দেবীর জীবনে কোন বিলাসিতাস্বরূপ ছিল না। সঙ্গীত প্রিয়তার মাধ্যমে তিনি ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করতেন। তাই তাঁর প্রতিটি অনুষ্ঠানেই বিশিষ্ট গায়কদের দ্বারা সঙ্গীত

পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকত। অবশ্য আনন্দ উপভোগও এই সঙ্গীতের একটি অঙ্গ ছিল। এই সঙ্গীতপ্রিয়তার জন্যই রাসমনি দেবী প্রায় হাজির হতেন আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে -দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া সঙ্গীত শ্রোতার মনের গভীরে সুপ্ত আত্মরসকে জাগিয়ে গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে অন্তর্নিহিত উপলব্ধির সেতু রচনা করত, সে সঙ্গীতে আত্মার আহ্বান ধ্বনিত হতো। মহাভাব সাধনার এগিয়ে চলার প্রাণধর্মী সঙ্গীতই ছিল রাসমনি দেবীর অত্যন্ত প্রিয়। অনামী আনন্দে আত্মহারা, মহাভাব সঙ্গীতের ধারক ও বাহক শ্রীরামকৃষ্ণ তাই মহাভাবের সাধিকা রাসমনি দেবীর সঙ্গীতশ্রবণে অন্যমনস্কতার দরুণ তাঁর কোমল অঙ্গে আঘাত করে আত্মবিকাশের সুযোগ দিয়েছিলে বলেই, সঙ্গীত প্রেমিকা রাসমনি দেবী ভক্তসত্তার অমৃতপুঞ্জিত রসধারায় ডুব দিয়ে নিজ জীবনের সাময়িক শূন্যতাকে পূর্ণ করেছিলেন। এটি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল প্রকৃত সঙ্গীত প্রিয়তার জন্য। অধ্যাত্ম ভাবধারার সঙ্গীত শ্রবণটিকেও তিনি সাধনার অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাসমনি দেবীর চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। আধুনিক ভাগবত ধর্ম বলতে সাধারণত বৈষ্ণবধর্মই বোঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি ভক্তিমার্গের সকল উপাসকই ভাগবত ধর্মাবলম্বী কারণ, তাঁরা সকলেই ভক্তিমার্গের শ্রেষ্টত্ব স্বীকার করেন। যদিও তাঁদের সাধনপ্রণালীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই কিছু পার্থক্য আছে। তাই পণ্যবতী রাসমনি দেবী দক্ষিণেশ্বরে তিনটি ভাবেরই সমদর্শিনীরূপে মন্দিরগুলি স্থাপন করেছিলেন। মূল ভগবতধর্মকে স্বীকার করেই। এমনকি মন্দিরের পাশেই ইংরেজের কুঠি ও মুসলমানের গাজিপীরের দরগা তিনি বিনষ্ট করেননি অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত। ধর্মের ঐক্য সাধনই তাঁর আদর্শ ছিল বলেই তিনি এজগতে সর্বধর্মসমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধান পেয়েছিলেন। যিনি হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মেরও সাধন করে - 'যত মত তত পথ' এই উদার ধর্মমতের এক নজির সৃষ্টি করলেন।

প্রকৃতপক্ষে ভক্তিভাবই রাসমনি দেবীর জীবনের প্রধান অবলম্বন হওয়ায়, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁর সার্বজনীন ধর্মপ্রীতির তাৎপর্য বহন করে। এবিষয়ে তিনি কখনো কাউকে উপদেশ দেননি- কর্মের মাধ্যমেই নিজের জীবনকে করেছিলেন তিনি উপদেশামৃত। সাধনার দ্বারা যে, ভক্তিরত্ন তিনি লাভ করেছিলেন। সেটিকেও তিনি নিজের সম্পত্তি ভাবেননি। তাই তাঁর সারাজীবনের অহেতুকি ভক্তিপ্রসূত দক্ষিণেশ্বর দেবালয়কে সকল ধর্মাকাঙ্খীয় হিতার্থে নিজের সম্পত্তি না ভেবে দেবতার উদ্দেশ্যে এই মহান ত্যাগ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধারই নিদর্শন, সাত্ত্বিকী বুদ্ধির পরিচয় এবং বৈষ্ণবীশক্তির ক্রিয়া। যিনি ভগবানের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে পারেন, ভগবান তো তাঁকেই কৃপা করেন। তাই যেদিন রাসমনি দেবী তাঁর জীবনের সাধনালব্ধ

কর্মফল এই রত্নটিকেঈশ্বরে সমর্পন করলেন ঠিক তার পরের দিনই ঈশ্বরের আহ্বানে তাঁর কাছে ফিরে গেলেন। ভক্তি রহস্যের এই তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ বুদ্ধির অতীত। রাসমনি দেবীর কি মানবী সত্তা কি দেবী সত্তা- যে কোন সত্তাকে বুঝতে গেলে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় তাঁর মধ্যে প্রবল আত্মিক শক্তি। সকল মানুষের মধ্যেই তার কোন অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় না। শিক্ষা, সংস্কার বা জীবনযাত্রায় সঠিক প্রণালীর অভাবে। শরীরের শক্তিবৃদ্ধির জন্য যেমন শারীরিক ব্যায়ামের দরকার হয়, এই সুপ্ত ও অজ্ঞাত আত্মিকশক্তি বিকাশের জন্যও সাধনার প্রয়োজন হয়। শৈশবকাল থেকেই রাসমনি দেবীর জীবনে এই অল্পবিস্তর সাধনার কথা আমরা বলতে পারি, যার দ্বারা পরবর্তীকলে তাঁর জীবনে আত্মোন্নতি সম্ভব হয়েছিল। এই আত্মিক শক্তি অবশ্য জ্ঞানমার্গের মধ্যে পরে। অধ্যাত্মশাস্ত্র বলেন, আত্মনাং বিদ্ধি। অর্থাৎ আত্মাকে জান। আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করা যায় এইটাই আত্মিক শক্তি। এই শক্তিব দ্বারা জগতে সব কিছু জয় করা যায়। কিন্তু অপর পক্ষে ভক্তিশাস্ত্রে নির্দেশ আছে শ্রীহরিতে আত্মসমর্পন। অনন্য ভক্তি যোগের দ্বারা ঈশ্বরের যে কৃপালাভ করা যায়,সেই ঈশ্বরীয় কৃপাশক্তিতেই জগৎকে জয় করা যায়। অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের আত্মশক্তিবাদ এবং ভক্তিমার্গের কৃপা শক্তিবাদ মূলত একই ভগবৎশক্তিবাদ এবং গীতার মতে তারা পরস্পরসাপেক্ষ। অবশ্য উভয় শক্তি অর্জনেই সাধনার প্রয়োজন। রাসমনি দেবীর জীবনে এই দুটিরই সমন্বয় ঘটেছিল। যদিও মূলত তিনি ছিলেন ভক্তিমার্গের সাধিকা। যিনি জ্ঞানী- তিনিও ছিলেন ভক্তিমার্গের সাধিকা। যিনি জ্ঞানী, তিনিও ভক্ত। আবার যিনি ভক্ত তিনিও জ্ঞানী। বিজ্ঞানের মতে, আত্মিক শক্তির অপর নাম মনঃ শক্তি। ইংরেজিতে এই শক্তিকে সাইকিক পাওয়ার বা মাইন্ড পাওয়ার বলে। আর আমরা যাকে আধ্যাত্মিক শক্তি বলি, ইংরেজিতে তাকে স্পিরিচুয়াল পাওয়ার বলে এই আধ্যাত্মিক শক্তি আত্মিক শক্তির চাইতে অনেক বড়। আত্মিক শক্তি বা মনঃ শক্তির আবার নানা শ্রেণী আছে যেমন- ব্যক্তি আকর্ষণী শক্তি, দিব্যানুভূতি, দিব্যদর্শন. ইচ্ছাশক্তি, পূর্বদৃষ্টি, ভবিষ্যৎদৃষ্টি, অন্তদৃষ্টি ইত্যাদি। কিন্তু এই সবগুলিকে কোন একজনের পক্ষে আয়ত্ব করা সাধারণত সম্ভব হয় না। অথচ সাধক বা সাধিকার পক্ষে অল্প চেষ্টাতেই এই শক্তিগুলির অধিকাংশই তাঁদের জীবনে স্ফূরিত হয়। এই আত্মিক শক্তিই চরম উৎকর্ষতা লাভ করে আধ্যাত্মিক শক্তির রূপায়নে উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তিই প্রকৃতপক্ষে অতিপ্রাকৃত শক্তি যাকে অনেকে ব্রহ্মশক্তিও বলেন। যিনি সাধনা করেন, তিনি শুদ্ধচিন্তা, আত্মসংযমী, পবিত্র চেতা পরোপকারী ধর্মপরায়ন ও ক্ষেত্রবিশেষ অল্প বিষয়াসক্ত হন। রাসমনি দেবীর জীবনতত্ব দেখা যায়। তিনি ছিলেন এই স্তরের সাধিকা। সকল প্রকার সৎচিন্তা সদ্‌গ্রন্থপাঠ, সৎকর্ম এবং সৎ অভ্যাসের অনুশীলনের মাধ্যমে, মানুষের মনের দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা, হীনতা, নীচতা,

প্রভৃতি দূর হয় এবং মনও সুস্থ ও সবল থাকে। ফলে, ভিতরের আত্মিক শক্তি ক্রমশ আরও বিকশিত হয়। রাসমনি দেবীর জীবনেও এমন অনেক জপ, ধ্যান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে আমরা একপ্রকার কর্মযোগ এবং রাসমনি দেন সারাজীবন এই কর্মযোগের দ্বারা মানসিক সুস্থতা বা মনের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। চিত্তশুদ্ধি না হলে, মনের সুস্থতা বজায় রাখা যায় না। আবার মনের সুস্থতা বজায় না থাকলে, আত্মিক শক্তির বৃদ্ধি হয় না। অবশ্য পূর্বজন্মের কিছু সংস্কার বা সুকৃতিও এই বিষয়ে মানুষকে সাহায্য করে। রাসমনি দেবীর জীবনে এই আত্মিকশক্তি বৃদ্ধির কয়েকটি রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে দেখা যায়, তিন তাঁর বৈষ্ণব পিতামাতার কাছেই হরিভক্তি লাভের উপায় হিসাবে বৈষ্ণবোচিত ক্রিয়াগুলি পালন করবেন এবং তাঁদের অনুকরণে কোলাকুলি নিয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি, নামকীর্তন ও তিলকধারণও করতেন। এইভাবেই বাল্যকাল থেকেই রাসমনি দেবী পিতামাতার ভগবক্তির মহাধয়নের প্রকৃত উত্তরাধিকারিনী হন। একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বাল্যজীবনে পিত্রালয়ের এই পবমার্থভাবের পরিবেশ পরবর্তী কালে রাসমনি দেবীর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। শৈশব থেকেই পিতৃদত্ত এই ধর্মীয় চেতনা বীজাকারে তাঁর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল এবং পরে যথাসময়ে তা বিকশিত হয়েছিল। তাঁর বৈষ্ণবপিতার অন্যান্য গুণাবলীও রাসমনি দেবীর আত্মগঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং দরিদ্র পিতার আর্থিক অক্ষমতাও তাঁর ভাবী জীবনকে বহুলাংশে সহিষ্ণু হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। ফলে, দারিদ্র্য যেন অভিশাপের বদলে আশির্বাদের মতো তাঁর প্রথম জীবনকে স্পর্শ করেছিল এবং হীনতাবোধের বিশেষ গ্লানিকে দূরে ফেলে বীরত্বের ও মহত্বের পক্ষে তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, এবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তাছাড়া মাত্র সাত বছর বয়সে মাতৃহারা হয়ে রাসমনি দেবী প্রাণে যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলে, সেই বিষাদযোগের মাধ্যমেও তিনি অতিমাত্রায় ঈশ্বর নির্ভরশীলা হয়ে পড়েছিলেন। রাসমনি দেবীর আত্মিক শক্তিবৃদ্ধির পটভূমিকা এইভাবেই রচিত হয়েছিল। আত্মিকশকিত বৃদ্ধির সহায়ে যে কয়টি উপায় সাধনার অঙ্গ হিসাবে সাধারণত অবলম্বিত হয়, সবকয়টির সঙ্গেই রাসমনি দেবী যুক্তা ছিলেন। যেমন জপ, ধ্যান, পূজা, প্রার্থনা, নামগান প্রভৃতি। জপ করগণনা, মালা করা সংখ্যা রাখা দ্বারা মনকে বিষয় থেকে উঠিয়ে এলে ধ্যেয় বস্তুতে আকৃষ্ঠ করে। অবশ্য নিজের ভিতরে পদার্থ না থাকলে বাহ্যিক ক্রিয়া কোন ফললাভ হয় না। ইষ্টবস্তুকে স্মরণ মনন দ্বারা তাঁর সঙ্গে মনের যোগ স্থাপন করা যায় এবং চিত্তশুদ্ধি ঘটে। শাস্ত্রে বল হয়- জপাৎ সিদ্ধি অর্থাৎ জপেতেই সিদ্ধি। জপযজ্ঞ আর নামযজ্ঞ একই জপ গোপনে করা হয়, নাম প্রকাশ্যে করা হয়। গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রই জপের নিয়ম কিন্তু ভগবানের নামগুনের জন্য কোন পৃথক গুরুর প্রয়োজন হয় না। রাসমনি দেবীর

কুলগুরু ছিলেন বটে, কিন্তু নাম গান তিনি শিখেছিলেন তাঁর বৈষ্ণব পিতামাতার কাছ থেকেই অতি শৈশবে। নাম ও নামী অভেদ, সেজন্য নামব্রহ্মের সহায়েই তিনি ব্রহ্মশক্তির অধিকারিনী হতে পেরেছিলেন। আবার নিয়মিত সন্ধ্যা আহ্নিকের ফলেও তাঁর আত্মিকশক্তির স্ফূরণ হতো। প্রতি অহোরাত্রের প্রত্যেক সন্ধিক্ষণে সম্যক ধ্যান করাকেই সন্ধ্যা ক্রিয়া বলা হয়। তুলাসিমালা কণ্ঠে ধারণ করে গৃহদেবতা রঘুনাথের সকাল সন্ধ্যা অর্চনা,জপ-ধ্যান প্রভৃতি রাসমনি দেবীর জীবনকেও তুরীয়ানন্দে ভরিয়ে রাখতে। কোন কারণে বাহ্যিক ক্রিয়ায় বাধা পড়লেও একদিনও ইশ্বরচিন্তা অর্থাৎ স্মরণ মনন থেকে তিনি বিরত হননি। এ বিষয়ে শাস্ত্র বলেন-

'ওঁ অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা
যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং সব বাহ্যন্তবঃ শুচিঃ।'

অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি বাহ্যভাবে অপবিত্র হউক, অথবা বাহিরে পবিত্র হইয়াও অন্তরের মলিনতা নাশে অসমর্থ হোক, একবার পদ্মপলাশ লোচন শ্রীভগবানকে ভক্তিভাবে স্মরণ করিতে পারিলেই তাহার বাহির ও অভ্যন্তর সহিত সমস্ত দেহই শুচি অর্থাৎ পবিত্র হইয়া থাকে। শৈশব থেকে আমৃত্যু, রাসমনি দেবী ভগবানকে নিয়েই সংসার করছেন। তাই তাঁর সংসারটি ছিল গৃহদেবতা রঘুনাথ জিউর সংসার। তীর্থভ্রমণের দ্বারা ও রাসমনি দেবী পুণ্যসঞ্চয়, তথা আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের অধিকারিনী হয়েছিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ হাজার হাজার ভক্ত যেখানে ভগবান বা ভগবতীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভক্তি বা পূজা করেন, সেইগুলিকে তীর্থস্থান বলে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, তীর্থস্থানে গেলে ভগবানের বিষয়ে মনে উদ্দীপনা হয়। রাসমনি দেবীর কয়েকটি তীর্থস্থানে গিয়ে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও প্রেমের অপূর্ব মিলন দর্শন করে, সাধনপথের অন্যতম মাহাত্ম্য উপলব্ধির মাধ্যমে নিজ জীবরে আত্মিক শক্তির পুষ্টিক্রিয়া - সমাধা করেছিলেন। শেষ জীবনে নিজেই দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তীর্থমহিমায় সেটিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে গেছেন। এছাড়া আত্মিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য অজ্ঞাতসারেই শাস্ত্রনিহিত যে, পঞ্চ মহাযজ্ঞ তিনি অতীব নিষ্ঠাসহকারে সম্পাদন করে গেছেন, সেটির উল্লেখ করাও বিশেষ প্রয়োজন। বৈদিক গুহ্যসূত্র, মন্বাদি সংহিতা ও পুরানে অনুমোদিত এই পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থদের জন্যই নির্দিষ্ট। যথা-

'ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চভূতযজ্ঞ স্তথৈবচ।
পিতৃযজ্ঞ তথা দৈবো পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্তিতাঃ।' অর্থাৎ, ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ- ইহাই 'পঞ্চ মহাযজ্ঞ, বলিয়া কীর্তিত।

১) ব্রহ্মযজ্ঞ- অর্থাৎ সনাতন আর্যশাস্ত্রের নিত্য পঠনপাঠন। রাসমনি দেবী নিত্য শাস্ত্র পাঠ করতেন বা শুনাতেন।

২) পিতৃযজ্ঞ- অর্থাৎ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ বা তর্পণ। এই বিষয়ে শাস্ত্র নারীকে যেটুকু অধিকার দিয়েছিল, স্ত্রীলোক হিসাবে রাসমনি দেবী তাঁর যথাকর্তব্য করেছিলেন।
৩) দেবযজ্ঞ- অর্থাৎ অগ্নিহোমাদি হোম বা সূর্য-চন্দ্রের জ্যোতিঃ ধারণ। এই কাজ রাসমনি দেবীর উদ্যোগে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় সম্পাদিত হয়েছিল।
৪) ভূতযজ্ঞ- জীবভূত মাত্রের নিত্য বলি বা আহার্য প্রদানরূপ জীব সেবা। এই কাজও রাসমনি দেবীর উদ্যোগে দক্ষিণেশ্বরে সম্পাদিত হয়েছিল।
৫) নৃযজ্ঞ- নিত্য অতিথি- অভ্যাগতদের অথবা দীন দরিদ্রের সেবা। এই কাজে রাসমনি দেবী ছিলেন সবচেয়ে অগ্রণী। সুতরাং রাসমনি দেবীর জীবনতত্ত্বের এই দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে, তাঁর গুন, ক্ষমতা প্রভৃতির উৎসগুলিরও সন্ধান পাওয়া যায়।
রাসমনি দেবীর জীবনে আর যেটি বিশেষভাবে নজরে আসে, তা হলো তাঁর ব্যক্তি আকর্ষণী শক্তি। এটি তাঁর পারিবারিক, সামাজিক এমনকি ধর্মীয় বিষয়েও প্রযোজ্য

একটি নগন্য গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের প্রায় অশিক্ষিতা সামান্য একটি ক্ষুদ্র কিশোরী শহরের একটি শিক্ষিত আভিজাত্যপূর্ণ ধনী জমিদার বাড়ির বিপরীত পরিবেশের মধ্যে এসে যেভাবে তাঁর অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সেটি তাঁর ব্যক্তি আকর্ষণীয় শক্তির অসামান্য পরিচয়। যে বড়িতে বিবাহের পর তিনি এলেন সেই অপরিচিত পরিবারের সকলেই, গুরুজন থেকে দাস দাসীকেও তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই জয় করে নিলেন। তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল শানিত বুদ্ধি। কোমল হৃদয় ও ধর্মে নিষ্ঠা। সকলের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করাকেই প্রকৃত আভিজাত্য বলে। রাসমনি দেবীর মধ্যে ছিল এই প্রকৃত আভিজাত্য। এই আভিজাত্যের সঙ্গে আত্মীয় প্রীতির বাড়তি গুণের দরুণ অনেক আত্মীয় কুটুম্বও ছিলেন তাঁর কাছে প্রেমের ঋণে ঋণী। শ্বশুরালয়ে রাসমনি দেবী যদিও তাঁর স্বামীর তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী, সেজন্য কোনদিনই তিনি হীনমন্যতায় কষ্ট পাননি। বরং শ্বশুরলায়ে তিনিই ছিলেন সর্বময় কর্ত্রী গৃহিনী এবং তাঁর ইচ্ছা, অনুরোধ বা আদেশে শিক্ষিত জামাতাগণসহ সকলেই পরিচালিত হয়েছন, এমনকি তাঁর স্বামী রাজচন্দ্র দাসও রাসমনি দেবীর আবদার বা প্রার্থনা মঞ্জুর না করে থাকতে পারেননি, তাঁদের অসীম দাম্পত্যপ্রেমের প্রভাবে। অথচ বাইরে কর্তা হয়েও রাসমনি দেবী অন্তরে ছিলে অকর্তা। কিন্তু তাঁরা অসীম ব্যক্তি আকর্ষণী শক্তির প্রভাবেই তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সর্ববিজয়িনী ছিলেন। রাসমনি দেবীর মতো নারীরা বিশেষ রূপবতী, গুণবতী বা শিক্ষিত না হলেও এই বিশেষ আকর্ষণী শক্তির সাহায্যেই সংসারের সকল লোক তাঁদের বশীভূত হয়।

এটিকেই ব্যক্তিত্বশক্তি বলা হয়েছে। এই ব্যক্তি আকর্ষণী শক্তিকে আধুনিককালে নানাজনে ইংরেজিতে নানা নামে অভিহিত করেছেন। যথা- ভাইটাল ফোর্স, লাইফ ফোর্স, ব্রেইন ফোর্স ইত্যাদি। কিন্তু বাংলায় এটিকে ওজঃ নাম দেওয়া হয়েছে। মানুষের দেহের সার পদার্থই ওজঃ। এই শক্তির অধিকারী ব্যক্তিরা স্বভাবতই শিষ্ট, সদালাপী, নির্ভিক , গম্ভীর প্রকৃতির হন এবং তাঁদের চালচলনে, আচরণে, এমনকি বচনেও একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। আমাদের রাসমনি দেবী ছিলেন ঠিক এই প্রকৃতির মানুষ। তাই তাঁর জীবনও হয়েছিল সর্ববিষয়ে সাফল্যমন্ডিত। তাঁর আত্মমর্যাদা জ্ঞান, তাঁকে আত্মক্ষমতায় বেশি সাহায্য করেছিল। তাই প্রবল প্রতাপ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বারে বারে প্রতিবাদে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রতি ক্ষেত্রে সফল হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রকৃত ক্ষত্রিয়ানী। আত্মিক গুণের লক্ষণ হিসাবে, প্রচণ্ড সাহস ছিল তাঁর চরিত্রের মধ্যে প্রধান গুণ। কায়িক ও আত্মিক দুটি গুণেরই অধিকারিনী ছিলেন বলেই তিনি একাই গোরা সৈন্যদের সামনে তরবারি ধারণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর মধ্যে সেজন্য শক্তি, শান্তি ও সম্ভ্রমের ভাবমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। রাসমনি দেবী শুধু একজন ব্যক্তি নন- পূর্বে বর্ণিত বিশ্লেষণের আলোকে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর ব্যক্তিত্ব কোন বিশেষ পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেনি। একথা যেমন সত্য, আবার নিজের ব্যক্তিত্বেই তিনি নিজে ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান-একথাও তেমনি সত্য। রাসমনি দেবীর আরেকটি বিশেষ গুণ ছিল একাগ্রতা। মনের একাগ্রতার শক্তি অসীম। একাগ্রতা কেবলমাত্র আত্মিক বা আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের সহায়ক নয়, বৈষয়িক কার্যাদিতেও একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন হয়। রাসমনি দেবী যখনই যে কাজে হাত দিয়েছেন, সেই কাজে মন প্রাণ ঢেলে অগ্রসর হয়েছেন। যতই বাধা বিঘ্ন আসুক, মানসিক একাগ্রতার দ্বারা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। মনের প্রশান্ত অবস্থা না থাকলে, একাগ্রতার অভাব ঘটে। একাগ্রতার ফলেই সাধকের মনে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয় এবং অন্তর্জগতের রহস্য উপলব্ধি করার সামর্থ্য জোগায়। মনঃ সংযমের দ্বারাই মনের একাগ্রতার সৃষ্টি হয়। জীবের সঙ্গে জীবের প্রকৃতির যে বিভিন্নতা ঘটে, তার কারণ এই যে, মনের গঠন সবার এক নয়। দর্শনশাস্ত্র জীবের মনকে তার প্রকৃতি অনুসারে, পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন- ক্ষিপ্ত, মূঢ় বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। মনের সর্বনিম্ন স্তর হলো- ক্ষিপ্ত, মূঢ় বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। মনের সর্বনিম্ম স্তর হলো- ক্ষিপ্ত এ অবস্থায় কোন সাধনভজন হয় না। ক্ষিপ্তের পরবর্তী উচ্ছৃঙ্খল হলো- মূঢ়। এই অবস্থাতেও ভোগশেক্তির মোহে কোন সাধনভজন হয়না। মনের তৃতীয়স্তর হলো- বিক্ষিপ্ত। এই অবস্থায় অতীন্দ্রীয় পরমবস্তুকে জানার জন্য মন চঞ্চল হয়, ফলে সাধনভজনে বিঘ্ন ঘটে, মনেরচতুর্থ স্তর হলো- একাগ্র। এই একাগ্রতা বা একনিষ্ঠতার ফলে

সাধক পূজা, সেবা, দান প্রভৃতি সৎকর্মের সাহায্যে পবিত্র মন নিয়ে একমাত্র ভগবানের উদ্দেশ্যেই অগ্রসর হয়। মনের শ্রেষ্ঠতম বা পঞ্চম স্তর হলো- নিরুদ্ধ। এ অবস্থায় একাগ্রতা এত গভীর হয় যে, জগতের বা গৃহ সংসারের কথা আর মনে স্থান পায় না। সাধক তখন ইষ্টধ্যানে, ইষ্টকর্মে, ভগবৎ চিন্তায় এমন বিভোর হন যে, অন্য সবকিছু তখন অসার ও অর্থহীন মনে হয়। রাসমনি দেবীর ঠিক ঠিক নিরুদ্ধ অবস্থা না এলেও সর্ববিষয়ে একাগ্রতা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন ও পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করেছিল, এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। মনের একাগ্রতার সুফল সম্পর্কে স্বামী বুধানন্দজী মহারাজ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। লাভের দৃষ্টিতে দেখলে মনঃসংযমের দ্বারা সর্বোচ্চ যে ফললাভ হয়, তা হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান। এছাড়া সংযত মন জীবনের বহুক্ষেত্রেই সুখদায়ক বস্তুলাভ করে। নিয়ন্ত্রিত মনকে সহজেই একাগ্র করা যায়। একাগ্র মনের দ্বারাই জ্ঞানলাভ সম্ভব এবং জ্ঞানই শক্তি। মনঃসংযমের একটি স্বতঃস্ফূর্ত ফল হলো- ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা। সেইরকমলোক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সফল হয়। সংযত মন ক্রমে শান্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং শান্তভাব থেকে মানসিক শান্তির জন্ম হয়। মানসিক শান্তি সুখ উৎপন্ন করে। একটি সুখী হৃদয় অন্যদেরও সুখী করে। তার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিক ভাবেই সে সাধারণত স্থায়ী সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। এইরকম লোকদের যে জীবনের অগ্নিপরীক্ষাগুলির সম্মুখীন হতে হয় না, তা নয় তবে সেগুলির মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস ও শক্তি কখনো তারা হারায়না। এধরনের ব্যক্তিরা যে পরিবারের কর্তা হয়, সেখানে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, আনন্দ, সংস্কৃতি এবং চমৎকার পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সমাজ সেই ব্যক্তিকে সুখী জীবনের আদর্শ হিসাবে দেখে। উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত, রাসমনি দেবীর জীবনধারার সঙ্গে এমনভাবে মিলে যায় যে, তাঁর শুভ ব্যক্তিত্বকে আদর্শরূপে পৃথকভাবে বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। রাসমনি দেবীর দিব্যানুভূতি, দিব্যদর্শন, শিব্যশ্রুতি ও দিব্যদৃষ্টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করলে, তাঁর জীবনতত্ত্বের অনেকাংশেই অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই সংক্ষিপ্তাকারেও সেগুলি এখানে বিবৃত করা প্রয়োজন। মনের যে শক্তি দ্বারা পার্থিব জগতের উর্দ্ধে আধ্যাত্মিক জগতের নানা রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়, তাকেই সাধারণত দিব্যানুভূতি বলা হয়। ধর্মভাবাপন্ন, সত্যবাদী, সাত্ত্বিকাহারী, সংযমী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিনা সাধনাতেও এই অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তবে কেউ যদি এই বিষয়ে বিশেষ সাধনা করেন, তিনি যোগসিদ্ধ ব্যক্তির মতোই ক্ষমতাশালী হন। আবার কেউ কেউ এই বিষয়ে সর্বাধিক শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। দিব্যানুভূতি সূক্ষ্ম স্পর্শেন্দ্রিয়েরই ক্রিয়া। রাসমনি দেবীর পরবর্তী পবিত্র ব্রহ্মচারিনী জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই এই দিব্যানুভূতির বিকাশ ঘটেছিল। দিব্যানুভূতির মতো রাসমনি দেবীর জীবনে দিব্যদর্শন লাভেরও ইঙ্গিত পাওয়া

যায়। দিব্যদর্শন ও সূক্ষ্ম দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা সমাধা হয়। রাসমনি দেবীর জীবনের মধ্যভাগে এবিষয়ে বিশেষ কিছু উল্লেখ না থাকলেও জীবনের শেষ মুহুর্তে তঁর ইষ্টদেবীকে দর্শন, অন্তরেন্দ্রিয়ের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। জ্ঞানমার্গে এটিক আত্মদর্শন বলা যায়। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে দিব্যদর্শন শক্তির বিকাশ ঘটে এবং তার ফলেই মানুষের অর্ন্তজ্ঞানের উন্মেষ হয়। আবার কোন সময়ে আকস্মিকভাবেও এটি ঘটতে পারে। মানুষের মধ্যে যে দিব্যদর্শন শক্তি আছে তার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ হলো অনুরূপ স্বপ্নদর্শন। রাসমনি দেবীর জীবনেও এরূপ স্বপ্নদর্শন ঘটেছিল। যিনি পূর্বজন্মকৃত বা উত্তরাধিকার সূত্রে তা লাভ করেন, তিনি সাধনা ছাড়াই কেবলমাত্র অনুকূল পরিবেশের মধ্যে দিব্যদর্শন লাভ করেন। অবশ্য মানসিক একাগ্রতাই এই দিব্য দর্শন লাভের শক্তিকে বৃদ্ধি করে। রাসমনি দেবীর জীবনে এই মানসিক একাগ্রতার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দৈববাণী বা প্রত্যাদেশ শোনা-দিব্যশক্তিধারীর একটি বিশেষ লক্ষণ। রাসমনি দেবী এই দিব্যশক্তির অধিকারিনী ছিলেন। তাই দৈববাণী বা প্রত্যাদেশ শোনার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। বিশুদ্ধভাবে আচার নিষ্ঠার সঙ্গে দেবদেবীর পূজা, সাধনভজন বা নামকীর্তন করলে এই দিব্যশ্রুতি লাভ করা যায়। এটি সূক্ষ্ম-শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে, দিব্যানুভূতির বিস্তৃতি ঘটে দিব্যদর্শনে এবং দিব্যদর্শনের পরিণতি হয় দিব্যশ্রুতিতে। দিব্যশ্রুতি যেহেতু একটি উচ্চতর আত্মিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি, সেজন্য উপযুক্ত সাধনা ছাড়া এই শক্তির স্ফূরণ হয় না। রাসমনি দেবীর জীবনে স্বাভাবিকভাবেই এই সাধনার স্রোত বইত। এককথায় বলা যায়- দিব্যানুভূতি, দিব্যদর্শন ও দিব্যশ্রুতি এই তিনটি একই আত্মিক শক্তির বিভিন্ন বিকাশ, তাই মানুষের মনের অন্তর্নিহিত আত্মিক শক্তির মধ্যে কোন সীমারেখা টানা যায় না। এই শক্তির সহায়ে জগতে যে কোন আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব এমন দৃষ্টান্ত বহু মহাজনের জীবনে পাওয়া যায়। রাসমনি দেবীও এই সবকয়টি শক্তি বা গুণের অধিকারিনী ছিলেন বলেই তাঁর দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে ভাবিকালের আধ্যাত্মিক বিপ্লবের বীজ অনেক পূর্বে বপন করা সম্ভব হয়েছিল। দিব্যদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি শক্তিও আত্মিকশক্তির ক্রমবিকাশ। এই শক্তির সহায়ে মানুষ অতীতকে জানতে পারে, ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কেও তেমন তার অন্তরে সংবাদের আদানপ্রদান হয়। রাসমনি দেবীর জীবনেও এই দিব্যদৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করেছিল। তাই তিনি ভাবী মহান সাধকের আগমনের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন এবং সেই দূরদৃষ্টিত সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ভাবী অবতাররূপে পূজিত সেদিনের সেই অনামী পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমভক্তি উদ্দীপিত দিব্যময় ভাবটিকে তিনি স্বীয় মহিমায় স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। সকল বাধা-বিঘ্ন প্রতিরোধ করে। তাই, পূজকের পদ থেকে রেহাই দিয়ে, রাসমনি দেবী তাঁর দিব্যদৃষ্টিশক্তির গুণে শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সহায়িকা

হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক সাধনার রহস্যে রাসমনি দেবী নিজের আত্মসত্তার শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবকে উপলব্ধি করে। তাঁর সাধনার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। যদি এই কাজে রাসমনি দেবী অসহযোগিতা করতেন, তবে কামার পুকুরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়কে আমরা দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে এইভাবে এত সহজে এবং এত শীঘ্র লাভ করতাম কিনা সন্দেহ জাগে। সনাতনধর্মে মূলীভূত উদার সার্বভৌম ভাবের অমৃতময় পাত্রটি রাসমনি দেবীই আবিষ্কার করেছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাঁর মাতৃত্বের মহিমায়। তাই মাতৃমাধুর্যে তিনি জগন্মাতা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, তিনি মা-জগদম্বারই অংশবিশেষ অষ্টনায়িকার অন্যতমা। জহুরিই ঠিক জহর চিনতে পারে। এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাসমনি দেবী ছিলেন পরস্পরের জহুরি এবং নিজেরাই জহর। তাই উভয়ই উভয়কে ঠিকমতো চিনেছিলেন। রাসমনি দেবীর মানবী সত্তা ও দেবী সত্তা সেজন্যই একত্রে একটি অবিনশ্বর, মহাভাব এ পরিণত। এটাই তাঁর শাশ্বতরূপ। রাসমনি দেবী আজ তাই কেবলমাত্র একজন মানবী ও দেবী নন তিনি নিজেই একটি স্বতন্ত্র মহাভাব রাসমনি দেবীর দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও তাঁর মহাভাব বিগ্রহ আজও বর্তমান। প্রভিট-দীপ্ত এই মহিয়সী নারীর সেই জীবন্ত মহাভাব আজও ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম। তাঁর সেই প্রমূর্ত মহাভাবটি বর্তমানে গবেষণা ও অনুধ্যানের বিষয়। রাসমনি দেবীর জীবনতত্ত্ব সম্পর্কে এইটাই বাস্তব এবং শেষ কথা। বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস যিনি লিখবেন, তাঁকে রানি রাসমনির জীবনকথা লিখতেই হবে, তা না হলে তিনি ঐতিহাসিকই নন। আবার যে নারী গার্হস্থ্য সন্ন্যাস পালনে আগ্রহী, তাঁকেও রাসমনি দেবীর জীবন তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতে হবে, তা না হলে, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাসও তাঁর জীবনে একরকম বিলাসিতায় পর্যবসিত হবে। পরিশেষে বড়ই পরিতাপের সঙ্গে উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি যে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে রানি রাসমনি আজ উপেক্ষিতা, কোটি কোটি মানুষের কাছে আজ তিনি অপরিচিতা, এমনকি শত শত ধর্মসভাতেও এই ধর্মপ্রাণা মহাসাধিকা অবহেলিতা এবং তাঁর নামও অনুচ্চারিত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যদৃষ্টি সহায়ে জগৎবরণ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে সপ্তর্ষি মন্ডলের এক ঋ ষি বলে যেমন চিহ্নিত করেছিলেন মহাসাধিকা রানি রাসমনিকেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে মা জগদম্বার অষ্টসখীর একজন বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা বজায় রেখে এবং তাঁর মতো ঈশ্বর কোটি পুরুষ প্রধানের সঙ্গে কারোর তুলনা না করেও এই অপ্রিয় সত্যকথাটি স্বীকার করা উচিত যে, প্রবল শ্রীরামকৃষ্ণ প্রীতিসত্ত্বেও রানি রাসমনি সম্পর্কে ঠাকুরের মূল্যায়নকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই রানি রাসমনিকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন এবং তাঁর প্রাপ্য শ্রদ্ধা থেকেও

তাঁকে বঞ্চিত করেছেন। রানি রাসমনি আজ শুধু কলকাতার জানবাজারের জমিদার বাড়ির বিগতদিনের গৃহবধূ বা গৃহলক্ষী নন - তিনি আজ সমগ্র বাংলার গৌরবের সম্পদ। সমগ্র ভারতের ভাগ্যলক্ষী একথা সকলের স্মরণে রাখা জাতির স্বার্থেই প্রয়োজ। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও, তবে বিবেকানন্দকে জানো। তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি করে বলি - যদি ভারতলক্ষীকে জানতে চাও তবে রানি রাসমনিকে জানো ।

ভ্রমণ থেকে কর্তব্যে যোগদানের আগে পর্বতঘেরা অপূর্ব সুন্দর ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম রাজ্য আমার জন্মস্থান ত্রিপুরার সমগ্র ইতিহাস লেখার ফুরস্য যদিও পেলাম না, কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটি পংক্তি লিখে রাখলাম যাতে জানতে সুবিধে হয় আগামী প্রজন্ম তথা ভ্রমণপিপাসু আগন্তুকদের জন্য।

ত্রিপুরার প্রাচীন রাজবংশাবলীর কাহিনী বর্ণিত প্রাচীন উপাখ্যান রাজমালা। রাজমালা অনুসারে চন্দ্রবংশোদ্ভুত যযাতি ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা, এই বংশে দৈত্য নামে এক মহাশক্তিশালী নরপতির আবির্ভাব হয়। রাজা দৈত্য কপিল নদীর তীরে ত্রিবেগ নামক স্থানে তার রাজ্য পাট স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে ত্রিবেগ 'ত্রিপুর' নামে পরিচিত হয়, ত্রিপুরকে রাজমালায় অত্যাচারী রাজা বলে চিহ্নিত করেছেন। ত্রিপুরের পর সর্বগুণান্বিত ত্রিলোচন রাজা হন। হেরম্বের রাজকন্যা রাজা ত্রিলোচনের প্রধান মহিষী ছিলেন। তারা বারো পুত্রসন্তান ছিল। রাজা ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সম্মানিত অতিথি ছিলেন। ত্রিলোচনের পর তার দ্বিতীয় পুত্র দক্ষিণ পিতৃ সিংহাসন লাভ করেন। পরবর্তীতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ছোটভাই দক্ষিণকে পরাস্ত করে বড় ভাই দৃকপতি সিংহাসন দখল করেন। রাজা দক্ষিণ দল ছোটভাই নিয়ে অন্যত্র চলে যান। রাজা দক্ষিণ বরচক্র নদীর তীরে খলংসা নামক স্থানে পুনরায় রাজপাঠ স্থাপন করেন। রাজা দক্ষিণ থেকে নাগপতি পর্যন্ত বাহান্নজন রাজা ত্রিপুরা শাসন করেন। রাজা দক্ষিণের অস্তন তিপান্নতম পুরুষ বিমারের পুত্র ছিলেন রাজা কুমার। রাজা কুমার শিবের আরাধনার জন্য মনু নদীর তীরে শাম্বলনগর তার রাজধানী স্থাপন করেন, রাজা কুমারের পর যথাক্রমে সুকুমার, তৈছরই ও রাজেশ্বর ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। রাজেশ্বরের পরবর্তী অষ্টম রাজা হলেন প্রতীত। রাজা প্রতীত শাম্বলনগরের রাজপাট গুটিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগরে নতুন রাজ্যপাট স্থাপন করেন। পরবর্তী রাজাদের মধ্যে জুঝারফা যুদ্ধ বলে রাঙ্গামাটি পরবর্তীকালে ত্রিপুরার রাজাদের রাজধানী হয়ে উঠে। কয়েক পুরুষ পেরিয়ে ত্রিপুরারাজ ছেংথুমফার সঙ্গে গৌড়ের (বঙ্গের) নবাবের সংঘর্ষ বাধে। গৌড়ের নবাবের

বিরুদ্ধে ত্রিপুর রাজমহিষী হস্তিপৃষ্ঠে বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি ধারণ করে যুদ্ধ জয় করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ছেংথুমফাই ত্রিপুরার প্রথম ঐতিহাসিক নৃপতি, ছেংথুমফাই সর্বপ্রথম 'মানিক্য' উপাধি ধারণ করেন এবং পরে 'মহামানিক্য' নামে খ্যাত হন। ত্রিপুরাব্দের সঙ্গে ৫৯০ বৎসর যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দের সাল পাওয়া যায়। মহামানিক্যের রাজত্বকাল থেকে 'মানিক্য' রাজবংশের ঐতিহাসিক শুরু মহামানিক্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ 'ত্রিপারা' নামে পূর্ববঙ্গের মানচিত্রে স্থাপন করেন।

মহামানিক্যের অনুপ্রেরণায় মাধবকন্দলী অসমিয়া ভাষায় রামায়ন রচনা করেন। এই মহামানিক্যের পরবর্তী ত্রিপরার রাজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ধর্মমানিক্যের রাজ্যশাসন সংক্রান্ত তারিখই সঠিক মাপা যায়। রাজা ধন্যমানিক্য বাংলার মুসলমান সুলতানদের কর্তৃক কিছু দখলিকৃত ত্রিপুরার অংশ পুনরুদ্ধার করেন ধর্মমানিক্যের পর ত্রিপুরার রাজা হন রত্নফা বা রত্নমানিক্য। ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে রত্নমানিক্যই প্রথম মূদ্রা নির্মাণ করেন। এই মুদ্রা থেকে জানা যায় রত্নপুর (বর্তমান উদয়পুর অন্তর্গত) রত্নমানিক্যের রাজধানী। মূদ্রা তাম্রলেখের সাক্ষ্যে ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের ব্যবধানে বিজয়মানিক্য, মুকুটমানিক্য ও প্রতাপমানিক্যের উত্থান ও পতন হয়। ধন্যমানিক্য ত্রিপুরার প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে ধন্যমানিক্য ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির স্থাপন করেন। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে ধন্যমানিক্য গৌরের রাজা হুসেন শাহ কর্তৃক দখলীকৃত চট্টগ্রাম সহ তার রাজ্যের অংশবিশেষ পুনর্দখল করেন। রাজা ধন্যমানিক্যের পর তার পুত্র ধ্বজমানিক্য ও ইন্দ্রমানিক্য কিছুকালের জন্য রাজা হন।

মুদ্রার সব্দব্দাক্ষ্যে জানা যায় ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে দেবমানিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। দেবমানিক্যের পর দ্বিতীয় বিজয়মানিক্য পরাক্রান্ত ত্রিপুর নৃপতি হিসেবে পরিচিত। ত্রিপুরার মুদ্রার ইতিহাসে বিজয় মানিক্যের নাম উল্লেখযোগ্য এবং তিনি সম্রাট আকবরের সমসাময়িক। অনন্ত মানিক্যের রাজত্বকাল খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল। ক্ষমতার জন্য সেনাপতি তথা শ্বশুর গোপীপ্রসাদের হাতে তিনি নিহত হন। গোপীপ্রসাদ রাজপরিবারে, জন্মগ্রহণ না করেও ঐতিহ্য অনুযায়ী 'মানিক্য' উপাধি গ্রহণ করে এবং উদয়মানিক্য নামে সিংহাসনে বসেন। রাজা উদয়মানিক্য রাজধানী রাঙ্গামাটির নাম পরিবর্তন করে উদয়পুর নামকরণ করেন। উদয়মানিক্যের পুত্র জয়মানিক্যের রাজত্ব ও স্বল্পকাল। দেবমানিক্যের পুত্র অমর মানিক্য জয়মানিক্যকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করে ক্ষমতা দখল করেন। অমরমানিক্য পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের বিরোধে দুঃখিত হয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। অমরমানিক্যের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজধর মানিক্য সিংহাসনে বসেন। রাজধর মানিক্যের পর ইশ্বরমানিক্য নামে ত্রিপুর নৃপতির (মুদ্রায়) উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজা অমরমানিক্যের পুত্রদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজমুকুট লাভের বিরোধকে উপজীব্য করে রবি ঠাকুর 'মুকুট' নাটক রচনা করেছিলেন। যশোধর মানিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরায় বিপর্যয় দেখা দেয়। মোগলরা উদয়পুর দখল করে এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। রাজা যশোধর মানিক্যের ইচ্ছা অনুযায়ী ত্রিপুরাবাসীর কল্যাণমানিক্যকে রাজপদে বরণ করেন। কল্যাণ মানিক্য কসবায় দশভূজা ভগবতী মূর্তিটি স্থাপন করেন। উদয়পুরের গোপীনাথ মন্দিরটিও প্রতিষ্ঠা করেন। কল্যাণ মানিক্যের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দমানিক্য সিংহাসনে বসেন। গোবিন্দমানিক্য ভ্রাতৃবিরোধ এড়ানোর জন্য স্বেচ্ছায় সিংহাসন ও রাজ্য ত্যাগ করেন। ভ্রাতা নক্ষত্ররায় সাময়িকভাবে রাজা হন এবং ছত্রমানিক্য নাম দিয়ে মুদ্রা নির্মাণ করেন। কিছুকাল পরে গোবিন্দমানিক্য সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। একমাত্র গোবিন্দমানিক্যের তাম্রশাসনেই ত্রিপুরাব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। রবিঠাকুর রাজা গোবিন্দমানিক্যের কাহিনী অবলম্বন করে'রাজর্ষি' উপন্যাস ও 'বিসর্জন' নাটক রচনা করে। রাজা গোবিন্দমানিক্যের পর তার পুত্র রামদেব মানিক্য (১৬৭৬ খ্রীঃ) ও পৌত্র রত্নমানিক্য (১৬৮৫ খ্রীঃ) অল্পবয়সে সিংহাসনে বসেন। ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পিতৃব্যপুত্র নরেন্দ্র মানিক্য দ্বিতীয় রত্নমানিক্যকে রাজ্যচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন। কয়েক বছরের মধ্যে নরেন্দ্রমানিক্য বিতাড়িত ও নিহত হন। দ্বিতীয় রত্নমানিক্য পুনরায় রাজক্ষমতা ফিরে পান। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় রত্নমানিক্য কনিষ্ঠভ্রাতা মহেন্দ্রমানিক্য কর্তৃক নিহত হন। মহেন্দ্রের রাজত্বকাল স্বল্পস্থায়ী হয়। মহেন্দ্র মানিক্যের পর তার ভ্রাতা দ্বিতীয় ধর্মমানিক্য সিংহাসন অধিকার করেন এবং স্মারকমুদ্রা প্রচার করেন। দ্বিতীয় ধর্মমানিক্যের পর পর্যায়ক্রমে রাজত্ব করেন জগৎমানিক্য, মুকুন্দমানিক্য, দ্বিতীয় জয়মানিক্য, ইন্দ্রমানিক্য ও তৃতীয় বিজয়মানিক্য। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমানিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। তার সময়ে ইংরেজরা ত্রিপুরা দখল করে। রাজা কৃষ্ণমানিক্যের রাজত্বকালে রাজধানী উদয়পুর থেকে পুরাতন হাবেলি (পুরানো আগরতলা)স্থানান্তরিত হয়। অপুত্রক কৃষ্ণমানিক্যের মৃত্যুর পর মহারানি জাহ্নবী দেবী নিজ হাতে শাসনভার গ্রহণ করেন। তার শাসন তিন বৎসর স্থায়ী হয়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণমানিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজধরমানিক্য এবং ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গামানিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহন করেন। অপুত্রক দুর্গামানিক্যের মৃত্যুর পর রাজধর মানিক্যের পুত্র রামগঙ্গামানিক্য ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রামগঙ্গামানিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা যুবরাজ কাশীচন্দ্র মানিক্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ত্রিপুরার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। কাশীচন্দ্রমানিক্যের আমলে ত্রিপুরা শ্রীহট্ট কাছাড় জেলার সীমান্ত নির্ধারণ হয়। কাশীচন্দ্র মানিক্যের মৃত্যুর পর যুবরাজ কৃষ্ণকিশোর মানিক্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার থেকে 'খেলাত' (রাজপ্রদত্ত

সম্মানসূচক পোশাক) পেয়ে সিংহাসনে বসেন। রাজা কৃষ্ণকিশোর মানিক্যের রাজত্বকালে বর্তমান আগরতলায় (নতুন হাবেলী) রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ইশানচন্দ্রমানিক্য রূপে রাজদন্ড ধারণ করেন এবং ১৮৬২ সালে দেহত্যাগ করেন। ইশানচন্দ্র মানিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা বীরচন্দ্র রাজক্ষমতা লাভ করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার থেকে 'খেলাত' পেয়ে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ১৮৭৭খ্রীষ্টাব্দে ১২৫ টি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে 'মহারাজা' খেতাবটি ব্রিটিশ সরকার থেকে লাভ করেন। মহারাজা বীরচন্দ্রমানিক্যের শাসনকালকে ত্রিপুরার ইতিহাসে 'আধুনিক যুগ' বলা হয়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বীরচন্দ্রের সময়ে পরীক্ষিত এর নেতৃত্বে 'জামাতিয়া বিদ্রোহ' হয় বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত গায়ক। যদুভট্ট মহারাজ বীরচন্দ্রের রাজদরবার অলংকৃত করেছিলেন। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের আমলে এ রাজ্যের সঙ্গে রবি ঠাকুরের প্রথম সংযোগ ঘটে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের পুত্র রাধা কিশোর মানিক্য পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। মহারাজা রাধাকিশোরমানিক্যের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধুত্ব হয়েছিল। কবির কাছে রাধাকিশোর রাজর্ষি তুল্য ছিলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সাহিত্যিক, দীনেশ চন্দ্র সেন, কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টজনক রাধাকিশোর মানিক্য বিভিন্ন ভাবে আর্থিক সাহায্য করেছেন। যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় রাধাকিশোরমানিক্যের আর্থিক সাহায্যে পুষ্ট হয়। মহারাজা রাধাকিশোরের আমন্ত্রণে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ত্রিপুরায় আসেন। মহারাজা রাধাকিশোরমানিক্যের আমলে ভি,এম, হাসপাতাল, উজ্জয়ন্ত প্রসাদ, উমাকান্ত বিদ্যালয় নির্মাণ হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এক মোটর দুর্ঘটনায় রাধাকিশোরমানিক্যের মৃত্যু হয়। মহারাজা রাধাকিশোরমানিক্যের পর তার পুত্র বীরেন্দ্র কিশোর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্যের পৃষ্ঠপোষকতা নোবেল পুরস্কার পাবার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আগরতলায় বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। আগরতলায় কুঞ্জবন প্রসাদ, লক্ষীনারায়ন মন্দির, দুর্গাবাড়ি চত্বর ইত্যাদি বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্যের সময় নির্মাণ হয়। মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্যের দেহান্তর ঘটে। বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্যের পর নাবালক হেতু যুবরাজ বীরবিক্রম কিশোর বিলম্বে অর্থাৎ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সিংহাসনের অধিকারী হন। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরমানিক্যের সময়ে বৌদ্ধমন্দির, নীরমহল, স্টেটব্যাঙ্ক, আগরতলা বিমানবন্দর, বীরবিক্রম কলেজ ইত্যাদি নির্মিত হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রবিঠাকুরকে রবিঠাকুরের 'ভারত ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৪৯ সালের ১৫ ই অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতভুক্ত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে ভারত স্বাধীনতার প্রাক মুহুর্তে মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যের দেহান্তর ঘটে। তিনি ইতিহাসখ্যাত মানিক্যের রাজ্যবংশের শেষ নৃপতি ছিলেন। মহারাজ বীরবিক্রমের মৃত্যুর পর যুবরাজ কীরিটবিক্রম নাবালক থাকায় মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবীর সভাপতিত্বে গঠিত। কাউন্সিল আর রিজেন্সি' ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করে। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারতযুক্ত রাষ্ট্রে সংযুক্তির সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫২ সালে ত্রিপুরার প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। ত্রিপুরার প্রথম বিধানসভা ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ১৯৭০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরার প্রথম উপরাজ্যপাল হন এ এল ডায়াস। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ার ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পায়। বি কে নেহেরু ত্রিপুরার প্রথম রাজ্যপাল হন। ২৯ শে জুন ২০০৮ ত্রিপুরায় রেলের ইঞ্জিন প্রথম আগরতলার বাধারঘাট পর্যন্ত পৌঁছে। উমাকান্ত স্কুলের পূর্ববর্তী নাম 'আগরতলা হাইস্কুল। মন্ত্রী রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুরের নামানুসারে 'উমাকান্ত একাডেমী' স্কুলের নামকরণ করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষা বাংলা, ১৮৯৪ সালে কার্শিয়াং এ মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্যের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম দেখা হয়। মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমানিক্য বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লায় 'সতেরো রতন মন্দির' নির্মাণ করেন।

মহারাজ কৃষ্ণমানিক্য পুরাতন আগরতলায় অবস্থিত চতুর্দশ দেবতার মন্দির নির্মাণ করেন। 'কমলাসাগর দীঘি' মহারাজ ধন্যমানিক্য খনন করান। আগরতলা উমা মহেশ্বর মন্দিরের কালো পাথরের মূর্তিটি বাংলাদেশের খন্ডল পরগণার একটি পুকুর খননের সময় পাওয়া যায়। আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিত খার্চী পূজারম্ভ হয় এবং এই পূজার পুরোহিতকে চন্তাই বলা হয়। চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে উনকোটি তীর্থে অশোকাষ্টমীর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পৌষমাসের মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে তীর্থমুখের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। দেওয়ালি উপলক্ষ্যে উদয়পুরের মাতাবাড়ির বৃহত্তম মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। সদর মহকুমার সিমনার নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্রহ্মকুন্ড অবস্থিত। এখানেও বাৎসরিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উনকোটি পাহাড়ে ত্রিপুরার ভাস্কর্যে শিল্পের প্রধান নিদর্শন, এই ভাস্করের নাম 'কালুকামার' বিলোনীয়ার পিলাকপাথর ত্রিপুরার প্রত্নস্থল এবং টেরাকোটা শিল্পের নিদর্শন। 'রাজর্ষিতে' বর্ণিত ভুবনেশ্বরী মন্দিরটি উদয়পুরে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। উদয়পুরে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। উদয়পুরের মহাদেববাড়ির পূর্বদিকে পাশাপাশি দুটি মন্দিরের নাম দ্যুতার বাড়ি। ১৫২৮ খ্রীঃ মহারাজা গোবিন্দ মানিক্যের ভ্রাতা জগন্নাথ রায় উদয়পুরের জগন্নাথ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় দেবতামুড়া পাহাড় অবস্থিত পাথরের প্রাচীরে মহিষাসুর মর্দিনীর বিরাট মূর্তি আছে। বিজু উৎসব চাকমা

উপজাতি সম্প্রদায়ের বিশেষ উৎসব চাকমা উপজাতি সম্প্রদায়ের বিশেষ উৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয়। 'মতাইকতর' ত্রিপুরার উপজাতিদের বিশেষ দেবতা। রিয়াং উপজাতি সম্প্রদায় কর্তৃক 'তুই বুমা' পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ধনদেবী লক্ষীপূজার সঙ্গে 'হজাগিরি' নৃত্য সম্পর্ক যুক্ত ধামাইল নাচ পূর্ব বাংলার শ্রীহট্ট অঞ্চলের পল্লী রমনীদের বিবাহ উৎসবের নৃত্য বিশেষ। ১৯০০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম এবং ১৯২৬ সালে শেষবার আগরতলায় আসেন। তিনি মোট সাতবার আগরতলায় আসেন। কবি রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনী নামে ত্রিপুরায় সাহিত্য পরিষদের উদ্বোধন হয়। ত্রিপুরার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মণ বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর ভগ্নহৃদয় কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

রবীন্দ্রনাথের সুপারিশে তাঁর আত্মীয় রমনী মোহন চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরার রাজ মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা থেকে বুদ্ধিমন্ত সিংহ ও ঠাকুব নবকুমার সিংহ নামে দুজন মনিপুবী নৃত্যশিল্পীকে শান্তিনিকেতন নিয়ে গিয়েছিলেন। ত্রিপুবার রাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ (লালকুর্তা) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব স্নেহধন্য ছিলেন। ১৮৮৯ সালে মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য ত্রিপুবা রাজ্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন।

উদয়পুর ব্যতীত ধর্মনগর, কল্যাণপুর, অমবপুর প্রভৃতি স্থানে ত্রিপুবার রাজধানী ছিল। কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মহারাজ বীববিক্রম কিশোর মানিক্য ত্রিপুরার শিল্প ও চারুকলা প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করেন।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালটি ত্রিপুরার প্রথম হাসপাতাল। উমাকান্ত একাডেমি ত্রিপুরার প্রথম হাইস্কুল। মহারানি তুলসীবতী বিদ্যালয়টি ত্রিপুরার প্রথম মেয়েদের হাইস্কুল। মনু /১৬৭ কিমি) ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় নদী হাওড়া ত্রিপুরার ক্ষুদ্রতম নদী। মার্টিন কোম্পানি উজ্জ্বয়ন্ত প্রাসাদের স্থপতি ছিল। দক্ষিণ ত্রিপুরা আয়তনে রাজ্যের বৃহত্তম জেলা। সদর (আগরতলা) আয়তনে রাজ্যের বৃহত্তম মহকুমা। উদয়পুর মহকুমাটি বাংলাদেশ কিংবা মিজোরামের সীমান্তবর্তী নয়। জেলা পরিষদের সদর কার্যালয় রাধাপুরে (ককবরক ভাষায় খুমুলুঙ) অবস্থিত। বাংলা ও ককবরক এই দুটো ত্রিপুরার সরকারী ভাষা। জম্পুই রেঞ্জের বেতলিংশিব শৃঙ্গটি ত্রিপুরার উচ্চতম শৃঙ্গ। ত্রিপুরার তপশিলী উপজাতির সংখ্যা উনিশ এর মধ্যে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। রাজধানী আগরতলা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২.৮০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। পন্ডিত চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য আগরতলা উজ্জ্বয়ন্ত প্রাসাদের নামকরণ করেন এবং ১৯০১ সালে প্রাসাদের দ্বারোদঘাটন হয়। ১৯৭০ সালে আগরতলায় ত্রিপুরা সরকারী মিউজিয়াম এবং মিউজিক কলেজ

স্থাপিত হয়। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ১৯৭৫ সালে স্থাপিত হয়। 'অরুণ' রাজধানী আগরতলার প্রথম সংবাদপত্র ১৯৬৫ সালে ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও আগরতলা মহিলা কলেজ স্থাপিত হয়। ত্রিপুরার ৪৪টি সম্প্রদায়কে ওবিসি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ১৮৯৬ সালে আগরতলায় রাজ্যের প্রথম বীরচন্দ্র স্টেট লাইব্রেরিটি স্থাপিত হয়। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরমানিক্য আগরতলা পৌর এলাকায় আবশ্যিক প্রাথমিক প্রবর্তন করেন। মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যকে ত্রিপুরার বিক্রমাদিত্য বলা হয়। মহারানী ভিক্টোরিয়া বীরচন্দ্রমানিক্যকে মহারাজা উপাধি প্রদান করেন। অসম-আগরতলা সড়ককে ত্রিপুরার জীবনরেখা বলা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা আপনারা অবগত আছেন- উক্তিটি মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত অরুণ রাজধানী আগরতলার প্রথম সংবাদপত্র। এম বি বি কলেজ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাধারণ ডিগ্রি কলেজ। সিপাহীজলা ত্রিপুরার প্রথম অভয়ারন্য। কৈলাশহর মনু নদীর তীরে অবস্থিত। উদয়পুর গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত। বিশালগড় বিজয় নদীর তীরে অবস্থিত। ধর্মনগর লঙ্গাই নদীর তীরে অবস্থিত। আগরতলা হাওড়া নদীর তীরে অবস্থিত। বিলোনীয়া মুহুরী নদীর তীরে অবস্থিত। রেলপথে ধর্মনগর থেকে কলকাতার দূরত্ব প্রায় ১৪৫৩ কিমি। স্থল পথে আগরতলা থেকে কলকাতার দূরতব প্রায় ১৬০৩ কিমি।

আকাশ পথে (বাংলাদেশের উপর দিয়ে আগরতলা থেকে কলকাতার দূরত্ব প্রায় ৩১৫ কিমি। ১৮৫০ সালে কীর্তিও পরীক্ষিতের নেতৃত্বে ত্রিপুরী সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়। ১৮৬০-৬১ সালে রতন পুইয়ার নেতৃত্বে কুকি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। ১৮৬৩ সালে মহারাজ বীরচন্দ্রের সময়ে ত্রিপুরায় জামাতিয়া বিদ্রোহ হয়। ১৯৪২-৪৩ সালে রতন মনি রিয়াং এর নেতৃত্বে ত্রিপুরায় রিয়াং বিদ্রোহ হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে।
১৯৪৮ সালে গোলাঘাটির কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। আঠারমুড়া রেঞ্জ ত্রিপুরার সবচেয়ে দীর্ঘ পাহাড়। রাজা কল্যাণ মানিক্য খোয়াই এর কল্যাণপুর রাজপ্রসাদ নির্মাণ করেন। মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য ত্রিপুরায় স্ট্যাম্প বিভাগ এবং দলিল রেজিস্ট্রি প্রথা চালু করেন। মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য বাংলার বিশিষ্ট অন্ধ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাসিক অর্থ সাহায্য করেছিলেন। মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য বাংলার বিশিষ্ট অন্ধ কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে মাসিক অর্থ সাহায্য করেছিলেন। মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য বৌদ্ধ তীর্থ সারনাথে এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান।

মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য রেশম শিল্পে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য শ্রী যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীকে জাপান পাঠিয়েছিলেন।

মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হতে সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাকে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর ত্রিপুরায় পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ প্রথা চালু করেন। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর রাজ্যের শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধানে নাম রেজিস্ট্রার ও মহারাজের সমীপে প্রস্তাব প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর বহিরাগত শরণার্থীদের রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সুযোগ প্রদান করেছিলেন। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। বীরবিক্রম কিশোরের মৃত্যুর পর রাজ বংশের কুলাচার মতে তাঁহার পুত্র মহারাজ কিরীট বিক্রম কিশোর রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরের এক আদেশ মূলে যে উৎকোচ (ঘুষ) প্রদান বা গ্রহণ করে উভয়কে অনধিক তিন বছর জেল বা অনধিক এক হাজার টাকার অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডের বিধান ছিল। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরের আমলে ত্রিপুরায় চা শিল্পের সূত্রপাত এবং ৪০ টি চা বাগান গড়ে ওঠে। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরের সময়ে দক্ষ কর্মচারী নিয়োগের জন্য স্টেট সিভিস সার্ভিস গঠিত হয়। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থটির মাধ্যমে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরার সংযোগ ঘটে। মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরার প্রথম যোগাযোগ হয়। মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধুত্ব হয়। মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্যের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম আগরতলায় আসেন। আগরতলায় অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গান মোট পাঁচটি।

ত্রিপুরার রাজাদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'মুকুট' নামক গল্প লেখেন এবং পরে তা নাটক আকারে প্রকশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুকুট নাটকে ত্রিপুরার মহারাজা অমর মানিক্য ও তাঁর পুত্রগণের কাহিনী উল্লেখ আছে। কবি রবীন্দ্রনাথ মহারাজা গোবিন্দ মানিক্যের কাহিনী নিয়ে রাজর্ষি উপন্যাস লেখেন এবং পরে তা বিসর্জন নাটক নামে আত্মপ্রকাশ করে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনী কাব্যগ্রন্থটি মহারাজা রাধাকিশোরের নামে উৎসর্গ করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ মহারাজা রাধাকিশোরকে কলকাতায় সংবর্ধনা দিয়ে যে সঙ্গীতটি লেখেন তাঁর প্রথম পংক্তি হলো - 'রাজ অধিরাজ

তব ভালে জয়মালা।' ১৯৪১খৃঃ কবি রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর কবিকে 'ভারত-ভাস্কর' উপাধি প্রদান করেন। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থটির জন্য মহারাজা বীরচন্দ্রমানিক্য রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেন। মহারাজা গোবিন্দমানিক্য রবীন্দ্র সাহিত্যে 'রাজর্ষি' রূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য বিলেতে গবেষণার জন্য বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। ১৭ ই আষাঢ় ১৩১২ বাংলা (১৯০৫ খ্রীঃ) উমাকান্ত একাডেমীতে সাহিত্য সম্মেলনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাজার আসন দেয়া হয়েছিল কিন্তু মহানুভব রাধাকিশোর সে আসনে না বসে দর্শকের আসনে বসেন এবং বলেন কবি আসন সভার উপরে। চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের নামকরণ করেন। ত্রিপুরার জম্পুই পাহাড়ে প্রতিবছর পর্যটন ও কমলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারানি কমলাদেবীর নামে কমলা সাগরের নামকরণ করা হয়। কামান চৌমুহনীর কামানটি গৌড়ের রাজা হুসেন শাহের আমলের। আগরতলার চতুর্দ্দশ দেবতারা হলেন- শিব, দুর্গা, হরি, লক্ষী, সরস্বতী, কার্তিক, গনেশ, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বরুণ, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব, হিমাদ্রি। চাকমাদের ত্রিপুরার আদিম জাতি বলা হয়। সরকার স্বীকৃত উপজাতি- ত্রিপুরী, রিয়াং,নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, লুসাই, হালাম, কুকি, গারো, চাকমা , মগ, ভিল, ভুটিয়া, উঁচুই, ওরাং, লেপচা, চাইমাল, খাসিয়া, মুন্ডা, সাঁওতাল। ২০০৫ সালে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের ৫টি পাহাড়- বড়মুড়া, আঠারমুড়া, লংতরাই, শাখানটাং, জম্মুই। ত্রিপুরার দৈর্ঘ্য ১৮৩. ৫ কিমি., প্রস্থ- ১১২.৭ কিমি.।

সৌন্দর্য্যময়ী ত্রিপুরা, শ্যামলী ত্রিপুরা শান্তির নীড়, ভ্রমণ শেষে রাজ্যে এসে মনে হল জন্মভূমি সত্যিই স্বর্গীয় স্থান।

সংগৃহীত কিছু ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের ছবি ....

Tippu Sultan, Srirangapatna
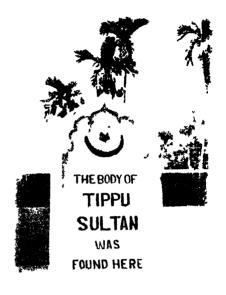
Tabulet, Srirangapanta
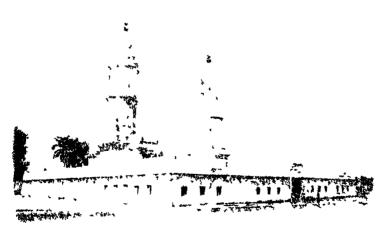
Jumma Masjid, Srirangapanta
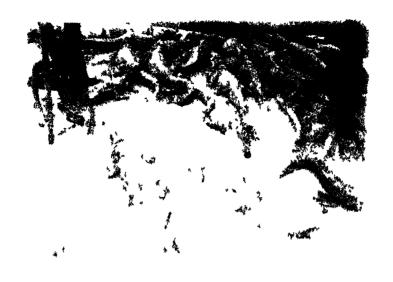
Crocodile City Madras

Glass Houde, Lalbaugh , Bangalore
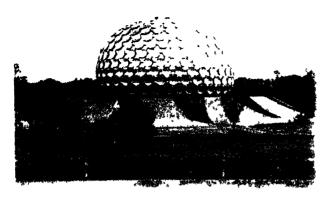
Matrimandir -Auroville,Tamilnaru

Tippu Sultan's Summer Place, Srirangapatna

High Court, Bangalore
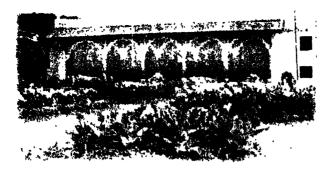
Tippu Sultan's Place , Bangalore

Glass Houde, Lalbaugh , Bangalore

ISKCON Temple , Bangalore

Palace, Bangalore

Botanical Gardens, OOTY

Mani Train, OOTY
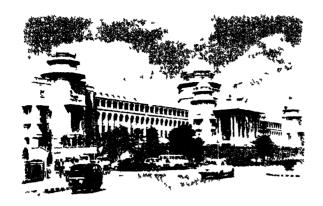
Vidhana Soudha Bangalore

Charring Cross, OOTY

India Map, OOTY
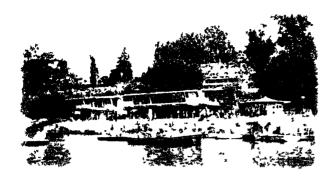
Boat House, OOTY

The entrance to the Sri Aurobindo Ashram, Puduchery, India

The Samadhi of sri Aurobindo and the Mother
Sri Aurobindo Ashram, Puduchery, India

Jagan Mohan Place, Mysore
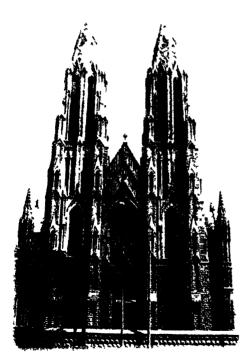
ST. Philomena's Church, Mysore
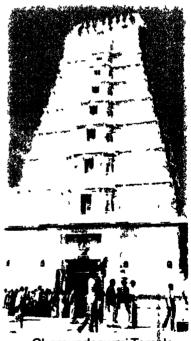
Chamundeswari Temple,
Chanudi Hills, Mysore

Main Entrance, Brindavan Garden

North Brindavan Garden
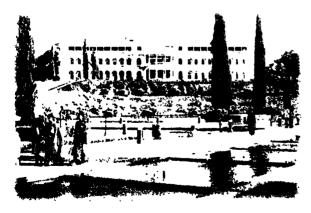
Krishnaraja Sagar Hotel,Brindavan Garden

Mahishasura, Chamundi Hills,
Mysore
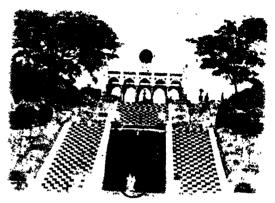
STATUE OF RADHA KRISHNA
Bindaban Graden
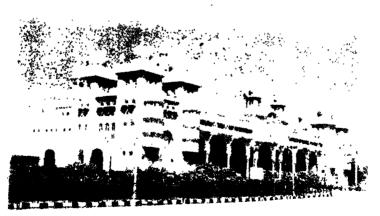
Lakshmi Vilas Place (Main Place), Mysore
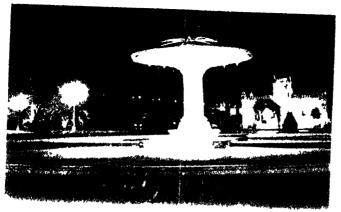
Russian Fountain,Brindavan Garden

Nandi, Mysore

Sri Ranganathaswamy Temple, Tamilnaru
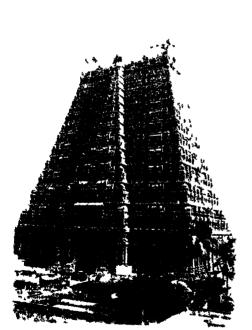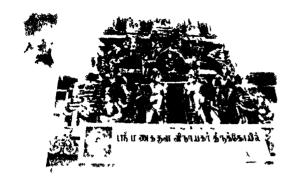
Tanjore,Tamilnaru, South India
Brihadeshwara Temple, 11th Century A.D
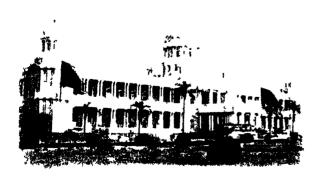
Lalitha Mahal Place
(Five Star Hotel) Mysore.

Central Station, Madras

South ,Brindavan Garden
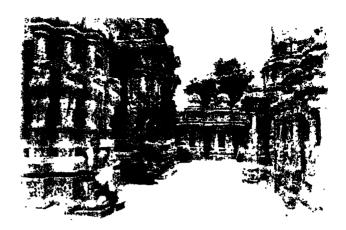
Kailasantha Temple, Kanchipuram

Dwsent of Ganges, Mahabalipuram